বাঙলা কাব্যের রূপ ও রীতি

ড. ক্ষুদিরাম দাস

এম-এ (গোল্ড-মেডালিস্ট), ডি-লিট্, কাব্যতীর্থ

ওরিএন্ট বুক কোম্পানি

সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট : দোতলা

কলিকাতা ৭০০ ০০৭

বাঁকুড়া কলেজের খ্যাতনামা সংস্কৃত-অধ্যাপক ও
বহু কৃতবিদ্য ছাত্রের সংগঠক
মদ্‌গুরু
৺রামশরণ ঘোষ এম-এ
মহোদয়ের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

ওরিয়েণ্ট বুক-এর প্রহ্লাদবাবু বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশনার ভার নিলেন।

বইটি কাব্য-কলা-বিধি নিয়ে, শব্দার্থ-বাক্যাদির বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল সৌন্দর্য পরীক্ষণ নিয়ে। ঐ সূত্রে প্রারম্ভে কাব্যকবিতা কাকে বলা উচিত, কাব্য-কবিতার উদ্দেশ্য কী, কলাকৃতির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য কিভাবে গ'ড়ে উঠছে এসব বিষয়ে কিছু ভূমিকা করতে হয়েছে। মধ্য অংশে উক্ত সৌন্দর্যের সহায়ক অলংকার বিশ্লেষণ এবং মতান্তর নিরসন ক'রে ছন্দের মূল ব্যাপারটি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে চর্যাগীতি, পদাবলী, মঙ্গলকাব্য থেকে আরম্ভ ক'রে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রসারিত বিশেষ বিশেষ কাব্যধারা ও রূপরীতির পরিবর্তন প্রসাধন প্রয়াসী কবিদের কৃতিত্ব পর্যালোচনা করা হয়েছে।

কাব্যসৌন্দর্য-পরীক্ষণে যদিচ বক্রোক্তি-মতকেই আমি বরণ করেছি, তবু এ আলোচনা ঠিক ঐ অভিমতেরই সম্প্রসারণ-কল্পে করা হয় নি।

সম্প্রতি খুব বড়ো আকারের বই লেখার দিকে একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আমি ও-পথের পথিক নই। কবি ভারতচন্দ্র তাঁর একটি প্রবচন-বাক্যে আমাকে রক্ষা করেছেন। এ ছাড়া কোনও স্থানে সংস্কৃত সমালোচন-রীতির উল্লেখ ও তজ্জন্য সমালোচনা করতে হয়েছে ব'লে ঐ সব জায়গা দুরূহ ব'লে কারো কারো কাছে প্রতীত হয়েছে। ব্যাপার এই যে, আমরা যদিচ মুহুর্মুহু সংস্কৃত সমালোচকদের দুচারটা বুলি জিহ্বাগ্রে রেখে চলি, সেগুলির ভিত্তি এবং তাৎপর্য বোঝার দিকে কোনো আগ্রহই রাখি না, কারণ, আসলে সংস্কৃত গ্রীকের চেয়েও কঠিন! অথচ ছাত্রসম্প্রদায়কে অভিভূত রাখতে ঋষিবাক্য বড়ই উপকারী।

অলংকার ও ছন্দের সঙ্গে কাব্যসৌন্দর্যের অভিন্ন সম্পর্ক। এটি দেখাতে গিয়ে এমন সব উদাহরণ সংগ্রহ করতে হয়েছে যেগুলি একই সঙ্গে রমণীয় ও যথাযথ। অবশ্য কিছু অনুবাদ এবং স্বকীয় গ্রন্থনাও করতে হয়েছে। অলংকার-নির্ণয় বিষয়ে মতান্তর নিরসনও একটা উদ্দেশ্য হয়েছে বৈকি।

দ্বিতীয় সংস্করণে মূল প্রতিপাদ্যগুলির তেমন কোনো পরিবর্তন প্রয়োজন মনে করি নি। ছাত্র ও গবেষক স্নেহাস্পদ মুসা কালিম শব্দসূচী প্রণয়ন ক'রে দিয়েছে।

গ্রন্থকার

বিষয়-সূচী

শব্দে নামসুধাস্যন্দো বর্ণেঽপি স্বাদনির্ণয়ঃ।
যস্যানন্দঃ স বন্দ্যো মে কৃষ্ণগৌরঃ কলাগুরুঃ॥

শব্দে নামরূপ সুধাধারা, এমনকি বর্ণেও স্বাদবিশেষের নির্ধারণ যাঁর আনন্দের বস্তু, সেই অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর শ্রেষ্ঠকলাগুরুকে বন্দনা করি।

পূর্বকথা

আমরা কাব্যসৌন্দর্যের মৌলবস্তুর আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। এই প্রসঙ্গে বিস্ময়ের সঙ্গে স্মরণ করছি মানবসমাজে শব্দার্থের আবির্ভাব-ক্ষণটিকে, আর নিঃশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করছি সেই পূর্বাচার্যগণের উদ্দেশ্যে যাঁরা ব্যাকরণ, ন্যায়, মীমাংসা, অলংকারশাস্ত্র এবং কাব্যাদি বিরচনের দ্বারা সারস্বত বুদ্ধির জাগরণ ও প্রতিষ্ঠা সম্ভব করেছেন।

সার্থক শব্দ হচ্ছে বাক্যের উপাদান এবং নরলোকে মনোভাব প্রকাশের প্রাথমিক উপায়। আবার শব্দ বলতে কর্ণগোচর ধ্বনি বা ধ্বনির সমষ্টি বোঝায়। মনুষ্যমুখোচ্চারিত ভাবপ্রকাশক এই ধ্বনিই হ'ল বাক্। অর্থের সঙ্গে এর নিয়ত সম্বন্ধ। বাক্-এর অতিগুরুত্ব অনুধাবন ক'রে একে সমাজে পূজ্য দেবতার স্থান দেওয়া হয়েছে। আবার এই বাক্ যাতে দুষ্ট না হয় সে বিষয়ে সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে পুনঃপুনঃ। কারণ, বাক্ দুষ্প্রযুক্ত হ'লে মানুষের ভাবনা ও কার্যের সামঞ্জস্য বিঘ্নিত হবে, লোকযাত্রা অচল হয়ে পড়বে। আলংকারিক দণ্ডী নরলোকে 'শব্দে'র নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলছেন—

> ইদমন্ধতমঃ কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ম্।
> যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে ॥

শব্দাখ্য জ্যোতি যদি সংসার আলোকিত না করত তাহ'লে ত্রিভুবন অন্ধতমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়ত, মানুষের জীবনযাত্রা চলত না। এই 'শব্দে'র যথাযথ ব্যবহার কত গুরুত্বপূর্ণ তা জানাতে গিয়ে শব্দশাস্ত্রবিৎ প্রাচীন ঋষি বলেছেন—একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সম্যগ্‌জ্ঞাতঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুগ্‌ ভবতি। একটি শব্দেরও শক্তি যদি সম্যক্ জানা

যায় এবং শব্দটিকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা যায় তাহ'লে ইহলোকে এবং পরলোকে তা কামধেনুর মত ইচ্ছাপূরণ করে।

মানুষের সমুদয় ভাববিবৃতিতে শব্দের তথা বাক্যের শুদ্ধপ্রয়োগ নির্ণয় করার ও শিক্ষা দেওয়ার জন্য রয়েছে ব্যাকরণ, কোষগ্রন্থ এবং ন্যায় ও মীমাংসা শাস্ত্র। কাব্যে ব্যবহারযোগ্য বাক্-এর সুপ্রয়োগ ও সুষমাময় প্রয়োগের নির্দেশক অলংকারশাস্ত্র রচিত হয়েছে। বস্তুতঃ সংসারযাত্রার প্রয়োজনে, চিন্তার বিন্যাসব্যাপারে শব্দের ও বাক্যের যা ব্যবহার, তা থেকে কাব্যনির্মাণে শব্দের ও বাক্যের ব্যবহারের রীতি বহুলাংশে পৃথক্। কাব্যের ভাষা আবার কবিব্যক্তি অনুসারে এবং দেশ-কালে পরিবর্তিত হয়। কাব্য শ্রোতা বা পাঠকের অন্তরে যে-সৌন্দর্যানুভব বা আস্বাদবিশেষ জন্মায় তা সহৃদয়ের অনুভববেদ্য হ'লেও এর নির্মাণকৌশল বিচারের দ্বারা জ্ঞেয় এবং কাব্যবোধও প্রায়শই শিক্ষা ও শাস্ত্রজ্ঞানের অপেক্ষা রাখে।

কবির নির্মাণের দিক

কাব্যে কবির বাঙ্‌নির্মাণের বিশেষত্বের বিষয়টি প্রথম অনুধাবন করতে হবে। বুঝতে হবে যে কবি তাঁর অনুভূত সৌন্দর্যকে ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে শব্দবাক্যবিন্যাস, প্রবন্ধনির্মাণ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে তাঁর শক্তি অনুযায়ী চারুতাময় নূতনত্ব অবলম্বন ক'রে থাকেন। আলংকারিক ভামহ এবং বিশেষভাবে কুন্তক একে 'বক্রোক্তি' নাম দিয়েছেন। বক্রোক্তি ব্যতিরেকে কাব্যসৌন্দর্য প্রকাশ করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় এবিষয়ে তাঁর উপলব্ধি দ্বিধামুক্ত ভাষায় প্রকাশ করেছেন। যদিও এ কথা স্বীকৃত যে কবির নবতর বাগ্‌বিন্যাস শুধু বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের জন্যই নয়, এ একদিক থেকে সৌন্দর্য বা রসাস্বাদের অবলম্বন, তথাপি কাব্যসৌন্দর্যের সঙ্গে কাব্যভাষার সম্বন্ধ অবিনাভাবী বলেই কাব্যের এই অবয়বের, এই বাণীরূপের বিন্যাস কবিসমাজে মুখ্যস্থান অর্জন ক'রে থাকে এবং শাস্ত্রের বিচার্য হয়ে থাকে একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য এই যে, কাব্যবিচারে আমরা শুদ্ধাত্মবাদকেও মান্য করি না, দেহাত্মবাদের

প্রতিও শ্রদ্ধাশীল নই। আমাদের মতে কাব্যের দেহ ও আত্মা একই প্রয়োজনে একত্র উদ্ভূত; এদের পৃথক্ ক'রে দেখার অবকাশ নেই। রবীন্দ্রনাথ বচনভঙ্গির এই বক্রবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে একাধিক স্থানে যুক্তি প্রয়োগ করেছেন। 'সাহিত্য' প্রবন্ধে তিনি বলছেন—

> অরূপকে রূপের দ্বারা ব্যক্ত করিতে গেলে বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তাকে রক্ষা করিতে হয়। নারীর যেমন শ্রী এবং হ্রী, সাহিত্যের অনির্বচনীয়তাটিও সেইরূপ···ভাষার মধ্যে এই ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রধানতঃ ভাষার মধ্যে দুটি জিনিস মিশাইয়া থাকে—চিত্র এবং সংগীত।

চিত্র বলতে রবীন্দ্রনাথ অর্থালংকার এবং সংগীত বলতে ছন্দঃ ও শব্দালংকারকে নির্দেশ করেছেন। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় তিনি ছন্দের (অর্থাৎ যাবতীয় বৈচিত্র্যীর) অপরিসীম মূল্য সম্পর্কে বলেছেন—

> মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
> অর্থের বন্ধন হতে লয়ে তারে যাবে কিছু দূর
> ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান্ অশ্বরাজসম
> উদ্দাম সুন্দর গতি—সে আশ্বাসে ভাসে চিত্ত মম।
> সূর্যেরে বহিয়া যথা ধায় বেগে দিব্য অগ্নিতরী
> মহাব্যোম-নীলসিন্ধু প্রতিদিন পারাপার করি,
> ছন্দ সেই অগ্নিসম বাক্যেরে করিব সমর্পণ,
> যাবে চলি মর্তসীমা অবাধে করিয়া সন্তরণ,
> গুরুভার পৃথিবীরে টানিয়া লইবে ঊর্ধ্বপানে,
> কথারে ভাবের স্বর্গে, মানবেরে দেবপীঠস্থানে।

অর্থাৎ অর্থের অতিরিক্ত বস্তু (রস বা ধ্বনি) কাব্যকৌশলের সঙ্গে একাত্ম। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একে সাধারণভাবে 'ছন্দ' নামে অভিহিত করেছেন। অন্যত্র কবি এই কৌশলকে সমগ্রভাবে 'অলংকরণ' আখ্যা দিয়েছেন, যেমন 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে বলছেন—

> সেই ভাব, সেই ভাবনা, সেই আবির্ভাব, যাকে প্রকাশ করতে গেলে অলংকার আপনি আসে, তর্কে যার প্রকাশ নেই, সেই

হোলো সাহিত্যের।…… অলংকার জিনিসটাই চরমের প্রতিরূপ।
……এই অলংকৃত বাক্যই হচ্ছে রসাত্মক বাক্য।

রবীন্দ্রনাথের এই সব উক্তি থেকে এরকম ধারণা অসমীচীন হবে না যে, সৌন্দর্য বা রসের উদ্‌ভাবন কাব্যের শেষ লক্ষ্য এবং সেইখানেই কাব্যের মানসিক এবং বৌদ্ধিক অনুভব ও অনুভবের পরীক্ষণ হলেও বক্র বাগ্‌বিন্যাস ব্যতীত ঐ অনুভব গোচরে আসে না। উত্তম কাব্যের সঙ্গে উত্তম বাঙ্‌নির্মিতির সম্পর্ক সমবায়ী অর্থাৎ নিত্য। কাব্য হয়নি অথচ ভঙ্গিতে উত্তম হয়েছে এরকম দৃষ্টান্ত অতিবিরল। কাব্য-সৌন্দর্যের অনুভব ঘটছে অথচ ভাষা লোকব্যবহারসীমাকে অতিক্রম করছে না এরকম দৃষ্টান্তও নেই। আর কবি-কথার উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার ছাড়া কাব্য-পরীক্ষার আর কোনও সার্বজনীন পরিমাপকও নেই। বিষয়টি আমরা একটু পরেই দৃষ্টান্ত সহকারে আলোচনা করছি এবং গ্রন্থান্তরে বিষয়টিকে নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার আশা করছি।

কাব্যস্বরূপনির্ণয়ে, কাব্য ও অকাব্যের পার্থক্য বিচারে অলংকার শাস্ত্রের নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা। ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি যেমন বিশেষভাবে লোকভাষার বা মননমূলক বিষয়বিন্যাসের ভাষার শাস্ত্র, সহৃদয় ব্যক্তির অনুভবসাক্ষিক কাব্যের শাস্ত্র তেমনি অলংকারগ্রন্থ।

অলংকার শাস্ত্র

এতে বিবেচিত হয় গুণ, রীতি, অলংকার, দোষ, কাব্যস্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ। অবশ্য কাব্য-স্বরূপ সম্বন্ধে নানামুনির নানা মত থাকায় উক্ত বিষয়গুলির সব ক'টিই যে সব গ্রন্থে সমান প্রাধান্যলাভ ক'রে থাকে এমন নয়। বিশেষতঃ প্রস্থানবিশেষের কোনও কোনও প্রবর্তয়িতা পরমতনিরসন, স্বাভিমতস্থাপন এবং স্বমতানুসারে কাব্য-ব্যাখ্যানেই মনোযোগী হয়েছেন, শ্রেণীবিন্যাস ক'রে বিভিন্ন কাব্য-কৌশলের ব্যাখ্যা করেন নি। সংস্কৃতের এইরকম সমালোচনা-শাস্ত্রের ঐতিহাসিক পরিচয় খুবই ব্যাপক। অগণিত অপ্রধান টীকাকার বা গ্রন্থপ্রণেতাদের কথা বাদ দিয়েও দেখা যায় এমন অন্ততঃ পঞ্চাশজন কারিকাকার, বৃত্তিকার বা টীকাকার রয়েছেন যাঁদের অভিমত অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য।

নাট্যসূত্রসংগ্রাহক ভরতকে বাদ দিলে ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীর ভামহ ও দণ্ডী, অষ্টম শতাব্দীর বামন এবং বামনের টীকাকার ও স্বয়ংগ্রন্থকার উদ্ভটভট্ট, আলংকারিক রুদ্রট, ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন এবং বিখ্যাত টীকাকার ও রসপ্রাধান্যের নির্দেশক অভিনবগুপ্ত, কাব্যমীমাংসা বাল-রামায়ণাদি এবং বহু মুক্তক কবিতার লেখক রাজশেখর, বক্রোক্তি-জীবিতকার কুন্তক, দশরূপকের লেখক ধনঞ্জয়, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ শৃঙ্গারপ্রকাশ প্রভৃতির লেখক ভোজদেব, ঔচিত্যবিচার-গ্রন্থ-প্রণেতা ক্ষেমেন্দ্র, রসধ্বনিমতের অতিনিপুণ প্রবক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা কাব্যপ্রকাশ-প্রণেতা মম্মট, বাগ্‌ভটদ্বয়, সাহিত্যদর্পণের বিশ্বনাথ কবিরাজ, বৈষ্ণব আলংকারিক রূপগোস্বামী ও কবিকর্ণপূর, রসগঙ্গাধর-প্রণেতা এবং রসবাদের একজন প্রধান প্রবক্তা জগন্নাথ, অলংকারবাদী এবং কুবলয়ানন্দ চিত্র-মীমাংসাদি গ্রন্থ প্রণেতা অপ্পয়দীক্ষিত ইত্যাদি প্রধানদের নাম উল্লেখ করতেই পাতা ভর্তি হয়ে যায়।

বাংলায় কাব্য-বিচার ধারা

বাঙ্‌লায় কাব্যবিচারের প্রারম্ভ সংস্কৃতের রিকৃথ নিয়েই। উনিশ শতকের প্রারম্ভে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, মদনমোহন তর্কালংকার, স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং স্বল্পপরবর্তী কালে লালমোহন বিদ্যানিধি প্রমুখ পণ্ডিতগণের উদ্‌যোগ এবিষয়ে স্মরণীয়। বিশেষতঃ বিদ্যানিধি মহাশয়ের কাব্যনির্ণয় গ্রন্থটি গুণ, রীতি, অলংকার, ছন্দঃ, দোষ প্রভৃতির অবলম্বনে বাঙ্‌লা কাব্য বিচারের তৎকালোপযোগী একটি উল্লেখ্য গ্রন্থ। তাঁর সমকালবর্তী উনিশ শতকের কবিদের কাব্য থেকে প্রচুর প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন তিনি। মধুসূদন নূতন ভাব ও রীতি নিয়ে কাব্য নির্মাণ করলেও প্রাচীন গুণদোষ বিচারের পন্থায় তাঁর কাব্যের সমীক্ষা চলেছিল বহুদিন। যদিও মধুসূদন নিজে তাঁর পত্রাবলীতে য়ুরোপীয় কাব্য-শাস্ত্রকেই বহুমান করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে সমালোচক হিসেবে স্পষ্টভাবে প্রথম মতভেদ জানালেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি বঙ্গদর্শনে নূতন রীতির প্রবর্তন করেছিলেন, যে রীতিকে বলা যায় পাশ্চাত্ত্য রীতি। উত্তররামচরিতের আলোচনার উপসংহারে তিনি সংস্কৃত

আলোচনার আদর্শকে কটাক্ষ করেছিলেন। প্রাথমিক বঙ্গদর্শন-গোষ্ঠীর পর ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতির লেখার মধ্য দিয়ে ঐ পাশ্চাত্ত্য রীতিই বাঙলা সাহিত্য-বিচারে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অধুনা-পূর্ব কালের প্রতি দৃক্‌পাতে দেখি বৈষ্ণব সাহিত্যরসিকেরা প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রের রসবাদ ও ঔচিত্যের রীতিকেই মান্য করেছেন ওরই মধ্যে নিজ প্রয়োজনমত বিভিন্ন বিষয়ে পরিবর্তন সাধন ক'রে। কবি আলাওল তাঁর পদ্মাবতী কাব্যে সংস্কৃত ছন্দঃ অলংকারের পরিচয় প্রচুর রেখে গেছেন। ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী' বাঙ্‌লা ভাষায় ও ছন্দে প্রাচীন সমালোচন রীতিরই সারনিষ্কর্ষ উপস্থাপনের প্রয়াস। যেমন লৌকিক বাগ্‌ভঙ্গি তেমনি সংস্কৃতের অলংকার ও ছন্দের সহায়তায় বাঙ্‌লা কাব্যরীতিতে নবযুগ প্রবর্তনের একটা তাৎকালিক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় তাঁর অন্নদামঙ্গলে। লক্ষণীয় এই যে, তিনি রসবাদী হলেও প্রকাশগত চমৎকারিত্বে কম আস্থাবান্ ছিলেন না। এছাড়া সেকালের উল্লেখযোগ্য কোনও কোনও কবির কাব্যে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যসমূহে কাব্যকলা সম্পর্কে তাঁদের স্মরণীয় অভিমতও প্রকাশ পেয়েছে।* এ বিষয়ে 'পদুমাবৎ'-এর আশ্চর্য অনুবাদক আলাওলের কৃতিত্ব সর্বাগ্রগণ্য। কবি ও কাব্য সম্পর্কে তিনি লিখছেন—

না কহিলে দোষ হয় কৈতে বাসি ডর।
তেকারণে কহি কথা সুধীর গোচর ॥
বিচারি পাইলে দোষ অক্ষর শুধিও।
না বুঝিয়া আমাব কবিত্ব না দুষিও ॥
এক পদ গুথিতে[১] যতেক দুঃখ হয়।
তাহার মরম পুনি মহত্বে[২] জানয় ॥

* 'প্রচরে যেমন কাব্য, লএ বা যেমনে ভব্য'—মুকুন্দ কবিকঙ্কণ
'যে হোক সে হোক ভাষা, কাব্য রস লয়ে'—ভারতচন্দ্র

১ 'গ্রন্থ্' ধাতু > গুত্‌থ ; ২ মহতে।

কাব্য সিন্ধু, শব্দ মুক্তা, কবি সে ডুবার।
বহু যত্নে ডুবি তোলে রতন সুচার[৩] ॥
যার যোগ্য যেই মত সে জানয় ভাল।
হেমরত্ন গঠিতে না পারে পাটীয়াল[৪] ॥
বাক্যসুত[৫] দিয়া যেন বান্ধয়ে পবন।
তাহার মরম জানে সেই মহাজন ॥

অন্যত্র— সুগুণী পড়িলে কাব্য সকল সন্তোষ।
অগুণী পড়িলে কবি কাব্য লাগে দোষ ॥

স্বল্প কথায় কবিকর্ম সম্পর্কে কী সুন্দর ভাষণ! 'বাক্যসুত দিয়া যেন বান্ধয়ে পবন' কাব্যনির্মিতির কী সুন্দর ব্যাখ্যান!

পশ্চিমানুসারী আলোচনার বিশিষ্ট গুণ সৃষ্টির মর্মমূলে প্রবেশের শক্তিদান এবং রহস্যময় কবিব্যক্তিত্বের স্বরূপ আবিষ্কারে উৎসাহদান। যে-সমালোচনায় কবির মানসের অভ্যন্তরে প্রবেশের সহায়তা করে এবং কবিকল্পনার সঙ্গে একাত্মতার দ্বারা যথার্থ কাব্যস্বরূপ আস্বাদনে ও ধারণে যা পাঠককে চমৎকৃত করে, তা যে অতি-মূল্যবান্ তাতে সন্দেহ নেই। আবার সমালোচকের ব্যক্তিত্বের স্পর্শে কবির সৃষ্টি দেশে ও কালে যে নব-নব মূর্তিতে আভাসিত হয়, তাও এই রীতির সমালোচনার বৈশিষ্ট্য, একথাও বলা যায়। আধুনিক বাঙ্‌লা সমালোচনা এই ধারায় পুষ্ট হয়ে পরোক্ষভাবে সাহিত্যেরও পুষ্টির সহায়ক হয়েছে। কিন্তু এই পদ্ধতির বহুগুণের মধ্যে একটি প্রবল ত্রুটিও বর্তমান। শক্তিমান্ সমালোচকের হাতে এ যেমন স্বর্ণপ্রসূ হয়, অক্ষম ব্যক্তির ব্যবহারে তেমনি ভুলের প্রসার ঘটায় এবং সাহিত্যকে বিকৃত করতে সহায়তা করে। অথচ এই রীতির সমালোচকের পূর্বতন কোন অনুশাসন মান্য করার যেন আবশ্যকতা নেই। ব্যক্তিস্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে সমালোচনার ক্ষেত্রে অবিচার-অনাচার চালানো যেতে পারে স্বচ্ছন্দে। সাম্প্রতিক বাঙ্‌লা সাহিত্য-সমালোচনায় ঘটছেও তাই। সাহসপূর্বক

অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ সমালোচন-পদ্ধতি

৩ সুচারু; ৪ পাটি বা মাদুর নির্মাণকারক; ৫ বাক্যরূপ সূত্র।

সত্যভাষণ করতে পারলে বলা যায় যে একদিকে পরীক্ষাভীত ছাত্রদের লক্ষ্য ক'রে এবং সাধারণ পাঠকদের উপলক্ষ্যের মধ্যে রেখে একশ্রেণীর গ্রন্থ রচিত এবং প্রকাশিত হচ্ছে যাতে কি বিষয় কি ভাষাবিন্যাস সর্বত্র ন্যায়ের মর্যাদা লঙ্ঘিতই হচ্ছে। অন্যদিকে সাময়িকপত্রের মধ্যস্থতায় যে সব আলোচনা-প্রত্যালোচনা চলছে তাতে কৃত্রিমতা, উন্নাসিকতা এবং ঐকদেশিক দণ্ড ধারণের উৎসাহই লক্ষিত হচ্ছে বিশেষভাবে।

অন্তর্মুখ সমালোচন-পদ্ধতির এই হ'ল স্ফুটতর দোষ। এর পশ্চাতে ন্যায় শাস্ত্রের বিধান এবং শ্রেণীবিন্যস্ত অনুশাসনমূলক সুগঠিত একটি পদ্ধতি থাকলে বিচারে স্বেচ্ছাচার এবং ভ্রান্তি বহুল পরিমাণে নিরুদ্ধ হয়। এরকম অবস্থায় এদেশীয় প্রাচীন রীতিকে সম্পূর্ণ বর্জন না করলেই আমাদের মঙ্গল। অর্থাৎ শব্দার্থের বিশ্লেষণ, ভাষাভঙ্গির বৈচিত্রীর স্বরূপ অবধারণ দ্বারা কাব্যস্বরূপের বিশ্লেষণের প্রায়-দ্বৈধহীন-পন্থাটিকে আমরা যেন অবহেলা না করি। কবিকৃতির দ্বারা ব্যঞ্জিত কবিমানসের স্বরূপ আবিষ্কারে যদি কোথাও ভুল ঘটে তাহলে আলংকারিক পন্থায় যেন সে ভুলের সংশোধন করতে পারি। অপ্রত্যক্ষ এবং বিচিত্র ব্যাখ্যার সম্ভাবনায় পূর্ণ কবিমানসের বিশ্লেষণ-প্রয়াস প্রত্যক্ষ আশ্রয়ের বিচারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যেন সার্থক হয়ে উঠে। এইভাবে অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ রীতির মিলনসাধনেই শ্রেষ্ঠ এবং নির্ভুল কাব্য-সমালোচনার উদ্ভব ঘটবে এই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রাচীন রীতির পুনঃপ্রবর্তন অর্থে গুণ, রীতি, অলংকার দোষাদির আনুপূর্বিক অনুসরণ নয়, গ্রহণবর্জনের দ্বারা আধুনিক বাঙ্‌লা ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে সমতা রক্ষা ক'রে একটা যৌক্তিক পদ্ধতির উদ্ভাবন। দেখা যায়, প্রাচীনেই বিভিন্ন কালে বিচার-পদ্ধতির অল্পবিস্তর পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। জীবন ও সাহিত্যের গতিশীলতাকে আলংকারিকেরা উপেক্ষা করতে পারেন নি। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, দণ্ডী-কথিত শ্রেষ্ঠ কাব্যের ভাষার 'দশগুণ' পরবর্তী-কালে তিনটিতে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। ভৌগোলিক ভাবে রীতি-

বিন্যাস সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ভাষাভঙ্গির বিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অলংকারের সংখ্যা ও সৌন্দর্যস্বরূপে পরিবর্তন আনা হয়েছে। দোষবিচারে নূতনতর রীতি উদ্ভাবিত হয়েছে। রসবাদের অনুকূলে ঔচিত্যবিচার নামে একটি অভিনব বিচার-পন্থাকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এ পরিবর্তন কালক্রমেই প্রয়োজনীয় হয়েছে। আধুনিক ভাবের বাহন এবং তদ্ভব ও তৎসমের মিশ্রণে গঠিত অভিনব ভাষা বাঙ্‌লার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে আরও কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন। আমাদের ধারণায় রসবাদ এবং বক্রোক্তি-বাদের আংশিক সমন্বয়ে অথবা নব্য পাশ্চাত্ত্য সমালোচন রীতিকে অলংকার ও বক্রোক্তির আলোকে শোধিত ও সম্পূর্ণ ক'রে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ শাস্ত্র গড়ে তোলা অসম্ভব নয়। অর্থাৎ এদেশীয় প্রাচীন রীতির শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের উপর সমালোচনার ভিত্তি স্থাপন ক'রে আধুনিক রীতির প্রয়োগে কাব্যের অন্তর-বাহির উভয়ের একযোগে পরীক্ষণই আমাদের মতে আধুনিক সাহিত্য-সমালোচনার যৌক্তিক পন্থা। এইভাবে সংস্কৃত-দুহিতা অথচ পাশ্চাত্ত্যের সহচরী বাঙ্‌লার রসরূপের যথার্থ আলোচনা ও পথ-নির্দেশ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সুখের বিষয় সম্প্রতি সংস্কৃত সমালোচনা-গ্রন্থে উপস্থাপিত অতি মূল্যবান্ মতামতগুলি বাঙ্‌লা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আরোপিত ও পরীক্ষিত হচ্ছে। নাট্যসূত্রসংগ্রাহক ভরত থেকে আরম্ভ ক'রে সপ্তদশ শতাব্দীর জগন্নাথ পর্যন্ত আলংকারিক-পরম্পরায় যে বিচারশালা দু'হাজার বছর ধ'রে গঠিত হয়েছে, যা শুধু ভারতেরই নয়, বিশ্বের সমালোচন-মনীষার সম্পদ্ হিসাবে রক্ষণীয় ও পুনঃপুনঃ আলোচ্য, তার উদ্‌বোধন আমাদের পক্ষে যে নিতান্ত কল্যাণকর এ সম্বন্ধে সন্দেহ কী? কিন্তু শুধু সংস্কৃতের সম্পদের বাঙ্‌লায় উদ্ধারই নয়, এর সাহায্যে বাঙ্‌লাসাহিত্য-সমীক্ষণের স্বাধীন অথচ পূর্ণাঙ্গ রীতির প্রবর্তন কবে হবে, সেই সুদিনের প্রতীক্ষা করা যাক।

১

প্রথম পর্ব কাব্যলক্ষণ, কাব্যস্বরূপ, কাব্যের উদ্দেশ্য

কাব্য কী, কিসে কবিতা হয়, কবি ঠিক ঠিক কাকে বলব এই নিয়ে আজও বাদানুবাদের সমাপ্তি নেই। বাদ-প্রতিবাদের কারণ—কাব্য-সৌন্দর্য-প্রমাতাদের বুদ্ধি ও অনুভবগত পরীক্ষণশক্তির তারতম্য, আর প্রায়শ অকবিদের কবির আসন দখল করে বসার প্রয়াস। শব্দ-বাক্যে প্রকাশিত কাব্যবস্তু মিলিত মানসিক ও বৌদ্ধিক আনন্দবিশেষের হেতু। আনন্দ অনির্বচনীয় ব'লে কাব্যের লক্ষণ, এমন কি বর্ণনও শব্দার্থের সাহায্যে সঠিক নির্বাহ হতে পারে না। তবু মনীষীরা এবিষয়ে নানাভাবে প্রয়াসী হয়েছেন।

আমাদের প্রাচীন আচার্যেরা কাব্যবিচারের প্রারম্ভে কাব্যের একটি যথাযথ লক্ষণ* নির্ণয় করার প্রয়োজন অনুভব করেছেন। এ বিষয়ে তাঁদের মতানৈক্য লক্ষণীয়, কিন্তু এ অনৈক্য কেবল প্রস্থানগত বিভিন্নতারই ফল নয়। সম্প্রদায়-বিশেষের আচার্যেরাও অনেকে স্বাধীনভাবে কাব্যের লক্ষণ নির্দেশ করতে চেয়েছেন। যেমন কাব্যের স্বরূপ বিচারে তাঁদের উৎসাহ ও চিন্তার সূক্ষ্মতা বিস্ময়ের উদ্রেক করে, তেমনি কাব্যের স্বরূপ-স্থাপনে বা লক্ষণ-নির্ণয়ে তাঁদের কারও কারও যত্ন সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ সম্পর্কে রসপ্রস্থানের বিশ্বনাথ কবিরাজের প্রয়াস উল্লেখযোগ্য। আমরা এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় লক্ষণ-নির্ণয়ে তাঁর স্বাভিমত স্থাপনের বিষয়টি পরীক্ষা করব। সাহিত্যদর্পণকারের লক্ষণ-স্থাপন অধ্যায়টি পরীক্ষা করার অন্যতম কারণ, তাঁর প্রদত্ত কাব্যলক্ষণ 'কাব্যং বাক্যং রসাত্মকং' বাঙ্‌লা আলোচনায় সর্বাধিক প্রচলিত।

গ্রন্থারম্ভে বিশ্বনাথ চতুর্বর্গপ্রাপ্তিরূপ কাব্যফললাভ বর্ণনা ক'রে কাব্যের স্বরূপ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তিনি কাব্যনির্মাণের

* ইং Definition শব্দের বাঙ্‌লা প্রতিশব্দ যা হওয়া উচিত

প্রয়োজনের দিকটি যদিও ভামহ, দণ্ডী, অগ্নিপুরাণকার, বিষ্ণুপুরাণকার, মম্মটভট্ট প্রভৃতি পূর্বসূরিদের মতানুসারেই উপস্থাপিত করেছেন, কাব্যের স্বরূপ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে এঁদের অনেকেরই মত খণ্ডন করতে উদ্‌যোগী হয়েছেন। তিনি বিস্তৃত আলোচনায় তাঁর স্ব-সম্প্রদায়ের পূর্বাচার্য

কাব্যং বাক্যং রসাত্মকম্‌ ?

মম্মটের "তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলংকৃতী পুনঃ কাপি" এই লক্ষণ-স্থাপনের দোষদর্শনে অগ্রবর্তী হয়েছেন। তাঁর মতে মম্মটলক্ষণের প্রথমতঃ 'অদোষ শব্দার্থ' এই অংশটি অব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট, কারণ, সর্বথা নির্দোষ কাব্যরচনা প্রায় অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ ধ্বন্যালোকে উদ্ধৃত এবং উত্তম রসধ্বনির দৃষ্টান্ত ব'লে প্রশংসিত একটি রচনা পুনরুদ্ধৃত ক'রে তিনি বলেছেন যে, এতে বিধেয়াবিমর্শ দোষ (বিধেয়কে যেখানে প্রধানভাবে ব্যপদেশ করা হয় না) রয়েছে, অথচ এটি উত্তম ধ্বনিকাব্য হয়েছে। এই রচনাটি মম্মট তাঁর দোষ-নিরূপণ অংশেও গ্রহণ করেছেন। বিশ্বনাথের অভিপ্রায় এই যে, শ্রুতিদুষ্টাদি যে-সব অনিত্যদোষ রয়েছে সেগুলি তো কোনও কোনও ক্ষেত্রে রসের উপকারকই হয়ে দাঁড়ায় (যেমন বীর ও রৌদ্রের বর্ণনে দুঃশ্রবত্ব) এবং ঠিক এই কারণেই পূর্বাচার্যেরা নিত্যদোষ অনিত্যদোষের বিভাগের ব্যবস্থা করেছেন। 'অদোষ' শব্দটিকে ঈষদ্‌-দোষ এই অর্থে গ্রহণ করলেও বক্তব্যের সংগতি রক্ষিত হয় না। কারণ, তাহলে অল্পদোষযুক্ত শব্দার্থ কাব্য হবে এরকম হাস্যকর বিধি দেওয়া হয়। রত্নাদিতে এক-আধটু দাগ প্রায়শ দেখা যায় ব'লে নিশ্চয়ই কেউ রত্নের এই লক্ষণ দেবেন না যে অল্পদোষযুক্ত প্রস্তর-বিশেষই রত্ন। দ্বিতীয়তঃ বিশ্বনাথ বলছেন যে শব্দার্থের সগুণত্ব-বিশেষণ অনুচিত। কারণ, কাব্যপ্রকাশকার স্বয়ং গুণের স্বরূপ নির্দেশে 'রসের অঙ্গীভূত ধর্ম—যেমন শৌর্যাদি আত্মার' এই ব'লে গুণকে অভিহিত করেছেন। সুতরাং গুণ শব্দার্থের ধর্ম কেমন ক'রে হয়? (বলা বাহুল্য, পূর্বেকার রীতিপ্রস্থানের আচার্যেরা গুণকে শব্দার্থের অথবা রীতির অঙ্গীভূত ব'লে মনে করতেন। মম্মট রসবাদী

হয়েও এদিক থেকে ভিন্নপ্রস্থানের অভিমতের প্রতিধ্বনি কেন করছেন, এই তাঁর অভিযোগ)। যদি এমন বলা যায় যে, শব্দার্থই যেহেতু রসের প্রতিপাদক সেইহেতু শব্দার্থের গুণবত্তা বললে রসেরই গুণবত্তা স্বীকার করা হয়,—স্বরূপ-নির্দেশে এরকম ক্লেশান্বয়পূর্ণ লক্ষণা অযৌক্তিক। আসল কথা, যে-শব্দার্থকে নিয়ে কাব্য হচ্ছে তার মধ্যে রস আছে, কি নেই। না থাকলে তার গুণবত্তাও নেই, কারণ, রসের অস্তিত্বই গুণবত্তার প্রমাণ। আর যদি থাকে তাহলে সগুণ না ব'লে সরস এই বিশেষণ দিলেই হত, লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করার কী প্রয়োজন? যদি বলা যায়, এখানে প্রয়োজন-লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ ক'রে কাব্যপ্রকাশকার এই কথা জানাতে চেয়েছেন যে কাব্যে সেইরকম শব্দার্থেরই ব্যবহার প্রয়োজন যাতে রস অভিব্যক্ত হয়, তাহলেও ঠিক হয় না, কারণ, গুণযুক্ত শব্দার্থ কাব্যের উৎকর্ষ মাত্র সাধন করে, মৌল কাব্যবস্তুর সঙ্গে এর সম্বন্ধ নিয়ত নয়, সুতরাং প্রয়োজনের অভাবে লক্ষণারও অবকাশ নেই। এই ব'লে তিনি স্বাভিমতের সমর্থনে কেশবমিশ্রের গ্রন্থ থেকে শৌদ্ধোদনির উক্তিরূপে প্রচলিত এই বাক্য উদ্ধৃত করেছেন—কাব্যস্য শব্দার্থৌ শরীরম্ রসাদিশ্চাত্মা গুণাঃ শৌর্যাদিবৎ দোষাঃ কাণত্বাদিবৎ রীতয়োঽবয়বসংস্থানবিশেষবৎ অলংকারাঃ কটককুণ্ডলাদিবৎ। অভিপ্রায় এই যে, শব্দার্থ কাব্যের দেহ মাত্র, আর শৌর্যাদিগুণ রসভাবাদিরূপ আত্মার গুণ; গুণবিশিষ্ট দেহ বললে যেমন ভুল বলা হয়, গুণবিশিষ্ট শব্দার্থ বললেও তেমনি ভুল বলা হয়। এই অভিমতের দ্বারা কাব্যপ্রকাশকারের "কোথাও বা অনলংকৃত" শব্দার্থের এই বিশেষণও খণ্ডিত হয়, কারণ, অলংকার দেহশোভা এবং পরোক্ষভাবে কাব্যের উৎকর্ষাধায়ক মাত্র। 'স্ফুটালংকারবিরহেও' কোথাও কোথাও কাব্য হতে পারে এর দৃষ্টান্তস্বরূপ মম্মট যে উদাহরণ দিয়েছেন (যঃ কৌমারহরঃ ইত্যাদি), সেখানেও সাহিত্য-দর্পণকারের মতে স্ফুটালংকার রয়েছে,—তাকে বলা যায় 'বিশেষোক্তি ও বিভাবনার সন্দেহসংকর'। এইভাবে বিশ্বনাথ রসপ্রস্থানের পূর্বাচার্য মম্মটের কাব্যলক্ষণ আগাগোড়া অপ্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন।

মম্মটের পর তিনি বক্রোক্তিজীবিতকার, ভোজদেব, এমন কি ধ্বনিকারের প্রদত্ত কাব্যলক্ষণ অগ্রাহ্য ক'রে এবং পরিশেষে বামনের মত বিধ্বস্ত ক'রে "রসাত্মক বাক্য কাব্য" এই নিজমত প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। বক্রোক্তি কাব্যের প্রাণ হতে পারে না, কারণ, তাঁর মতে 'বক্রোক্তি' অলংকারসামান্য ধর্ম, উক্তিবৈচিত্র্যবিশেষ! ভোজকথিত 'অদোষং গুণবৎ কাব্যম্ অলংকারৈরলংকৃতম্' প্রভৃতি লক্ষণেও যেহেতু রসের সঙ্গে গুণরীতি-অলংকারের অঙ্গী-অঙ্গ সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়নি সেইহেতু তাঁর কাব্যলক্ষণও অযথার্থ। ধ্বনিকারের বিষয়ে বিশ্বনাথ প্রশ্ন করেছেন যে কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ ঠিক কথা। কিন্তু কিসের ধ্বনি, বস্তু-অলংকার-রস এই তিনটি বিষয়ের, না কেবল রসের? বস্তু-অলংকারের ধ্বনি কাব্যের বিষয় হতে পারে না, কেননা, তাহ'লে প্রহেলিকাকেও কাব্য-শ্রেণীমধ্যে গণনা করতে হয়। বস্তুধ্বনির উদাহরণ রূপে ধ্বন্যালোকে প্রদত্ত একটি রচনার কাব্যত্ব যদিচ তিনি স্বীকার করেছেন, তাঁর মতে বস্তুধ্বনির জন্যে সেটি কাব্য হয়নি, হয়েছে রসাভাসের ধ্বনির জন্যে। তাঁর মতে বস্তুধ্বনিকে কাব্যস্বরূপের অন্তর্ভুক্ত করলে 'দেবদত্তো গ্রামং যাতি' এই উক্তির দ্বারা দেবদত্তের ভৃত্যেরও তাঁর সঙ্গে গমন ধ্বনিত হচ্ছে ব'লে ঐ বাক্যেরও কাব্যত্ব স্বীকার করতে হয়। পরিশেষে বামনোক্ত 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য' (Best words in their best order) এই লক্ষণনির্দেশের অসারতা দেখিয়ে তিনি বলছেন যে রসই যেহেতু কাব্যের জীবনাধায়ক সেই হেতু রসকেই কাব্যের আত্মা বলতে হয়।

কাব্যের একটি যুক্তিসংগত লক্ষণ স্থাপনে বিশ্বনাথের আগ্রহ যেমন প্রশংসনীয়, তাঁর স্বাভিমত স্থাপনের উদ্‌যোগ তেমনি আপত্তিকরও বটে। মোটামুটি এই কথা বলা চলে যে, তিনি এ বিষয়ে অতি-উৎসাহ প্রকাশ করেছেন অথচ তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। বিশ্বনাথ কাব্যলক্ষণে রসকেই একমাত্র পদার্থ ব'লে গ্রহণ করেছেন। অথচ দেখা যায়, বিশ্বনাথের পরবর্তী রসপ্রস্থানের অন্য দু'জন ধুরন্ধর বিশ্বনাথনির্মিত লক্ষণটি মেনে নিতে

পারেন নি। 'রসগঙ্গাধর'-প্রণেতা জগন্নাথ এঁর লক্ষণের প্রতিবাদ ক'রে বল্‌ছেন—রসভাবাদিযুক্ত বাক্যই কাব্য, সাহিত্যদর্পণকারের এই অভিমত ঠিক নয়, কারণ, তাহলে বস্তুপ্রধান ও অলংকারপ্রধান কাব্যগুলিকে অকাব্য বলতে হয়। এরকম লক্ষণনির্ণয়ে মহাকবি-সম্প্রদায়েরও উচ্ছেদ সাধন করা হয়, কারণ, তাঁদের রচনায় এমন সব স্থান রয়েছে যেখানে রসের প্রসঙ্গও নেই, যেমন ধরা যাক, নিসর্গের বর্ণনা, শিশুর ক্রীড়া প্রভৃতি। যদি বলা যায়, মূল বিষয়ে রস থাকলে এই সব নীরস বর্ণনাও তার স্পর্শে সরস কাব্য হয়ে যায় তাহ'লেও ঠিক কথা বলা হয় না, কেননা, এরকম রসস্পর্শের সীমা নিরূপণ অসম্ভব এবং তাহা অকাব্যও এই যুক্তিতে কাব্য ব'লে চ'লে যাওয়ার অবকাশ রাখে। এইজন্য তিনি, রসাভিব্যক্তি নয়, রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকতাকে কাব্যের ধর্ম ব'লে নির্দেশ করতে চেয়েছেন। বৈষ্ণব রসিক কবিকর্ণপুর পূর্বেই ভিন্নভাবে বিশ্বনাথের লক্ষণের অসংগতি দেখিয়েছিলেন। প্রথমতঃ তিনি এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ দেখিয়ে বলছেন, যদি রস থাকলেই বাক্য কাব্য হয় তাহলে "গোপীভিঃ সহ বিহরতি হরিঃ" এই এই বাক্যও কাব্য হয়ে পড়ে, কারণ, এটি শৃঙ্গাররসাত্মক বাক্য। এই লক্ষণে ব্যতিরেকমুখেও দোষ ঘটছে। অর্থাৎ যা বাক্য নয় তা কাব্য নয় এরকম অব্যাপ্তিরও সম্ভাবনা রয়েছে। 'কূর্মলোমপটাচ্ছন্নঃ শশশৃঙ্গ-ধনুর্ধরঃ। এষ বন্ধ্যাসুতো যাতি খপুষ্পকৃতশেখরঃ॥' এই অংশে হাস্যরস ব্যঞ্জিত হচ্ছে, অথচ এটি যে যোগ্যতাধর্মযুক্ত বাক্য একথা কে বলবে?

কাব্যলক্ষণ বিষয়ে অন্যান্য প্রাচীনেরা

এঁদের সমালোচনার কথা স্মরণে রেখে বিষয়টিকে স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা ক'রে দেখা যাক। কাব্যের স্বরূপ নির্ণয়ে আলংকারিকেরা মোটামুটি এই তিনটি বিষয়ের একটি অবলম্বন করতে চেয়েছেন—শব্দ, শব্দার্থ ও বাক্য। ভামহের মতে "শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্"। অলংকারপ্রস্থান এমন কি রসপ্রস্থানের প্রসিদ্ধ আচার্য কেউ কেউ শব্দার্থের সহায়তায় কাব্যের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। কেবল শব্দকে

অবলম্বন করেছেন রসগঙ্গাধরপ্রণেতা জগন্নাথ। বাক্যের আশ্রয়ে যাঁরা কাব্যের স্বরূপ নির্দেশ করতে চেয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শৌদ্ধোদনি নামধেয় কোনও আচার্য, যাঁর মতে 'কাব্যং রসাদিমৎ বাক্যম্'। আর এঁর অভিমতের একটু সংস্কার সাধন ক'রে স্বমত প্রতিষ্ঠিত করেছেন বিশ্বনাথ। কিন্তু শব্দ, শব্দার্থ, বাক্য এই তিনটি আশ্রয় বা বিষয়ের বর্ণনায় কাব্যের সংগত লক্ষণ দেওয়া যায় কিনা তা-ই প্রথম বিবেচ্য। যদিচ শব্দই মানুষের যাবতীয় ভাবপ্রকাশের মূলে এবং দণ্ডীর কথা সম্পূর্ণ মাননীয় যে শব্দাখ্য জ্যোতি আলোক বিকিরণ না করলে সংসার অন্ধতমসাচ্ছন্ন থাকত এবং শব্দের সম্যগ্‌জ্ঞান ও সমুচিত প্রয়োগ সম্বন্ধে যদিও প্রশস্তি যথেষ্ট, তবু শব্দকে কাব্যের মূল উপাদান ব'লে ধরলে অতি ব্যাপক ধারণার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। শব্দার্থ এমন কি বাক্যও এ বিষয়ে অধিক সহায়তা করে না, অর্থাৎ কবিকৃত যে ব্যাপার শব্দ-শব্দার্থ-বাক্যে সমর্পিত হলে তাকে কাব্য বলা যায় তার কোনও সংকেতই সাধারণ শব্দ-শব্দার্থ-বাক্য থেকে পাওয়া যায় না। এদের কোনও বিশিষ্ট বর্ণনাই কাব্যস্বরূপ নিরূপণে পর্যাপ্ত হতে পারে না। ভামহের 'সহিতৌ' এই অস্পষ্ট বিশেষণ আমাদের বেশিদূর নিয়ে যায় না। বক্রোক্তিজীবিতকার ভামহের লক্ষণের এই অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি ক'রেই এর সঙ্গে 'বক্রকবিব্যাপার' ও 'বন্ধ' এই দুটি বিষয় যোগ ক'রে মোটামুটি একটি সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রস্তুত করতে চেষ্টা করেছেন, অবশ্য স্বকীয়ভাবে। তাঁর লক্ষণ হ'ল—"শব্দার্থৌ সহিতৌ বক্রকবি-ব্যাপারশালিনি বন্ধে ব্যবস্থিতৌ কাব্যম্"। অর্থাৎ শব্দার্থ বিশেষভাবে মিলিত হয়ে বক্রকবিব্যাপারের দ্বারা বিশিষ্ট প্রবন্ধে প্রযুক্ত হলে তবেই তাকে কাব্য বলা যায়। 'সহিত' শব্দের ব্যাখ্যায় তাই ভামহকে সংশোধন ক'রে তিনি 'বিশিষ্ট একপ্রকার মিলনই এখানে অভিপ্রেত' 'শব্দ ও অর্থের পরস্পরস্পর্ধী রমণীয়তা' প্রভৃতি উক্তির সন্নিবেশ করেছেন। বস্তুতঃ শব্দার্থের সহিতত্ব বা মিলন তো ব্যবহারিক গদ্যেও অতিপ্রয়োজনীয়। বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি,

ধর্মশাস্ত্র, দর্শন এমনকি লোকব্যবহারেও শব্দ অভিধেয়কে অবক্রম বা অতিক্রম না ক'রে মিলিত সম্বন্ধে থাকলে তবেই তো শব্দার্থের গৌরব। কাব্যেতর বিষয়ে যা প্রযোক্তব্য তাকে কাব্যের নির্দেশক করলে স্ববিরোধ এসে যায়, অতিব্যাপ্তি তো বটেই। ভামহ এই দোষে দোষী। কিন্তু কুন্তক যে ভামহের লক্ষণকে ভিত্তি করলেন তার কারণ বোধ হয় এই যে, ভামহ বিশেষভাবে বক্রোক্তিকে অলংকারসাধারণ চারুত্বধর্ম বলে স্বীকার ক'রে কুন্তকের জন্য পূর্বাহ্ণেই পথ প্রস্তুত ক'রে রেখেছিলেন ('সৈষা সর্বৈব বক্রোক্তিরনয়ার্থো বিভাব্যতে')। সবথেকে কৌতুকের বিষয় এই যে, কবি কালিদাস তাঁর রঘুবংশের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে কেবল 'শব্দার্থ' সম্মিলনের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন—বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।

কেবল শব্দার্থ মিলিত অবস্থায় যে কাব্যের বিষয় হতে পারে না তা উপলব্ধি ক'রেই আচার্য মম্মটভট্টকে অদোষৌ সগুণৌ ক্বচিৎ অনলংকারৌ প্রভৃতি বিশেষণ দিতে হয়েছিল। বিশ্বনাথের তীব্র সমালোচনা স্মরণে না রেখেও একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে, নিঃশেষ শব্দার্থভিত্তিক লক্ষণে কাব্যের মর্মপ্রদেশে পৌঁছাতে পারা যায় না ব'লেই তাঁর লক্ষণ অলংকারপ্রস্থানের আচার্যদের মত দোষদুষ্ট। অথবা এমন বলাই সংগত যে অলংকৃত শব্দার্থ কাব্য এরকম লক্ষণ অলংকারবাদিদের পক্ষে পর্যাপ্ত হলেও রসধ্বনিবাদিদের পক্ষে যথার্থতা অবধারণের সহায়ক নয়। বিশ্বনাথ এই জন্যই যদিও তাঁর সমালোচনা করেছেন, তাঁর পন্থার মূল ত্রুটিটুকু ঠিক দেখিয়ে দিতে পারেন নি, তর্কের খাতিরে চুলচেরা বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। শৃঙ্গাররসসাধক ভোজদেব তাঁর কবিবিবরণীতে ('অদোষং গুণবৎ কাব্যম্ অলংকারৈরলংকৃতম্। রসান্বিতং কবিঃ কুর্বন্ কীর্তিং প্রীতিং চ বিন্দতি') কবিকে গুণ, রীতি, অলংকার এবং রস সব বস্তুরই ব্যবহার করতে বলেছেন, কিন্তু কাব্য ঠিক কী বস্তু তা নির্দেশ করেন নি। যাই হোক, রসপ্রস্থানের পক্ষ থেকে দেখা যায়, কেবল বহিরঙ্গ—শব্দ, শব্দার্থ (এবং বাক্যের) দ্বারা চমৎকার বা আনন্দস্বরূপ কাব্যের ব্যপদেশ

করতে গেলে অপর্যাপ্তি অনিবার্য। এই বিশেষ প্রকারের সৌন্দর্য বা রমণীয়তা বা স্বাদবিশেষ যেমন শব্দ, শব্দার্থ, বাক্যাদি বহিরঙ্গকে ব্যাপ্ত ক'রে বিদ্যমান থাকে এবং শব্দার্থ ব্যতীত প্রকাশের যোগ্যতা লাভ করতে পারে না, তেমনি আবার শব্দার্থসংকেতের অতিরিক্তও। ফলতঃ কাব্যস্বরূপ অভিধানের যোগ্য কিনা এ প্রশ্ন স্বভাবতই এসে পড়ে। আবার কাব্যলক্ষণের এই শব্দার্থনির্ভরতার জন্যই অর্বাচীন কোনও কোনও আলংকারিক ও টীকাকারদের অনাবশ্যক ন্যায়-মীমাংসার যুক্তিজাল বিস্তার করতে হয়েছে। অথচ এঁরা যে সর্বত্র ন্যায়ের নির্দেশ পালন করেছেন এমনও নয়।

বৈচিত্র্যনিরপেক্ষ কাব্যদেহের আশ্রয়ে কাব্যের স্বরূপ নির্দেশে নানাবিধ আপত্তির উদ্ভব অনিবার্য। কাব্যের তথাকথিত আত্মার উল্লেখে কোনও উপকার দর্শে কিনা দেখা যাক। এ বিষয়ে স্মরণীয় পথিকৃৎ ধ্বনিকার অথবা আনন্দবর্ধন। তিনিই প্রথম কাব্যকে বাচ্য-বাচকের বন্ধন থেকে মুক্তরূপে দেখলেন। কাব্যের আত্মা ধ্বনি, যা বাচ্যবাচক থেকে ভিন্নবস্তু অথচ বাচ্যবাচকের আশ্রয় ছাড়া যাকে নির্দেশ করাও যায় না। এইজন্য তাঁকে ব্যঞ্জনা ব'লে তৃতীয় একটি শক্তি অঙ্গীকার করতে হয়েছে। ধ্বনি ব্যাপারটিকে ব্যঙ্গ্যার্থ বা এরূপ দ্বিতীয় অর্থ ব'লে অভিহিত করায় তিনি বিষয়কে সম্পূর্ণ ত্যাগ করলেন না, আবার ধ্বনিকে সহৃদয়সাক্ষিক বলাতে বিষয়ীর উপরও জোর দিলেন, এর পূর্বে আর কেউ যা দিতে পারেন নি। ফলতঃ ধ্বনিবাদ পূর্বেকার বহির্মুখ এবং আগামী অন্তর্মুখ সমালোচনরীতির মধ্যবর্তী পন্থা নির্দেশ করেছে। ধ্বনি বলতে ব্যঞ্জনাগুণও বোঝায়, আবার উপচারক্রমে ব্যঞ্জিত বস্তু—অলংকার, রসভাবাদিও বোঝায়। ব্যঞ্জনা বা ব্যঙ্গ্যার্থ প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ নয় এবং মহিমভট্ট একে প্রমাণসিদ্ধ করবার জন্যে যদিও অস্পষ্ট ধ্বনিকে স্পষ্ট অনুমিতি ব'লে গ্রহণ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তথাপি ধ্বনিকার তা গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে কাব্যের অনুভব ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। যাই হোক, ধ্বনিকার ধ্বনিরূপ

উদ্দেশ্যের জন্য শব্দার্থের উপায়বত্তা স্বীকার করলেও কাব্যস্বরূপ নির্ণয়ে উপায়ের উল্লেখ প্রয়োজনীয় ব'লে বোধ করেন নি। ফলে তাঁর ধ্বনি নামক অনির্বাচ্য বস্তুটি অস্পষ্ট ও অতিব্যাপক হয়ে পড়েছে। চারুতাহীন বস্তুধ্বনিও সহজেই কাব্যের বিষয় হয়ে পড়েছে ; বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি এবং রসধ্বনির মধ্যে গুণগত বৈষম্যও পরিস্ফুট হয় নি। ধ্বনিকার অবশ্য কাব্যের লক্ষণে এই পার্থক্য আনতে চাননি। কিন্তু ধ্বনির বিষয় অত্যন্ত ব্যাপক হয়েছে ব'লে যেমন-হোক ধ্বনি থাকলেই অর্থাৎ বাচ্যার্থের চেয়ে ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাধান্য থাকলেই নীরস কাব্যও উত্তম কাব্য ব'লে চলে যায়। কাব্যকে ধ্বনি বলাতে যে অনির্ণেয়তার সৃষ্টি হয়েছে, রস বলতে তা থেকে কম কিছু হয়নি। যা সহৃদয়-হৃদয়ে অনুভবগম্য আহ্লাদবিশেষ তাকে উপচরিতভাবে বাক্যে গ্রহণ করলে রসের সহৃদয়হৃদয়ানুভবরূপ বৈশিষ্ট্যকে বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করতেই হয়। আবার রসের কথা থাকলেই শব্দার্থ বা বাক্য কাব্য হবে এমনতর অতিব্যাপকতার প্রশ্রয়ও দিতে হয়। বিশ্বনাথের সমালোচকেরা এক্ষেত্রে রসকে অলংকারাদির মত বহির্বস্তু হিসেবেই গ্রহণ করেছেন দেখা যায়। বস্তুতঃ রসরূপ অনির্ণেয় বিশেষ আনন্দাস্বাদটুকু বাক্যের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট এরকম ধারণা করলে বিষয়টি আর যাই হোক গোলমেলে হয়ে পড়ে। তা ছাড়া প্রশ্ন হতে পারে, চিরাচরিত শব্দার্থ-ভিত্তিক লক্ষণ নির্দেশের পথ ত্যাগ ক'রে বাক্যকে গ্রহণ করাতে বিশ্বনাথ এবিষয়ে কিরূপ উন্নতি আনলেন ? কেউ যদি বলেন পরমার্থতঃ কিছুই না, কারণ, শব্দার্থসমূহে আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তি থাকলেই তা বাক্য হয়, আকাঙ্ক্ষাদি কাব্যস্বরূপদ্যোতক কোনও ধর্মই নয়, তাহলে তাঁর সমালোচনা সহজে খণ্ডন করা যাবে না। হয়ত বা রস ঠিক শব্দার্থব্যাপক নয়, বাক্য-বাক্যার্থব্যাপক এই ধারণায় বিশ্বনাথ বাক্যকে আশ্রয় করেছেন। কিন্তু রসের প্রমাণ তো বাক্যে নয়, হৃদয়ে। রসগঙ্গাধর-প্রণেতা হয়ত এজন্যই রসের নাম করেন নি, শব্দার্থ বাক্য উভয় পথ ত্যাগ ক'রে কেবল শব্দের আশ্রয়েই কাব্যস্বরূপ নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন, আর এজন্য যুক্তিতর্কের

অবতারণারও প্রয়োজন বোধ করেছেন। যাই হোক, বাক্যসম্বন্ধে রসাত্মকতা বলতে ঠিক কী বুঝায় এবং কিভাবে তা গ্রহণ করা যায় বিশ্বনাথের লক্ষণে তা অস্পষ্ট। বাক্যের উপর এমন কোনও বিশিষ্ট ও প্রত্যক্ষ গুণ বা ধর্মের আরোপ করা উচিত ছিল যা হ'লে অন্তত: বাহ্যভাবেও বাক্যকে কাব্য বলা চলত। আমাদের পূর্বতন সমালোচনায় যা অপ্রতিপন্ন করতে চেয়েছি তাকেই এখন তুলে ধরা যাক। শব্দ শব্দার্থ, বাক্য—যা কাব্যের আশ্রয়রূপে প্রত্যক্ষ, তাকে বাদ দিয়ে লক্ষণ যথাযথ হতে পারে না। আবার শব্দার্থের অতিরিক্ত গুণবিশেষের নির্দেশ ছাড়াও লক্ষণ অসম্পূর্ণ। অর্থাৎ লক্ষণ স্থাপনে কাব্যাত্মার সঙ্গে কাব্যদেহের সুচারু সদ্‌ভাব দেখানো প্রয়োজন। বিশ্বনাথের লক্ষণে দেহকে নির্গুণ ক'রে অপ্রত্যক্ষ রসাত্মাকে একমাত্র ক'রে দেখানোতে অসম্পূর্ণতা ও জটিলতার উৎপত্তি হয়েছে। দেহের উল্লেখ একেবারেই যদি না করা হত, যেমন 'কাব্যাসাত্মা ধ্বনিঃ' ক্ষেত্রে ঘটেছে, সেখানে লক্ষণ একদেশানুসারী হলেও জটিল ও দুরূহ হয়নি। জগন্নাথ ও কবিকর্ণপূর সাহিত্যদর্পণের যে সমালোচনা করেছেন তা থেকে মনে হয় তাঁরা রসকে অলংকারাদির মতই বাক্যের মধ্যে অবস্থিত একটি পদার্থরূপে গণ্য করেছেন। বলা বাহুল্য, বিশ্বনাথ তাঁদের এই সুযোগ দিয়েছেন। বিশ্বনাথ রসকে আনন্দাস্বাদ থেকে নিশ্চয়ই অভিন্ন বস্তু মনে করেন, কিন্তু যে-শব্দার্থ বা বাক্য থেকে ঐ আনন্দাস্বাদ প্রতিপাদিত হয় সে বিশিষ্ট শব্দার্থ বা বাক্যের কোনও গুণের (যেমন ব্যঞ্জকতা) উল্লেখ তিনি করেন নি। বিশ্বনাথের সমালোচিত মম্মটাচার্যের লক্ষণ বরংচ এদিক থেকে স্পষ্ট ও ঋজু। অথচ মম্মটাচার্যের দৃষ্টি যে রসবিষয়িণী ধ্বনিবিষয়িণী ছিল না, এ তাঁর শত্রুও বলতে পারে না। গুণ দোষ বিবেচনায় তিনি রসকেই কাব্যের মুখ্যবস্তু বা অঙ্গী ব'লে গ্রহণ করেছেন। আবার "অনলংকৃতী পুনঃ কাপি" লক্ষণের এই অংশের বৃত্তিতে উদাহরণ দিয়ে তিনি বোঝাচ্ছেন "অত্র স্ফুটো ন কশ্চিদলংকারঃ, রসস্য হি প্রাধান্যাৎ নালংকারতা"। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, রসের আলোকেই যদিচ মম্মটাচার্য কাব্যের

স্বরূপ নির্দেশ করেছেন, স্বরূপের বাচক হিসেবে রসের উপস্থাপনার প্রয়োজন বোধ করেন নি। এমন হতে পারে যে, অপ্রত্যক্ষ বস্তুর আশ্রয়ে না গিয়ে প্রত্যক্ষ বস্তুকেই কাব্যের জ্ঞাপক করতে চেয়েছেন। এমনও হতে পারে যে, রসবাদের অন্যতম প্রধান আচার্য হলেও তাঁর পূর্বাচার্যদের অর্থাৎ অলংকার ও রীতিপ্রস্থানের প্রসিদ্ধ আচার্যগণের কাব্যস্বরূপ নির্ণয়ের পন্থাকে তিনি প্রারম্ভেই গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন। এমনও সম্ভব যে, বিশিষ্ট শব্দার্থ রসের প্রতিপাদক হতে পারে এই মূল্যবান্ ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি কাব্যস্বরূপ নির্ণয়ে শব্দার্থের সেই বিশেষ বিশেষ গুণের উল্লেখেই যত্নবান্ হয়েছেন। যে-কোনও কারণেই হোক রসপ্রস্থানের প্রধানতম আচার্য কাব্যের লক্ষণ নির্দেশে প্রত্যক্ষভাবে 'রস' শব্দের অবতারণা করেন নি। বিশ্বনাথ করেছেন, অথচ তাঁর লক্ষণ যে পর্যাপ্ত হয়েছে এমন কথাও স্বীকার করা যায় না।

এরকম ক্ষেত্রে কাব্যের একটি সহজ অথচ উত্তম লক্ষণের জন্য মন আগ্রহশীল হয়। আমরা পূর্বে দেখেছি বক্রোক্তিজীবিতকারের লক্ষণ তাঁর দিক থেকে সম্পূর্ণ বলা চলে, কারণ, তিনি অনপেক্ষিত বিষয় বলেন নি, অপেক্ষিত বিষয়ের উল্লেখ-বাহুল্য ঘটাননি। কিন্তু তাঁর লক্ষণও খুব পরিস্ফুট ও সহজ হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। এরকম ক্ষেত্রে পূর্বোল্লিখিত ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব রসিক কবিকর্ণপূরের "কবিবাঙ্‌নির্মিতিঃ কাব্যম্" এই সহজ ও সারগর্ভ এবং "অব্যাপ্তি-অতিব্যাপ্তি দোষরহিত" লক্ষণটিও বিবেচনা ক'রে দেখতে বলি। তিনি নিম্নলিখিতভাবে তাঁর লক্ষণের সম্পূর্ণতার দিক্‌টি বুঝিয়ে বলেছেন—"বাগিত্যুক্তে বাঙ্‌মাত্রস্যৈব কাব্যত্বাপত্তিঃ। নির্মিতিরিত্যুক্তে কবিকৃতশিল্পান্তরস্যাপি। বাঙ্‌নির্মিতিরিত্যুক্তে ব্যাখ্যাতৃবিশেষস্য যস্য কস্যাপি ব্যাখ্যাকৌশলস্যাপি। অসাধারণচমৎকারকারিণী রচনা হি নির্মিতিঃ। তেন রসাপকর্ষদোষরহিতঃ যথাসম্ভবগুণালংকাররসাত্মক-শব্দার্থযুগলং কাব্যমিতি লক্ষণস্য স্বরসঃ।" অর্থাৎ কবির বাক্ কাব্য কেবল এই কথা বললে যে-কোনও বাক্যই কাব্য হয়ে পড়ে। কবির

নির্মিতি এই কথা বললে কবিকৃত চিত্ররচনাদি শিল্পান্তরও কাব্যলক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। 'কবি' শব্দ ব্যবহার না করলে যে-কোনও ব্যাখ্যাতার যে-কোনও ব্যাখ্যা-কৌশলই কাব্য হয়। অসাধারণ-চমৎকার উৎপাদন করতে পারে এমন রচনাকেই নির্মিতি এই আখ্যা দেওয়া যায়। এইজন্য রসাপকর্ষকদোষশূন্য, যথাসম্ভব গুণ অলংকার রসাদি দ্বারা যুক্ত শব্দার্থই কাব্য—এই হল লক্ষণের অভিপ্রায়। এই লক্ষণবাক্যে কেউ কেউ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ বা 'Petitio Principii' হেত্বাভাস ধরতে পারেন। অর্থাৎ মনে করতে পারেন যে, ঐ লক্ষণ থেকে কবিধর্মান্বিত ব্যক্তি কবি এবং কাব্যধর্মান্বিত বস্তু কাব্য এরকম অর্থবোধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। অথবা লোকোত্তর চমৎকার রচনা যাঁর তিনি কবি, আর তাঁর ঐ লোকোত্তর চমৎকার রচনা কাব্য, এরকম বক্তব্যে যা প্রতিপন্ন করতে চাই তাকেই উপাদানীভূত ক'রে নেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে দোষ নিরাকরণের জন্যে কবিকর্ণপূর বলেছেন যে, এখানে 'কবি' শব্দ অতিপ্রসিদ্ধ এবং পারিভাষিক সংজ্ঞা। অথবা, যদি এমন বলা যায় যে, 'গো' পদার্থের মধ্যে যেমন গোত্ব জাতি রয়েছে, তেমনি কবিব্যক্তির মধ্যে অসাধারণ ধর্ম কবিত্বজাতি রয়েছে—এর দ্বারাই কবির প্রতীতি হয়। সুতরাং এরকম প্রসিদ্ধক্ষেত্রে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটছে না। অতএব "কবিবাঙ্‌নির্মিতিঃ কাব্যম্‌" এই লক্ষণে কোনও আপত্তির কারণ থাকতে পারে না।

আমরা একথা যুক্তিযুক্ত মনে করি না যে, কাব্যবস্তু কালে কালে পরিবর্তনশীল ব'লে কাব্যকে মোটামুটি কোনও স্থির লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কারণ, বিষয় এবং রূপের পরিবর্তন ঘটলেও কাব্যের যা মৌলসত্তা—লৌকিকেতর আহ্লাদবোধকতা—তা অপরিবর্তন। অথচ বিশেষ হ'ল এই যে, শব্দার্থে বহির্বিন্যাস ছাড়া ঐ আনন্দের বা রমণীয়তার প্রতিপত্তির অন্য কোনও উপায় নেই। এজন্য কাব্যের (বা ব্যাপকভাবে সাহিত্যের) লক্ষণে ঐ দুটি দিকই একত্র উপস্থাপনের অপেক্ষা রাখে। 'কবিব্যাপারের দ্বারা গ্রথিত বাঙ্‌নির্মাণ' অথবা

'রমণীয়ার্থপ্রতিপাদক বাঙ্‌নির্মাণ' আমাদের প্রত্যাশার কাছাকাছি যায়। এজন্য আচার্য জগন্নাথের "রমণীয়ার্থপ্রতিপাদক শব্দই কাব্য" এই লক্ষণকে আমরা বিশ্বনাথ কবিরাজের অতি সংক্ষিপ্ত ও জটিল লক্ষণ থেকে উন্নত ব'লে মনে করি।

কাব্যের এই অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গকে, আত্মা ও দেহকে একত্র ক'রে কাব্যদর্শনই যে যথার্থদর্শন এবিষয়ে আধুনিক মনীষীদের বিচারের সাক্ষ্য নেওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে অপ্রাপণীয় সুদূরের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন। অথচ কাব্য-সমালোচনায় দেখি তিনি অন্তর্লোক, এবং বহির্লোক, রস ও রূপকে সমান অধিকার দিয়েছেন। তাঁর অভিমত 'পূর্বকথা'য় উল্লিখিত হয়েছে। বলা বাহুল্য তিনি কাব্যের বিষয়বস্তু অর্থাৎ কাব্যের কথার চেয়ে প্রকাশের উপরেই জোর দিয়েছেন বেশি।

পাশ্চাত্ত্য মনীষীরা

আত্মদর্শনেচ্ছু ক্রোচে প্রকাশধর্মকে কবির প্রাতিভ-দর্শনের সঙ্গে একীভূত করে দেখেছেন, প্রকাশধর্মকে পৃথক্ দেখেন নি, নগণ্যও করেন নি। যদিও একথা ঠিক যে, মাত্র বহিরঙ্গ কৌশল হিসেবে অলংকরণকে তিনি নিন্দিত করেছেন। A. C. Bradley তাঁর 'Poetry for Poetry's Sake' আলোচনায় কবিবচনের ছন্দোময়তা ও আলংকারিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাব বা বস্তু ছন্দ ও ভাষার সঙ্গে একাত্ম হয়েই কাব্য গড়ে তোলে। 'Content' এবং 'form'কে তিনি অভিন্নভাবেই দেখেছেন এবং ছন্দ ও ভাষার উপর কম গুরুত্ব আরোপ করেন নি। "Just as the lines and their meaning are to you one thing, not two, so in poetry the meaning and the sounds are one." অন্যত্র তিনি বলছেন—

> Pœtry is an art of language; and the born poet, of whatever size, is a person who has a peculiar gift for translating his experiences—whatever he sees, hears,

> feels, imagines, thinks—into metrical language, a special necessity in his nature to do this, and a unique joy in doing it well.

কবি কোল্‌রিজ কাব্য ও গদ্যের পার্থক্য নির্ণয় প্রসঙ্গে শব্দের উপর জোর দিয়ে কাব্যের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন—'The best words in their best order'. শেলি কাব্যের লক্ষণ 'expression of imagination' ব'লেই পরমুহূর্তে ভাষাদেহের উপর সমুদয় গুরুত্ব অর্পণ করেছেন—

> "Their language is vitally metaphorical .. A single sentence may be considered as a whole, a single word even may be a spark of inextinguishable thought."

কবি কীট্‌স্ কাব্যে আতিশয্যমূলক চমৎকারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। ইংরেজিতে কাব্যের স্বরূপ বিচার ক'রে লক্ষণ নির্ণয় করতে যথার্থভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন Theodore Watts Dunton. তিনি কাব্যের লক্ষণ নির্ণয়ে কেবল আত্মার কথাই উল্লেখ করেন নি, অন্তরঙ্গ ভাষাভঙ্গির কথাও বলেছেন—

> Absolute poetry is the concrete and artistic expression of the human mind in emotional and rhythmical language. (Ency. Britt.)

এর 'human mind' এর জায়গায় 'Poet's mind' বসালেই আমরা কবিকর্ণপূরের নির্ণীত লক্ষণে এসে পড়ি। তাছাড়া Concrete and artistic expression অর্থাৎ সবিশেষের এবং অলৌকিক চমৎকারকারী প্রকাশের অধিকার তো সাধারণ মানবচিত্তের থাকতে পারে না। কাব্যের লক্ষণ নির্ণয়ে এবং স্বরূপ ব্যাখ্যানে যে সব পাশ্চাত্ত্য মনীষী এর শুধু আন্তর ধর্ম বা উপাদানের উপর জোর দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ওআর্ডস্‌ওআর্থ, ম্যাথু আর্‌নল্‌ড্ এবং টলস্‌টয়ের অভিমত স্মরণযোগ্য। ওআর্ডস্‌ওআর্থের মতে এ হ'ল 'Spontaneous overflow of powerful feelings' এবং

'Emotions recollected in tranquility', টল্‌স্‌টয়ের মতে সাধারণ মানবকথার ভাবাত্মক বিবৃতি। লক্ষণীয় এই যে কাব্যবস্তু, হিসেবে যাঁরা Emotion-কে অগ্রাধিকার দিতে চেয়েছেন আধুনিক কবি সমালোচক এলিঅট্ তাঁদের অভিমতের বিরুদ্ধতাই করেছেন। Wordsworth-এর সমালোচনায় তিনি ভাবের বিস্তারের থেকে ভাবের সংযমনকেই কাব্যপরমার্থ ব'লে মনে করেছেন। ভাবাতিরেক প্রকাশের পরিবর্তে তিনি আবেগের একটি বস্তুরূপ, কোনো চিত্রকল্প—সন্নিবেশের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এবিষয়ে ম্যাথু আর্‌নল্‌ডের উক্তিই বহু-উল্লিখিত এবং দৃঢ় উপলব্ধির পরিচয়যুক্ত—'...as a criticism of life under conditions fixed for the law of poetic truth and poetic beauty.' ম্যাথু আর্‌নল্‌ড্ কাব্যের উচ্চতম অধিকার ও মর্যাদার পক্ষপাতী। কিন্তু গৌণভাবে হলেও প্রকাশধর্মান্বিত কাব্যসৌন্দর্যের দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করতে ভোলেন নি। পাশ্চাত্ত্যে কাব্যের এরকম শিথিল ও পরস্পরবিরোধী লক্ষণব্যাখ্যাকে লক্ষ্য ক'রে Richards তাঁর Principle of Criticism গ্রন্থে এর অসারতা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন। Bradley তাঁর Poetry for Poetry's Sake বক্তৃতায় কবিতার লক্ষণ নির্ণয়কে অসম্ভব ব'লেই মনে করেছেন। বস্তুতঃ কাব্যাস্বাদরূপ অনুভবকে ঠিক কোনও নামের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। বিশ্বনাথ কবিরাজ রসাবস্থার বর্ণনায় তাকে যে ব্রহ্মাস্বাদসহোদর বলেছেন সে কেবল ঐ অনির্বচনীয় অবস্থাকে ভাষায় বর্ণনা করবার জন্য। একজন মার্কিন কবি কাব্যবস্তুকে এই ভাবে বচনীয় করতে চান—Poetry is a language that tells us, through a more or less emotional reaction something that cannot be said. All poetry great or small does this. And it seems to me that poetry has two outstanding characteristics. One is that, it is, after all, undefinable. That other is that it is eventually unmistakable.

ব্যাপকভাবে দেখতে গেলে শুধু কাব্য-কবিতা নয়, নাটক উপন্যাস গল্প, এমন কি সংগীত চিত্র ভাস্কর্য স্বরূপের দিক থেকে অভিন্ন। সাহিত্যের পথে গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে এই ব্যাপক পটভূমির মধ্যেই দেখেছেন এবং এর অলৌকিক চমৎকারিতা বা আহ্লাদ-জনকতার বিষয়টি পুনঃপুনঃ নিবেদন করেছেন। কাব্যকলাকে প্রাচীনেরা 'বিষ্ণুর অংশ', 'চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তি'র সহায়ক প্রভৃতি রূপে যে মন্তব্য করেছেন তা ঠিক অধ্যাত্মের দিক থেকে তেমন নয়, যেমন লৌকিক বৈষয়িক রূঢ়তা থেকে মুক্তির আনন্দ দেওয়ার জন্য। রবীন্দ্রনাথ তো কাব্যানন্দ তথা মর্ত্যের সৌন্দর্য প্রেম থেকে আগত আনন্দকেই ঈশ্বরীয় আনন্দ মনে করেন। তাঁর ধারণায় সৃষ্টির বাইরে কোনো তুরীয়তা নেই। আর যে-চারুতাময় শব্দার্থ এই আনন্দের উপায় এবং কাব্যের সঙ্গে অভিন্ন তার স্বরূপের আলোচনায় প্রাচীনেরা এত আয়াস স্বীকার করেছেন।

কাব্যের স্বরূপ নির্দেশের সঙ্গে কাব্যের উদ্দেশ্য নিরূপণও প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কারণ, কাব্যের স্বরূপ তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। অথচ এই বিষয়টি নিয়ে বাদানুবাদ হয়েছে বিস্তর এবং বিতর্কের সমাপ্তি আজও ঘটেনি। এক শ্রেণীর পাঠক ও সমালোচকের অভিমতে কাব্যের উদ্দেশ্য দর্শক, পাঠক বা শ্রোতার চিত্তে উপরি-উক্ত আনন্দানুভবের উদ্বোধন ঘটানো। ভিন্নশ্রেণী এই রসানন্দকে খুব উচ্চমূল্য দেন না, তাঁদের মতে ধর্ম বা লোকহিত জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় এবং যে কাব্যের ফল ধর্মলাভ বা মানবসমাজের কল্যাণ তা-ই উচ্চশ্রেণীর এবং যথার্থ কাব্য। কাব্য যে আনন্দ দেয় তা যদি পাঠক বা শ্রোতার মনকে পরিশোধিত ক'রে ধর্ম বা লোকহিতের দিকে উন্মুখ না করে তাহ'লে তা ব্যর্থ। এ দুই অভিমত পরস্পর-বিরুদ্ধ এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী অর্থাৎ আপোসে মীমাংসা হতে পারে এমন কোনো পথ আছে ব'লেও মনে হয় না। এ সম্পর্কে

কাব্যের উদ্দেশ্য

বিশিষ্ট মনীষীদের অভিমত প্রণিধান করলে দেখা যাবে তাঁরা অনেকেই ঐ আনন্দসম্মোহাবস্থার বা অলৌকিক চমৎকারের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।

Aristotle তাঁর কাব্যানুশাসনে যদিচ কাব্য-নাটকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কোনও নির্দেশ দেন নি, তবু তিনি যেভাবে কাব্যের স্বরূপ বিচার করেছেন, ইতিহাসাদির লক্ষ্য থেকে একে পৃথক ক'রে দেখেছেন, এবং নাট্যদর্শনের পরিণাম সম্বন্ধে যে নির্দেশ দিয়েছেন তাতে একথা অস্পষ্ট থাকে না যে, তিনি আনন্দানুভূতিকেই কাব্যের উদ্দেশ্যরূপে গণ্য করেছেন। তাঁর 'purgation of the emotions' সম্বন্ধে ভিন্নমুখী আলোচনা স্মরণে রেখেও একথা বলা যায় যে, তিনি এদেশীয় রসবাদী আলংকারিকদের মত ভাব থেকে রসে রূপান্তরের দিক্‌টিই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ একে অপ্রয়োজনের আনন্দ ব'লে অভিহিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র—কাব্যের 'মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি এবং গৌণ উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধিজনন'—এরকম অভিমত প্রকাশ ক'রে বস্তুতঃ আহ্লাদবোধকতার দিকেই পক্ষপাত জানিয়েছেন। Bradley তাঁর 'Poetry for Poetry's Sake' নামীয় সংক্ষিপ্ত অথচ নিপুণ আলোচনায় কাব্যকে তার নিজ মূল্যেই মূল্যবান করে দেখেছেন এবং "art for art's sake" সম্প্রদায়ের উগ্র পথিকদের অভিমতকে মান্য না ক'রেও সৌন্দর্যবোধ বা কাব্যানন্দকেই কাব্যের অনুধাবনীয় সমুন্নত লক্ষ্য ব'লে নির্ধারণ করেছেন। তিনি এক্ষেত্রে কাব্যেতর-বিষয়-বাদীদের সমালোচনা ক'রে বলছেন—

> Poetry may have also an ulterior value as a means to culture or religion ; because it conveys instruction, or softens the passions, or furthers a good cause ; because it brings the poet fame or money or a quiet conscience. So much the better : let it be valued for these reasons too. But its ulterior worth neither is nor can directly determine its poetic worth as a satisfying imaginative experience ; and this is to be judged entirely from

> within ..... The consideration of ulterior end, whether by the poet in the act of composing or by the reader in the act of experiencing, tends to lower poetic value. It does so because it tends to change the nature of poetry by taking it out of its own atmosphere. For its nature is to be not a part, nor yet a copy, of the real world, but to be a world by itself, independent, complete, autonomous ; and to possess it fully you must enter that world, conform to its laws, and ignore for the time the beliefs, aims and particular conditions which belong to you in the other world of reality.

সম্পূর্ণ কলাকৈবল্যবাদী না হ'লেও মনীষী Walter Pater সৌন্দর্য-জননকেই কাব্যের উদ্দেশ্য ব'লে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে কবি কীট্‌স্ এবং কবি Goethe-র ধারণাই বেশি স্পষ্ট এবং আমাদের প্রত্যাশার কাছাকাছি। গোয়েটের মতে—The beautiful is higher than the good, the beautiful includes in it the good. কবি কীট্‌স্ যে Æsthetic joy-কেই কাব্যের লক্ষ্য ব'লে মনে করেন তা তাঁর 'A thing of beauty is a joy for ever', 'Beauty is truth' প্রভৃতি উক্তি থেকে ধরা যায়। কবি শেলী কাব্যের আনন্দ-দায়কতা ছাড়া সমাজ-শোধনও কাব্যের মহান্ লক্ষ্য ব'লে মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের বক্তৃতা ও প্রবন্ধগুলিতে বিশুদ্ধ সাহিত্যিক আনন্দ পরিবেশনকেই সাহিত্যের লক্ষ্য ব'লে জানিয়েছেন—

> "তাঁকে বলা হয়েছে সচ্চিদানন্দ। এর মধ্যে আনন্দটিই হচ্ছে সব শেষের কথা—এর পরে আর কোনো কথা নেই। সেই আনন্দের মধ্যেই যখন প্রকাশের তত্ত্ব, তখন এ প্রশ্নের কোনো অর্থই নেই যে আর্টের দ্বারা আমাদের কোনো হিতসাধন হয় কিনা।"

> "অপর পক্ষে, যে প্রকাশ-চেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, আপন প্রয়োজনের রূপকে নয়, বিশুদ্ধ আনন্দরূপকে ব্যক্ত করা, সেই চেষ্টারই সাহিত্যগত ফলকে আমি রসসাহিত্য নাম দিয়েছি।"

> "গানে কি কারো কোনো লাভ আছে? চিত্রকলায় কি অন্নবস্ত্রের অভাব দূর হয়?"
>
> "বলা বাহুল্য, বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়, তার যে রস সে অহৈতুক।...এই আনন্দ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে ব'লে জানিনে।"

কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, কবি-সমালোচক তাঁর 'সাহিত্য' গ্রন্থের সৌন্দর্য-বোধ প্রবন্ধে এবং 'প্রাচীন সাহিত্যে'র কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার আলোচনায় মঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত ক'রেই সাহিত্যের উদ্দেশ্য নিরূপণ করেছেন। যেমন শকুন্তলার আলোচনায় তিনি বলছেন—"সৌন্দর্যের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, মঙ্গলের দ্বারা, পাপ একেবারে চিত্তের ভিতর হইতে বিলুপ্ত, বিলীন হইয়া যাইবে ইহাই আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির আকাঙ্ক্ষা। সংসারে তাহার সহস্র বাধা-ব্যতিক্রম থাকিলেও ইহার প্রতি মানবের অন্তরতর লক্ষ্য একটি আছে। সাহিত্য সেই লক্ষ্য সাধনের নিগূঢ় প্রয়াসকে ব্যক্ত করিয়া থাকে। সে ভালোকে সুন্দর, সে শ্রেয়কে প্রিয়, সে পুণ্যকে হৃদয়ের ধন করিয়া তোলে।" বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনার সময় একদিকে প্রাচীন জীবনের ভাবাদর্শ, আর একদিকে পাশ্চাত্ত্য ট্র্যাজেডির নীতিমূলক ব্যাখ্যার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

বিখ্যাত শুদ্ধসৌন্দর্যবাদী ক্রোচের অভিমত দেখা যাক। তিনি 'Æsthetic' গ্রন্থে কলাবস্তুর উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষতাকে খুব প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন—

> "The search for the end of art is ridiculous, when it is understood of art as art. And since to fix an end is to choose, the theory that the content of art must be selected is another form of the same error."

এদেশীয় অধ্যাত্মবাদী মনীষী শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সাহিত্য সম্পর্কিত লেখনে সাহিত্য-সৌন্দর্য সম্পর্কে যদিচ খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করেছেন, তবু উচ্চতর জীবননীতির সঙ্গে শুদ্ধ সৌন্দর্যকে মিলিত

ক'রেই দেখেছেন। তাঁর একটি পত্রে তিনি রূপবাদী কলাকৈবল্য-মতের পোষকদের অভিপ্রায় তুলে ধ'রে, সাহিত্যকলায় বিষয়বস্তু কিছু নয়, কলারূপটাই সর্বস্ব এমন অভিমতের অযৌক্তিকতা দেখাতে চেয়েছেন—

> "Just as technique is not all, so even Beauty is not all in Art. Art is not only technique or form of Beauty, not only the discovery or the expression of Beauty—it is a self-expression of consciousness under the conditions of æsthetic vision and a perfect execution. Or to put it otherwise, there are not only æsthetic values, but life values, mind values, soul values that enter into art."

দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ একজন বিশিষ্ট রূপদক্ষ হয়েও বিষয়বস্তু একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। 'সাহিত্য-ধর্ম' প্রবন্ধে তিনি বলছেন—"যে-মন বরণীয়কে বরণ ক'রে নেয় তার শুচিবায়ুর পরিচয় দিই। সজনে ফুলে সৌন্দর্যের অভাব নেই। তবু ঋতুরাজের রাজ্যাভিষেকের মন্ত্রপাঠে কবিরা সজনে ফুলের নাম করেন না। ও যে আমাদের খাদ্য এই খর্বতায় কবির কাছেও সজনে আপন ফুলের যাথার্থ্য হারাল।···বিম্ব যদি ঝোলে ডাল্‌নায় লাগত তাহোলে সুন্দরীর অধরের সঙ্গে তার উপমা অগ্রাহ্য হোত। তিসিফুল শর্ষেফুলের রূপের ঐশ্বর্য প্রচুর, তবু হাটের রাস্তায় তাদের চরমগতি ব'লেই কবি-কল্পনা তাদের নম্র নমস্কারের প্রতিদান দিতে চায় না।" পুনশ্চ আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রসঙ্গে—"তুচ্ছ ও মহতের, ভালো ও মন্দের, কাঁকর ও পদ্মের ভেদ অসীমের মধ্যে নেই, অতএব সাহিত্যেই বা কেন থাকবে এমন একটা প্রশ্ন পরম্পরায় কানে উঠল। এমন কথারও কি উত্তর দেওয়ার দরকার আছে? যাঁরা তুরীয় অবস্থায় উঠেছেন তাঁদের কাছে সাহিত্যও নেই, আর্টও নেই, তাঁদের কথা ছেড়েই দেওয়া যায়। কিন্তু কিছুর সঙ্গে কিছুরই মূল্যভেদ যদি সাহিত্যেও না থাকে তাহোলে পৃথিবীর সকল লেখাই তো সমান দামের হয়ে ওঠে।" কিন্তু দেখা যায়, শেষের দিকের রচনায় কবি নিজেই এই প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের বিলোপ ঘটাতে চেয়েছেন।

পুনশ্চ সংস্কৃত কাব্যরসিকদের কাব্যানুশীলনের মধ্যে আসা যাক। এঁরা অনেকেই চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তির উপায়রূপে কাব্যকে দেখেছেন। অনেকেই আবার কাব্যচমৎকৃতির কাছে ধর্ম-মোক্ষলাভকেও তুচ্ছ ক'রে দেখেছেন। আমাদের মনে হয় কাব্যের উদ্দেশ্য বর্ণনার সময় এবং অন্যত্রও এঁরা সামাজিকদের দুইভাগে বিন্যস্ত করে কাব্য সম্পর্কে সাধারণ এবং বিশেষ এই দুই শ্রেণীর প্রয়োজনের দিকই বিবৃত করেছেন। কাব্যের জগৎ থেকে কাউকে বর্জন করতে চান নি। যেমন, মম্মট ভট্ট বলছেন—'কাব্যং যশসে' ইত্যাদি—কাব্য রচনা এবং আলোচনায় যশ, অর্থ, লোকব্যবহার-শিক্ষা প্রভৃতি লাভ হয়, এতে অমঙ্গলের বিনাশ হয়, সদ্যঃপরম শান্তি পাওয়া যায় এবং কান্তার মত মধুর বাক্যে উপদেশ সুলভ হয় ইত্যাদি। ইনিই কিন্তু গ্রন্থারম্ভে বাগ্‌বন্দনায় "হ্লাদৈকময়ীম্ অনন্যপরতন্ত্রাং" বলে কবিবাণীকে বিশেষিত করেছেন। যে-বিশ্বনাথ কবিরাজ উগ্র রসবাদিতার পরিচয় দিয়েছেন এবং কাব্যরসকে 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' প্রভৃতি ব'লে বর্ণনা করেছেন তিনি গ্রন্থারম্ভে বলছেন—

চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তিঃ সুখাদল্পধিয়ামপি।
কাব্যাদেব যতস্তেন তৎস্বরূপং নিরূপ্যতে ॥

"যেহেতু কাব্যের পাঠ বা শ্রবণ থেকে স্বল্পবুদ্ধিরাও সানন্দে চতুর্বর্গফল লাভ করতে পারে সেই হেতু কাব্যের স্বরূপ নির্দিষ্ট হচ্ছে।"

কবি জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দের গীতমধ্যে 'মঙ্গল'কে কাব্যের লক্ষ্যীভূত করেছেন, যেমন, 'শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদঁ মঙ্গল-মুজ্জ্বলগীতিঃ।' আবার প্রারম্ভে 'যদি হরিস্মরণে সরসং মনো' ইত্যাদিতেও ধর্মকে লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু তাঁর গীতের সমাপ্তি অংশে সংস্কৃত বচনের মধ্যে একেবারে ভিন্নদৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন—

সাধ্বী মাধ্বীক চিন্তা ন ভবতি ভবতঃ শর্করে কর্করাসি
দ্রাক্ষে দ্রক্ষ্যন্তি কে ত্বামমৃত মৃতমসি ক্ষীর নীরং রসস্তে।
মাকন্দ মা ক্রন্দ কান্তাধর ধরণিতলং গচ্ছ যচ্ছন্তি যাবদ্
ভাবং শৃঙ্গারসারস্বতমিহ জয়দেবস্য বিষ্বগ্‌বচাংসি ॥

অর্থাৎ, কবি জয়দেবের বাণী যতদিন মধুররসময় ভাব বিস্তার করতে থাকবে ততদিন 'মধু'র চিন্তা কেউ করবে না, শর্করা কর্করের মত কঠিন ও বিস্বাদ প্রতীত হবে, দ্রাক্ষারসের দিকে কেউ ফিরেও তাকাবে না, দুগ্ধ নীরের মত হয়ে যাবে, আম্র রোদন করবে, আর কান্তার অধর লজ্জায় পাতালে প্রবেশ করবে।

বক্রোক্তিজীবিতকার কাব্যের পার্থিব প্রয়োজন সাধনের দিক উল্লেখ ক'রেই পরমুহূর্তে এর কাছে চতুর্বর্গপ্রাপ্তিকে অশ্রদ্ধেয় প্রতিপন্ন করেছেন। বস্তুতঃ এর মধ্যে তিনি কাব্য-শ্রবণদর্শনেচ্ছু তিন সম্প্রদায়ের মানুষকে লক্ষ্য করেছেন—

ধর্মাদিসাধনোপায়ঃ সুকুমারক্রমোদিতঃ।
কাব্যবন্ধোঽভিজাতানাং হৃদয়াহ্লাদকারকঃ॥
ব্যবহারপরিস্পন্দসৌন্দর্যং ব্যবহারিভিঃ।
সৎকাব্যাধিগমাদেব নূতনৌচিত্যমাপ্যতে॥
চতুর্বর্গফলাস্বাদমপ্যতিক্রম্য তদ্বিদাম্।
কাব্যামৃতরসেনান্তশ্চমৎকারো বিতন্যতে॥

অর্থাৎ, অভিজাত রাজপুত্রাদি কাব্য থেকে চিত্তাকর্ষকভাবে আনন্দের সঙ্গে চতুর্বর্গফল লাভ করতে পারে। লোকব্যবহার, কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে যারা জ্ঞান অর্জন করতে ইচ্ছুক, তারা কাব্য অনুশীলন করলে ঐসব বিষয়ের সৌন্দর্য অভিনব ঔচিত্যের সঙ্গে তাদের কাছে প্রতিভাত হবে। আর যাঁরা কাব্যানন্দের স্বরূপ জানেন সেইসব সহৃদয়ের অন্তরে চতুর্বর্গফললাভকে অতিক্রম ক'রে তার অধিক এক বিশেষ চমৎকারজনক আহ্লাদ স্ফুরিত হবে। কাব্যাস্বাদকে ব্রহ্মাস্বাদ থেকে অধিকতর কাম্য ব'লে মন্তব্য করেছেন ভট্টনায়ক *—

বাগ্‌ধেনুর্দুগ্ধমেকংহি রসো যল্লাভতৃষ্ণয়া।
তেন নাস্য সমঃ স স্যাদ্ দুহ্যতে যোগিভির্হি যঃ॥

অর্থাৎ, বাক্ হ'ল ধেনু, দুগ্ধই হল এই রস। এই রসলাভে তৃষাতুর রসিকেরা যা পান, যোগিদের ব্রহ্মাস্বাদ তার তুলনীয় নয়। নাট্যসূত্র-সংগ্রাহক ভরত কিন্তু নাট্যকে কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় রসিকের আনন্দ-

* ৺অতুলচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক 'কাব্যজিজ্ঞাসা' পুস্তকে উল্লিখিত

স্বাদহেতু ব'লে গ্রহণ করতে পারেন নি। সর্বজনীন দৃষ্টি নিয়ে তিনি দেখেছিলেন যে নাট্যকলা সংসার-অরণ্যের দাবদগ্ধ মানুষের আশ্রয়স্থল। দুঃখার্ত, শ্রমার্ত, শোকার্ত ও হতভাগ্য ব্যক্তি নাট্যদর্শনে চিত্তের বিশ্রামসুখ লাভ করতে পারে। ভরতের সঙ্গে টল্‌স্‌টয়ের তথা আধুনিক সমাজবাদী মানবিক মতামতের সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

এইভাবে কাব্য নাট্য সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মনীষীর অভিমত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এঁদের অনেকেই অ-লৌকিক (আধ্যাত্মিক নয়, লৌকিকেতর) কাব্যসৌন্দর্যকে কাব্যপাঠের বা নাট্যাদি দর্শনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করেছেন এবং কাব্যকে সৌন্দর্য থেকে ভিন্ন মূল্যে মূল্যবান্ করে দেখেননি। কিন্তু তথাপি যে সব সুমহৎ কাব্যসৃষ্টিতে কাব্যানন্দের সঙ্গে উচ্চতর জীবনভাবুকতা, ধর্মবোধ এবং নীতিবোধ সংযুক্ত থাকে (যেমন, রামায়ণ, মহাভারত, দান্‌তে-মিল্‌টনের কাব্য, শেক্‌স্‌পীয়রের কোন কোন নাট্য, টলস্‌টয়ের ও বঙ্কিমচন্দ্রের কোন কোন উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতা ও নাটক), তার গভীরতর আনন্দ দেওয়ার বিষয়টি স্মরণে রেখে এবং এর সঙ্গে ঐ ধরনের জীবন-পরিচয়-রিক্ত লঘু (অথচ যথার্থ এবং উত্তম) কাব্য-কবিতার পার্থক্য অনুধাবন করে শুদ্ধ সৌন্দর্য-বাদকে কাব্যবিচারে সমুচ্চ এবং একমাত্র স্থান দেওয়া যেতে পারে কিনা এ সংশয় থেকেই যায়। যদিও একথা কোনো মতেই মানা চলে না যে, ধর্ম অথবা নীতি অথবা লোকহিতই কাব্যের লক্ষ্য। পরিশেষে এর সমাধানে Walter Pater নির্দিষ্ট Great Art এবং Good Art-এর মত একটা বিভাগ নির্ধারণের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতেই হয় এবং স্বীকার করতেই হয় যে, কাব্যের রূপ এবং প্রকৃতি এক নয়, দুই, 'Two voices are there'. আর কাব্যানন্দের সঙ্গে ধর্ম-নীতি-ইতিহাসের বিরোধ-সমাধানের কথা বলতে গেলে, রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে উপনিষদের বচনের উল্লেখ করতে হয়,—যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ—কাব্যসৌন্দর্য যাকে বরণ করে নেয় সেই সহৃদয় বা রসজ্ঞের কাছেই তা লভ্য হয়।

কাব্য ও অলংকৃতি

(কাব্যং বাক্যংমলংকৃতম্ ?)

কাব্যের উদ্দেশ্য ও লক্ষণ নির্ণয় করে আমরা এখন তথাকথিত গুণ, রীতি এবং বিশেষভাবে অলংকারের সঙ্গে এর সম্পর্ক স্থির করতে চাই।

গুণ, রীতি, দোষ

গুণ বলতে, প্রাচীনেরা, কবির বক্তব্য উত্তম স্ফূর্তি লাভ করে এমন বিশেষ ধরনের রচনাসম্পদ্ বুঝতেন। রচনার গাঢ়ত্ব, অশৈথিল্য, সহজবোধ্যতা, সুকুমারবর্ণ-প্রযুক্তি, অনধিক অনল্প অনুপ্রাসের যোজনা প্রভৃতি এই গুণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরকম দশটি গুণের উদাহরণসহ উল্লেখ দণ্ডী করেছেন এবং বৈদর্ভী রীতির প্রাণ-স্বরূপ বলে এদের উল্লেখ করেছেন। আবার গৌড়ী রীতির লেখকেরা বৈদর্ভীর বিপরীত মার্গ অর্থাৎ অনুপ্রাসবহুল, পরুষাক্ষরযুক্ত, দীর্ঘসমাসবদ্ধ বাক্য পছন্দ করেন ব'লে তাদের নিন্দা করেছেন। গুণ বলতে এঁরা দোষাভাব মনে করেন নি, এমন কতকগুলি ধ্রুব রচনাবৈশিষ্ট্য এঁদের লক্ষ্যে ছিল যা নইলে কাব্য গড়ে উঠতো না। এইজন্যই বামন বলেছেন 'কাব্যশোভার কর্তৃত্ব হ'ল গুণের।' পরবর্তী কালে রসবাদ গড়ে উঠলে গুণের দশ সংখ্যা তিন সংখ্যায়* সীমিত করা হলেও কাব্যের সঙ্গে গুণের সম্বন্ধ নিয়ত বলেই স্বীকার করা হয়েছে। কাব্য-প্রকাশে বলা হয়েছে—'অচলস্থিতয়ো গুণাঃ।' অথবা 'এরা দেহীর গুণ শৌর্যাদির মত, রসরূপ আত্মার উৎকর্ষকারক'। সুতরাং গুণ কাব্যবিধায়ক শব্দার্থের মৌলধর্ম। আর গুণের বিরুদ্ধতাই হ'ল দোষ। পাশ্চাত্ত্যে যাকে Poetic Diction

* শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য, সুকুমারতা, অর্থব্যক্তি, উদারত্ব ওজঃ, কান্তি ও সমাধি এই দশগুণের কেবল ওজঃ, প্রসাদ এবং মাধুর্য গুণে পরিণাম।

বলা হয়, গুণ অনেকটা তাই। বস্তুতঃ এই গুণরূপ কাব্যের অতি প্রয়োজনীয় বস্তু আজও জীবন্ত ব'লে ধরা যায়। কাব্যাত্মার স্বরূপ-ভেদে এদের কোনটি কোথাও বেশি কোথাও কম থাকে মাত্র। যেমন আমরা বলতে পারি, মেঘনাদবধ কাব্যে সীতার বনবাস বর্ণনায় মাধুর্যগুণের সমাবেশ হয়েছে, বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের বাক্যে ওজঃ এবং প্রসাদগুণের, "দুই বিঘা জমি"তে প্রসাদ ও স্থানে স্থানে মাধুর্যগুণের, "নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জ ছায়ায়" গীতে কেবল মাধুর্যগুণের, "কেন পান্থ এ চঞ্চলতা"য় ওজঃ এবং মাধুর্য মিশ্রগুণের, "চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে" প্রভৃতিতে প্রসাদ ও মাধুর্যগুণের। ওজোগুণের ধর্ম হল রচনার গাঢ়বন্ধতা, প্রসাদগুণের ধর্ম হল অনায়াস অর্থবোধ, মাধুর্যের ধর্ম হল চিত্তকে সহজে আকৃষ্ট করা এবং দ্রবীভূত করতে সাহায্য করা।*

বলা বাহুল্য, প্রাচীনদের বিভক্ত এই গুণের সঙ্গে রীতির সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। গুণগুলিরই অল্পবিস্তর সমবায়ে রীতির উৎপত্তি। যেমন সমস্তগুণের সমবায়ে বৈদর্ভী, প্রায় সমস্ত গুণের সমবায়ে পাঞ্চালী, ওজঃকান্তি প্রভৃতি কয়েকটিমাত্র গুণের সমবায়ে গৌড়ী। সেকালে মোটামুটি স্থানবিশেষে রচনাগুণের কতকটা তারতম্য লক্ষ্য করে Style-এর ঐরকম নাম দেওয়া হয়েছিল। পাকাপাকি শ্রেণীবিন্যাসের অভিপ্রায়ে নয়। আলংকারিক বামন রীতিবাদী বলে কথিত, কারণ, 'কাব্যের আত্মা হল রীতি' এই অভিমত তিনি প্রকাশ করেছেন। আচার্য বামন কিন্তু গুণের দিক থেকে রীতির বিচার করেছেন কিনা বোঝা যায় না। তিনি বিশিষ্ট পদসংঘটনকেই রীতি বলেছেন। এই সন্নিবেশ গুণের দিক থেকে যদি হয় তা'হলে তো গুণই রীতির নিয়ামক হয়ে পড়ে; সে ক্ষেত্রে

* 'ওজশ্চিত্তবিস্তাররূপং দীপ্তত্বং।' 'ওজঃ গাঢ়বন্ধত্বম্'। 'চিত্তদ্রবীভাবময়হ্লাদো মাধুর্যম্।' 'চিত্তং ব্যাপ্নোতি যঃ ক্ষিপ্রং শুষ্কেন্ধনমিবানলঃ সঃ প্রসাদঃ।'

"রীতিরাত্মা কাব্যস্য" একথা বলার যৌক্তিকতা কোথায়? আর বিশিষ্টপদবিন্যাসই যদি কাব্যের আত্মা হয় তা'হলে গুণকে কোথায় রেখে দেখবো? রীতির জন্যেই কি গুণের অস্তিত্ব? অথবা গুণের মৌলিক সত্তা আছে? অর্থাৎ রীতি যেমনই হোক না কেন, গুণ থাকতেই হবে। দেখা যায়, বামন কাব্যবিষয়ে গুরুত্ব অনুযায়ী প্রথমে আত্মা রীতি, পরে কর্তৃত্বধর্মযুক্ত গুণ এবং শেষে কর্তৃত্বধর্মের সপক্ষে আতিশয্যকারক অলংকারের স্থান সন্নিবেশ করেছেন। কাব্যপ্রকাশে মম্মট বামনের এই গুণকর্তৃত্ব মান্য করেননি, আবার অলংকারের গুণসাপেক্ষতাও অগ্রাহ্য করেছেন। তা ছাড়া দেখা যায় বামন 'কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ' ব'লে অলংকারের উচ্চ স্থান নির্দেশও করতে চান। এইভাবে রীতিপথিক বামনের বক্তব্য কতকটা গোলমেলে হয়ে পড়েছে। বামনের পূর্ববর্তী ভামহ রীতির গুরুত্ব স্বীকারই করেননি। গৌড়ী অথবা বৈদর্ভী কোনও নির্দিষ্ট প্রথা অবলম্বন করে লিখলেই শব্দার্থ কাব্য হবে এ তিনি মানেননি। মনে হয়, কবি হিসাবে শব্দার্থের চারুত্বময় ভঙ্গি অসংখ্য হতে পারে এ রকম ধারণা তাঁর ছিল। দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শে বৈদর্ভী, গৌড়ী প্রভৃতি রীতির ব্যাখ্যা করলেও কবি হিসেবে রীতি যে অসংখ্য হতে পারে তাঁর এই ধারণার পরিচয় পাই তাঁর "অস্ত্যনেকো গিরাং মার্গঃ" এবং "তদ্ভেদাস্তু ন শক্যন্তে বক্তুং প্রতিকবিস্থিতাঃ" ইত্যাদি উক্তিতে।

ধ্বনি ও রস কাব্যের আত্মা স্বীকৃত হওয়ার ফলে পদসংঘটনের মূল্য কমে গেল। রীতি গুণের অথবা প্রায় শব্দানুপ্রাসেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল। রীতিবাদ প্রস্তরীভূত হয়ে পড়লে 'বৃত্তি' বলে আর একটি শব্দার্থগুণ কোনও কোনও আলংকারিক কল্পনা করেছিলেন। তাঁরা রসানুকূল বর্ণ যোজনাকে বৃত্তি নাম দিয়েছিলেন। অর্থাৎ এ হল শৃঙ্গার, বীর প্রভৃতি রসে প্রয়োজনমত কোমল বা পরুষাক্ষরের সন্নিবেশ। কিন্তু রসিকেরা এর গুণাতিরিক্ত অথবা অনুপ্রাসাদি থেকে ভিন্ন মর্যাদা দিতে চাইলেন না, এবং রীতির মত এটিও উপেক্ষিত হয়ে পড়ল স্বাভাবিকভাবেই। এইসব উদ্‌যোগ থেকে, আর যাই

হোক, এটুকু বোঝা যায় যে প্রাচীনেরা কাব্যকে জানতে এবং বুঝতে কতদূর প্রয়াস করেছিলেন এবং কত সূক্ষ্মবিচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

বাঙ্‌লা সাহিত্যের দিক থেকে প্রাচীন ভৌগোলিক রীতিবাদের মূল্য একেবারেই নেই। গুণধর্মের যে আছে সে কথা পূর্বেই বলেছি। বঙ্গকবিদের বিচিত্র গুণাত্মক শব্দার্থ-রচনা—ইংরেজিতে যাকে বলে style, তা ব্যক্তিস্বভাবচিহ্নিত ভিন্ন-আধারে-বিভিন্নরূপ রচনাধর্মের পটভূমিতে বিচার্য। লৌকিকভাবে আমরা এই বিচার আরোপ করেই বলে থাকি 'বঙ্কিমের স্টাইল', 'রাবীন্দ্রিক' ইত্যাদি। প্রতিভাবান্ ছোটবড় সমস্ত লেখকই তাঁদের নিজ নিজ বিশিষ্ট স্বভাবধর্ম অনুযায়ী বাচ্যবাচক অর্থাৎ শব্দার্থের সংযোগ-বিয়োগে মার্জন-ঘর্ষণে ভাষাসৃষ্টি করে থাকেন, স্বভাব অনুযায়ীই বাক্যে মাধুর্যাদিগুণসন্নিবেশ করেন, বক্রোক্তি বা চারুতার সমাবেশ ঘটান। সেই কারণে রসবস্তু এবং বহির্বিষয়ে এক হলেও ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যিকের রচনা ভিন্ন ধরণের আনন্দময়তার উদ্বোধ করে। কিন্তু যদিও সার্থক কবিমাত্রেই বিশিষ্ট রচনাভঙ্গি অর্থাৎ style এর অধিকারী, তবু একমাত্র মহৎ কবিরাই মহৎ স্টাইলের জন্ম দিতে পারেন এবং তাঁদের রচনাভঙ্গি যেমন সর্বজনীনতার অধিকার লাভ করে, তেমন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কবিদের অনুসরণীয়ও হয়ে ওঠে। ভাষারীতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে এলিঅট এক জায়গায় বলছেন—

> Sensibility alters from generation to generation in everybody whether we will or not ; but expression is only altered by a man of genius. ("The Vanity of Human Wishes' প্রঃ)

মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দ এবং নবতর ভাষারীতির অনুসরণে সেকালে কত কাব্যই না প্রস্তুত হয়েছিল, আর হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বহু কবির উপর তাঁর style এর প্রভাব কত গভীর! বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাদর্শে রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ কত লেখক-লেখিকাই না

উপন্যাস রচনায় এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কালী-প্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি প্রবন্ধকার প্রবন্ধরচনায় উৎসাহিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট রচনাভঙ্গির প্রভাব অস্বীকার করতে আধুনিক লেখকবৃন্দকে কতই না আয়াস স্বীকার করতে হয়েছে!

সংস্কৃত সমালোচনায় কাব্যদোষ-বিচার সমালোচনার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। প্রাচীনেরা দোষকে নানা শ্রেণীতে বিন্যস্ত ক'রে বিচারের যে সূক্ষ্মতা দেখিয়েছেন তা আধুনিক যে-কোনও সমালোচনায় দুর্লভ। কাব্যবিচার যে দোষদর্শনমাত্র নয় এবং কাব্য শুধু নির্দোষ শব্দার্থরচনামাত্র নয় একথা জেনেও শুধু আদর্শের দিক থেকে এ তাঁদের অবশ্য কর্তব্য মনে হয়েছিল। দোষ বলতে গোড়ার দিকের সমালোচনায় যদ্যপি শব্দার্থের দোষই পরিগণিত হয়েছিল, পরবর্তী কালে রসদোষও আবিষ্কৃত হয় এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দোষগুলির প্রতি উপেক্ষা দেখানো হয়। রসবাদী কাব্যপ্রকাশকার দোষকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—শব্দদোষ (এবং বাক্যদোষ), অর্থদোষ এবং রসদোষ। এর মধ্যে শব্দদোষ গৌণ, অর্থদোষ রসধ্বনিকাব্যে গৌণ কিন্তু গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যে মুখ্য এবং রসদোষ মুখ্য বা প্রত্যক্ষ দোষ। শব্দদোষের মধ্যে পড়ে শ্রুতিকটু, নিহতার্থ, নিরর্থক প্রভৃতি (বাক্যদোষে ন্যূনপদ, অধিকপদ প্রভৃতি), অর্থদোষের মধ্যে পড়ে অপুষ্ট, পুনরুক্ত, গ্রাম্য প্রভৃতি এবং রসদোষের মধ্যে স্বশব্দবাচ্য, কষ্টকল্পনা, প্রকৃতি-বিপর্যয়, প্রতিকূল-বিভাবাদি, অতিবিস্তৃতি প্রভৃতি। রসের দিক থেকে দোষকে অভিপ্রেত রসের উপযোগিতার অভাব ধরে 'অনৌচিত্য' হিসেবেও গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রাচীন সমালোচনায় অলংকার-বিচার সমালোচনাশাস্ত্রের মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে বললে অত্যুক্তি হয় না। অলংকার কাব্যের মুখ্যসম্পদ ব'লে এর আলোচনাপ্রাধান্যের জন্য কাব্যশাস্ত্রের নামই হয়েছে অলংকারশাস্ত্র।

সংস্কৃতে অলংকার-বিচার দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে (১) অলংকারের সঙ্গে কাব্যের সম্বন্ধ নির্ণয় (২) বিশেষ

বিশেষ অলংকারের নির্ণয় ও উদাহরণযোগ। এই অধ্যায়ে আমরা প্রথম বিষয়টি সম্বন্ধে আলোকপাত করতে চাই। দ্বিতীয়টি পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃতি সহকারে প্রদর্শিত হচ্ছে।

কাব্য-আলোচনায় অলংকার শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে দৈহিক অলংকারের সাদৃশ্যে, শব্দার্থময় কাব্যশরীরে রূপক-উৎপ্রেক্ষা-রূপ কটককুণ্ডলাদি অর্পণ করা হয় এই ধারণায়। আলংকারিক দণ্ডী তাঁর পূর্বসূরীদের কথা বলতে গিয়ে বলছেন যে "তৈঃ শরীরঞ্চ কাব্যানাম্‌ অলংকারাশ্চ দর্শিতাঃ" অর্থাৎ তাঁরা কাব্যের দেহ এবং অলংকার দুইয়েরই বিচার করেছেন। তিনি অলংকারকে কাব্যের শোভাকর ধর্ম বলে উল্লেখ করেছেন ('কাব্যশোভাকরান্‌ ধর্মান্‌ অলংকারান্‌ প্রচক্ষতে')। কিন্তু আচার্য দণ্ডী অলংকারকে কাব্যের একেবারে বহিরঙ্গ বস্তু মনে করতেন এমন প্রমাণ তো নেই-ই বরং বিরুদ্ধ কথাই আছে। স্বল্প পরবর্তী আচার্য বামন যিনি রীতিকে কাব্যের আত্মা বলেছেন তিনি গুণকে কাব্যশোভার নিমিত্তকারণ এবং অলংকারকে কাব্যশোভার আতিশয্যকারক বলে অভিহিত করেছেন। 'কাব্যশোভায়াঃ কর্তারো ধর্মা গুণাস্তদতিশয়হেতবস্ত্বলংকারাঃ'। সাধারণভাবে দ্রষ্টব্য এই যে শব্দার্থময় কাব্যশরীরের সৌন্দর্য থেকে পৃথক্‌ কোনও বস্তুকে কাব্যের আত্মভূত বলে এঁরা স্বীকার করেন নি। পরবর্তী কালে কাব্যের আত্মা রস স্বীকৃত হলে যখন বাচ্য-বাচকের বিচার নূতন আলোকে আরম্ভ হল তখনই অলংকারগুলিকে পরিস্ফুটভাবে বাইরের থেকে সমানীত কটককুণ্ডলাদির মত মনে করা হল, আর বলা হল, শব্দার্থময় দেহের মধ্যস্থতায় এরা রসরূপ আত্মার উপকার করে থাকে।* আচার্য মম্মট তাঁর কাব্যপ্রকাশে অলংকারকে কাব্যের অনিত্য বস্তু বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁরই

সৌন্দর্যসারই অলংকার

* ...অলংকারাঃ কটককুণ্ডলাদিবৎ দেহদ্বারেণেব শব্দার্থদ্বারেণ কাব্যস্য রসমুৎকর্ষয়ন্তঃ কাব্যস্যোৎকর্ষকা ইত্যুচ্যন্তে।

অনুসরণে শব্দার্থের শোভাতিশায়ক অস্থির ধর্ম এবং রসের উপকারক ব'লে সাব্যস্ত করেছেন। * কিন্তু রসবাদীদের এই অভিমত বিশেষ পরীক্ষণ ও বিবেচনার অপেক্ষা রাখে।

রসবাদীদের পূর্বসূরীরা অর্থাৎ শব্দার্থসাহিত্য-বাদীরা বিশেষ বিশেষ অলংকারের সঙ্গে কাব্যের নিয়তসম্বন্ধ বা আত্মভূত সম্বন্ধ পরিস্ফুটভাবে ব্যক্ত না করলেও সমস্ত অলংকারের সার বা একটি সাধারণরূপ, অথবা, অলংকার-রীতি-গুণের সমবায়মূলক কোনও বৈচিত্র্যবিশেষ যে কাব্যের আত্মভূত এমন ধারণা তাঁদের দৃষ্টির বাইরেই ছিল তা মনে করা সংগত হবে না। যদিও একথা ঠিক যে তাঁরা বিষয়টিকে প্রসারিত ক'রে অন্যতম বিচার্যরূপে দেখেন নি। আচার্যপ্রধান ভামহ সমস্ত অলংকারের অন্তর্ভূত চমৎকারিত্বের প্রতি লক্ষ্য করেই বক্রোক্তি নামের প্রচলন করেন এবং কাব্যবিষয়ে এই বক্রোক্তির কর্তৃত্ব সিদ্ধান্ত ক'রে জোরের সঙ্গে বলেন—

সৈষা সর্বৈব বক্রোক্তিরনয়ার্থো বিভাব্যতে।
যত্নোঽস্যাং কবিনা কার্যঃ কোঽলংকারোঽনয়া বিনা॥

তাঁর মতে বহির্বিষয়ের চমৎকৃতিহীন বর্ণনা কাব্য নয়, সংবাদ মাত্র। ভামহের এই বক্রোক্তি এবং শব্দার্থ-সাহিত্য-তত্ত্ব কাব্যস্বরূপ জিজ্ঞাসায় কোনমতেই উপেক্ষণীয় নয়। দেখা যায়, ধ্বনিরসবাদ প্রতিষ্ঠিত হবার পর আচার্য কুন্তক ভামহের এই অভিমতকে বীজরূপে গ্রহণ ক'রে অতি মূল্যবান্ বক্রোক্তিবাদ স্থাপন করেছেন। কাব্যাদর্শ গ্রন্থে ভামহসমকালবর্তী দণ্ডী এই বক্রোক্তির বিষয় উল্লেখ ক'রে স্বভাবোক্তি বা স্বভাবের যথাযথ নিরলংকার বর্ণনা থেকে একে পৃথক করে দেখেছেন ('ভিন্নং দ্বিধা স্বভাবোক্তির্বক্রোক্তিশ্চেতি বাঙ্ময়ম্')। এরকম পৃথক্করণ পরবর্তী কুন্তকেও দেখা যায়। দণ্ডী কিন্তু বক্রোক্তির পরিবর্তে অতিশয়োক্তিকেই সর্বালংকার-সাধারণ চমৎকৃতি বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে লোকসীমাকে অতিক্রম করে যায়

* শব্দার্থয়োরস্থিরা যে ধর্মাঃ শোভাতিশায়িনঃ।

এমন বিশেষ (সৌন্দর্যের) বর্ণনাই অতিশয়োক্তি। এই অতিশয়োক্তি অন্যান্য অলংকারেরও সারস্বরূপ ('অলংকারান্তরাণামপ্যেকমাহুঃ পরায়ণম্')। অতিশয়োক্তিরূপ বৈচিত্র্যের অভাবে কাব্যত্ব সিদ্ধ হয় না। কাব্যে যে সাধারণ বর্ণনা থেকে বিশেষ চমৎকারজনক বর্ণনার প্রয়োজন তা পরিচিত কবি কীট্‌স্‌ও এইভাবে উপলব্ধি করেছিলেন—'Poetry should surprise by a fine excess.' রীতিবাদী হলেও বামন কাব্যের সৌন্দর্যাতিশয় সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন না, এবং তাঁর অলংকারকে সৌন্দর্যবিশেষ বলে অভিহিত করার মূলে একটি সাধারণ চমৎকৃতিবোধকতা কাজ করেছিল এমন ধারণাই সংগত। মনে হয়, এই দিক থেকেই তিনি 'কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ', 'সৌন্দর্যমলংকারঃ' প্রভৃতি নির্দেশ দিয়েছিলেন। ভেবে দেখা দরকার যে বামন তাঁর বক্তব্যে 'সৌন্দর্য' শব্দকে অগ্রাধিকার (অর্থাৎ 'সৌন্দর্য' উদ্দেশ্য, 'অলংকার' বিধেয়) দিয়ে যেন বলতে চেয়েছেন যে কাব্যের সৌন্দর্যই মুখ্য ব্যাপার এবং অলংকার ছাড়া তা প্রকাশের অযোগ্য।

ফলতঃ রসধ্বনিবাদের পূর্বেকার আলংকারিকেরা বিশেষ বিশেষ অলংকারের অতিরিক্ত কাব্যের প্রাণস্বরূপ কোনও বস্তুর নির্দেশ দেননি একথাও ভূতার্থবাদ নয়। তাঁদের অভিপ্রায়কে দেহাত্মবাদ নাম দিয়ে উপেক্ষা করলে আমাদের ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। ইংরেজি আলোচনায় যাকে Beauty বলা হয়, কাব্যের যা অন্তরঙ্গ বস্তু, সেই পরমবৈচিত্রীকেই এঁরা বিভিন্ন ভাষায় উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। নতুবা কাব্যের শব্দার্থময় একটা দেহ গঠন ক'রে নিয়ে পশ্চাৎ কয়েকটা বিশেষ বিশেষ ভূষণ আরোপ করার উপদেশ এঁরা দেন নি।* তাঁদের বিশেষ বিশেষ অলংকারের আলোচনা এই সৌন্দর্য-উপলব্ধিকে কেন্দ্র করেই। তাঁদের কাব্যদেহও সাধারণ দেহ নয়, গুণময়, বিশিষ্ট

* লক্ষ্য করতে হবে, ভামহ মুষ্টিমেয় কয়েকটি অলংকার ছাড়া সেকালে প্রচলিত বহু অলংকারকেই আমল দেন নি। বৈচিত্র্যের স্পর্শহীন বাগ্‌-বিস্তারকে অলংকার বলে গ্রহণ করতে কেউই পরামর্শ দেন নি।

পদরচনায় সমুজ্জ্বল দেহ এবং তাঁদের অলংকারও সাধারণ অলংকার নয়, কাব্যশোভার প্রাণস্বরূপ, বাচ্য-বাচকের একাত্মতা-বিধায়ক।

দশম-একাদশ শতাব্দীতে বক্রোক্তিজীবিতকার বক্রকবিব্যাপারের দ্বারা গ্রথিত শব্দার্থের এই সৌন্দর্যকেই কাব্য বা সাহিত্যের প্রাণভূত নির্দেশ ক'রে পূর্বেকার ঐ মূর্ছিত সমালোচনরীতির মধ্যে প্রাণের স্পন্দন সঞ্চার করলেন। তাঁর মতে বক্রোক্তি হল 'বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতি' অর্থাৎ উক্তির এক বিশেষ ধরনের চারুতা। এই চারুত্ব তাঁর ধারণায় কেবল শব্দে নয়, কেবল অর্থে নয়, অর্থাৎ কেবল শব্দগুণান্বিত গুণরীতির মধ্যে নয়, কেবল অর্থপ্রৌঢ়ির মধ্যেও নয়, এ দুয়ের পরস্পর-প্রতিস্পর্ধাবশে সম্মিলিত এক আশ্চর্য রমণীয়তার মধ্যে। কিছুটা কুন্তকের ধারায় চলেছিলেন তাঁর সমসাময়িক রাজশেখর, এবং পরবর্তী অপ্পয়্যদীক্ষিত, অচ্যুতরায়, মথুরানাথ, অরুণাচলনাথ, ভট্টগোপাল প্রভৃতি। সুতরাং রসধ্বনিপ্রস্থান গড়ে ওঠার পর অর্থাৎ শব্দার্থের অতীত কাব্যাত্ম-দর্শনের পরও প্রসিদ্ধ সমালোচকেরা যে শব্দার্থ-সমানীত আশ্চর্য চমৎকারের উপর ঝুঁকলেন তাতে এ-সৌন্দর্য যে কাব্যের অনাত্মভূত এমন ধারণার অবকাশ রইল না। ধ্বনিবাদী এবং রসবাদীরা যদি ধ্বনি এবং রসকে কাব্যের আত্মা বললেন, তাঁদের পূর্বসূরীরা সর্বালংকাররূপ বক্রোক্তি বা সৌন্দর্য বা অতিশয়োক্তিকে কাব্যসর্বস্ব ব'লে মনে করেছিলেন।

ধ্বনিবাদ কি কাব্যের দেহদর্শন এবং আত্মদর্শনের ঠিক মধ্যবর্তী নয়? ধ্বন্যালোকের ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্যার্থ তো একটি নূতন অর্থবিশেষ যা অভিধেয় এবং লাক্ষণিক অর্থকে অবলম্বন করেই সূচিত হয়। ফলতঃ এ জ্ঞাননিষ্ঠ চমৎকৃতিবিশেষ, বিগলনস্বভাব রসের মত কেবল হৃদয়ানুভবগ্রাহ্য নয়। অর্থপ্রতীতিপর বলেই ধ্বনির সম্বন্ধে বলা যায় না যে—'সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্'। যেমন রস, তেমনি বস্তু এবং অলংকারও এই ধ্বনির বিষয়ীভূত। বুদ্ধিগ্রাহ্য জ্ঞানাশ্রয়ের জন্যই মহিমভট্ট এই ধ্বনিতত্ত্বকে আক্রমণ করেছিলেন এবং অনুমিতির সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেছিলেন। আবার ধ্বনিকারের

মতে ধ্বনির রহস্যময় স্বরূপ ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধের অতীত। এই দিক দিয়ে বরং বলা যেতে পারে যে ধ্বনিবাদ পূর্বেকার সৌন্দর্যবাদ এবং পরবর্তী রসবাদের মধ্যে সেতুবন্ধন করতে চেয়েছে।

সৌন্দর্যবাদ যে কেবল দেহাত্মবাদ নয়, অবয়বসংঘটনের অতিরিক্ত বস্তু অনুধাবনের প্রতি আগ্রহ, তা অন্বয়ব্যতিরেকী প্রমাণের দ্বারাও প্রতিপন্ন করা যেতে পারে। ধ্বনিপ্রস্থানের পূর্বাচার্যেরা গুণালংকার বিষয়ে যে সব উদাহরণ যোজনা করেছেন সেগুলির কাব্যগুণ সম্বন্ধে দ্বিমত কোথায়? বহুপ্রচলিত দণ্ডীকৃত কাব্যাদর্শের কথা ধরা যাক। তাঁর দেওয়া দৃষ্টান্তগুলি প্রায়শই উত্তম কাব্য হয়ে উঠেছে। ধ্বনিমতানুসারে উত্তম ধ্বনিকাব্য, কোথাও বা গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্য। কেবল বিশিষ্ট অলংকার বা রীতিবৈচিত্র্য প্রদর্শনের জন্য গঠিত শব্দচিত্র বা অর্থচিত্রের নির্মিতি নয়। শব্দার্থের নীরস চমৎকারিত্বের পোষকতা তাঁর অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিল না। তাঁর গুণবিষয়ে আলোচনা এবং বিবিধ দৃষ্টান্তের প্রয়োগ থেকে দেখা যায় তিনি শব্দালংকার ও অর্থালংকারের আড়ম্বরে পূর্ণ রীতির তীব্র নিন্দা করেছেন এবং পরিমিত অনুপ্রাসাদির যোজনায় রমণীয় রচনার প্রশংসা করেছেন তাঁর মতে অথবা তখনকার অধ্যয়নে, বৈদর্ভী রীতিতে সার্থক অলংকারাদির ব্যবহার ছিল, অনুপ্রাসপ্রিয় গৌড়ীয়গণের রীতিতে ছিল না। সুতরাং কাব্য এবং অকাব্যের মধ্যে যে মৌল প্রভেদ সে সম্বন্ধে যেমন রসধ্বনিবাদীরা তেমনি তাঁদের পূর্বাচার্যেরাও অবহিত ছিলেন এ বেশ বোঝা যায়। ফলতঃ বলা যায় যে, 'তরঙ্গনিকরোন্নীত তরুণীগণসংকুলা সরিদ্বহতি' (সাহিত্য দর্পণের অলংকার লক্ষণের টীকায় তর্কবাগীশ কর্তৃক আহৃত এবং বাঙ্‌লা 'কাব্যজিজ্ঞাসা' পুস্তকে অলংকৃত অকাব্যের দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত) ইত্যাদি কাব্যাংশকে আলংকারিক দণ্ডী নিশ্চয়ই অনুপ্রাসবুদ্ধি ও রচনাবৈষম্যপ্রিয় গৌড়ীরীতির উদাহরণরূপেই দেখাতেন। ক্বচিৎ নিরলংকার বাক্যেরও যে কাব্যত্ব হয় সে সম্পর্কে রসধ্বনি প্রস্থানের পূর্বাচার্যদের অভিমত এই হত যে, ওখানে বিশেষ অলংকার পরিস্ফুট হয়নি বটে, কিন্তু

বক্রোক্তি বা অলৌকিক চারুত্ব আছে। ধরা যাক, শীলাভট্টারিকা-বিরচিত বলে কথিত "যঃ কৌমারহরঃ" কাব্যাংশটি।* এ প্রসঙ্গে এই উদাহরণটি বিখ্যাত। কারণ, আচার্য মম্মট তাঁর কাব্যপ্রকাশে এটিকে শৃঙ্গার-রসবৈচিত্র্যের নিরলংকার অথচ উত্তম কাব্য বলে উদাহৃত করেছেন। (বিশ্বনাথ কবিরাজ অবশ্য এটিকে বিভাবনা-বিশেষোক্তির সংকর বলেই গ্রহণ করেছেন)। কিন্তু অর্থালংকার না-ই থাক, প্রতিচরণে সমুচিতভাবে বিন্যস্ত শব্দালংকার রয়েছে। তা ছাড়া উৎকণ্ঠার উদ্দীপন রূপে বসন্তের যে নিসর্গচিত্র দেওয়া হয়েছে তার নির্বাচিত বস্তু ও শব্দের গ্রন্থন পদ্ধতিই একে কাব্যলোকে সমুত্তীর্ণ করেছে একথা বক্রোক্তিবাদীরা নিশ্চয়ই বলবেন। যেমন বলা যেতে পারে, কুসুমগন্ধামোদিত চৈত্র রজনী, কদম্ববনসম্পৃক্ত প্রৌঢ় মলয়ানিল এবং তটরুহবেত্রবনাকীর্ণ ও তরঙ্গময়ী রেবানদীর বর্ণন। এ সবকে স্বভাবোক্তি মাত্র বললেও পূর্বপক্ষের সুবিধে নেই। কারণ, যেমন হোক একটা স্বভাবের বর্ণনায় কখনোই কাব্য হয় না। বিশেষের দিকে গিয়ে বলা যায় 'উন্মীলিত' এবং 'প্রৌঢ়' বিশেষণ পদ দুটি এবং 'রোধসি' এবং 'বেতসী' শব্দ দুটি বক্রোক্তিপ্রধান। ছন্দের কথা না-ই ধরা গেল। উত্তম কাব্যের বক্রোক্তিগত সৌন্দর্যের অন্য প্রমাণ কাব্যের ভাষান্তরিত হওয়ার অযোগ্যতা। ঐ কবিতাটিকে অনূদিত করলে অথবা এতে ব্যবহৃত পদগুলির স্থানে সংস্কৃতেরই অন্য শব্দ বসালে

* যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তেচোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥

কৌমার মোর হরে নিল যেই সে-ই বর, সে-ই চৈত্র রাতি;
তেমনি ফুল্ল-মালতী-গন্ধ, কদম্ববায়ু বহিছে মাতি;
আমিও ত সেই!—তবু সেদিনের সে-সুরতলীলা কিসের তরে
রেবাতটে সেই বেতসীর মূলে আজিও চিত্ত আকুল করে!

—ডকুটর সুশীলকুমার দে কৃত অনুবাদ

এর কবিত্ব থাকবে ? এই কারণেই কাব্যদর্শনবেত্তা Croce তাঁর Æsthetic গ্রন্থে কাব্যের Expression বা Formকে অনুবাদের অযোগ্য বলে নির্দেশ দিয়েছেন ।*

প্রসঙ্গক্রমে স্বভাবোক্তির কথায় আসা যাক। স্বভাবোক্তিকে অলংকারশূন্যতা বলে মনে করা যেতে পারে। ভামহ সেকালে প্রচলিত অন্য কয়েকটি অলংকারের সঙ্গে স্বভাবোক্তিকেও তাঁর অলংকারবিবৃতিতে স্থান দেননি। এইসব নিয়ে দণ্ডীর সঙ্গে তাঁর কলহ।† ভামহ বলছেন—সূর্য অস্ত গেছে, চাঁদ উঠেছে, পাখিরা বাসায় যাচ্ছে—এরকম বর্ণনা কাব্য নয়, সংবাদমাত্র। দণ্ডী বলছেন, এরকম স্থলেও অকাব্য বলা যায় না, কালাবস্থা বর্ণনের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন যথার্থবহ। বক্রোক্তিবাদী ভামহ ঐ বর্ণনার কাব্যত্ব স্বীকার করবেন না, এতে বিশেষ কোনও চমৎকারিত্ব ফুটে ওঠেনি বলে। উল্লিখিত দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে আমরা ভামহকে সমর্থন করছি, কিন্তু স্বভাবোক্তির মধ্যে কাব্যিক চমৎকৃতি নেই একথা মানতে আমরা প্রস্তুত নই। উপরিউক্ত 'যঃ কৌমারহরঃ' দৃষ্টান্তে কল্পিত বসন্তবর্ণনটি কি কাব্যরসের সঙ্গে একাত্মভাবে উপস্থাপিত নয় ? "মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে" প্রভৃতি কুমারসম্ভবের বসন্তাগমে ভ্রমর ও হরিণের অবস্থাবর্ণন কি মনোজ্ঞ

স্বভাবোক্তি কি সৌন্দর্যহীন ?

---

* A corollary of this is the impossibility of translations, in so far as they pretend to effect the remoulding of one expression into another, like a liquid poured from a vase of a certain shape into a vase of another shape. We can elaborate logically what we have already elaborated, in æsthetic form only ; but we cannot reduce what has already possessed its æsthetic form to another form also æsthetic.—ÆSTHETIC, Chap IX.

† গতোঽস্তমর্কঃ ভাতীন্দুর্যান্তি বাসায় পক্ষিণঃ।
ইত্যেবমাদিকং কাব্যং ? বার্তামেনাং প্রচক্ষতে ॥ —ভামহ

গতোঽস্তমর্কঃ ভাতীন্দুর্যান্তি বাসায় পক্ষিণঃ।
ইতীদমপি সাধ্বেব কালাবস্থানিবেদনে ॥ —দণ্ডী

হয়নি? বাঙ্‌লা উদাহরণ নেওয়া যাক। নিম্নের অংশদুতে ঐটি সন্ধ্যারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে—যথাস্থিত রূপে—'Realist'রা 'Imitation'ও বলতে পারেন—রমণীয়ার্থ প্রতিপন্ন হয়েছে কিনা তা যাঁর কাব্যবোধ আছে তিনিই বুঝবেন—

(১) সন্ধ্যাতারা উঠে অস্ত গেল,
চিতা নিবে এল নদীর ধারে,
কৃষ্ণপক্ষে হলুদবর্ণ চাঁদ
দেখা দিল বনের একটি পারে।
শৃগালসভা ডাকে ঊর্ধ্বরবে
পোড়ো বাড়ির শূন্য আঙিনাতে—

(২) সন্ধ্যাবেলার প্রথম তারা উঠল গাছের আড়ে,
বাজল দূরে শাঁখ,
রন্ধ্রবিহীন অন্ধকারে পাখার শব্দ মেলে
গেল বকের ঝাঁক।
পথে কেবল জোনাক জ্বলে, নাইকো কোনো আলো
এলেম যবে ফিরে।

ভামহের গতোঽস্তমর্কের মধ্যে কাব্য নেই, কারণ চমৎকৃতি নেই, কিন্তু উপরের উদ্ধৃতিতে আছে এবং তা কাব্য হয়েছে নিরলংকার স্বভাববর্ণন হওয়া সত্ত্বেও। অর্থাৎ যে স্বভাববর্ণন কবি-প্রতিভার দ্বারা সমাকৃষ্ট হয়ে বিচ্ছিত্তি-বিশেষের আধার হয়েছে তা অবশ্য উত্তম কাব্য বলে গৃহীত হওয়ার যোগ্য। স্বভাবোক্তির ব্যাপারটিকে আচার্য কুন্তক ভিন্নভাবে দেখেছেন। স্বভাবোক্তি বলতে লৌকিক চারুতাহীন বিবৃতিই তিনি ধরে নিয়েছেন। আর উদ্ধৃত কাব্যিক বিবৃতিকে তিনি বক্রোক্তি হিসেবেই দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের আরও দুটি কাব্যাংশ দেখা যাক—

(১) নিবিড়-ছায়া বটের শাখে
কপোত দুটি কেবল ডাকে,
একলা আমি বাতায়নে
শূন্য শয়ন ঘর।

(২) নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা,
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে সাগরবিহঙ্গেরা।
নারিকেলের শাখে শাখে ঝোড়ো বাতাস কেবল ডাকে
ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে বইছে নগনদী—

একথা কি বলা যায় না যে উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে কবিবাঙ্‌নির্মিতির অনির্বচনীয় কৌশল বা চমৎকারিত্ব প্রস্ফুট। নতুবা ঐ শব্দগুলিকে গদ্যে বা ওর সমার্থক শব্দ দিয়ে পদ্যে অনুবাদ করলে ওদের কাব্যত্ব কিছুই থাকে না। ফলতঃ আচার্য দণ্ডী প্রদত্ত 'স্বভাবোক্তি' এবং 'বক্রোক্তি' কাব্যের এই দুই বিভাগও আমরা স্বীকার করি না। আমাদের অধ্যয়নে উত্তম স্বভাবোক্তির মধ্যেই বক্রোক্তি বা রমণীয়ার্থ লুকানো রয়েছে। স্বভাবোক্তি অস্ফুট বক্রোক্তিরই নামান্তর। কেবল রবীন্দ্রনাথেই নয়, অন্য বহু কবির নির্মাণেও এর উদাহরণ প্রচুর।

চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত বিখ্যাত পদাবলীর কবি সরল নিরলংকার বাক্‌রীতিতে বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গাররস ধ্বনিত করার জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে তাঁর ভঙ্গিতে তাঁর স্বকীয় কৌশল যথেষ্ট। 'কেবা শুনাইল শ্যামনাম' প্রভৃতি পদের ছন্দ এবং গ্রথিত শব্দগুলিকে একটু পরিবর্তিত করলে কাব্যরস কি অক্ষুণ্ন থাকবে—যেমন, 'শ্যামে'র স্থানে 'কৃষ্ণ'? 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো' প্রভৃতি স্থলে কানের মর্মের ও প্রাণের সম্বন্ধ যোজনার মধ্যেই কি বৈচিত্র্য সঞ্চারিত হয়নি? ঐ দুটি পঙ্‌ক্তির 'র' ও 'ল' এর প্রতিশব্দে সন্নিবেশ কি ঐ বৈচিত্র্যকে সম্পূর্ণ করেনি? 'না জানি কতেক মধু' প্রভৃতির মধ্যে তো পরিস্ফুটভাবেই অতিশয়োক্তি অলংকার রয়েছে। অনুরূপভাবে 'বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে' প্রভৃতির মধ্যে সুনির্বাচিত চেষ্টাসমূহের বর্ণনা এবং অনুপ্রাস ও উপমা অলংকার রয়েছে। অবশ্য, মূলের "তদ্ ব্রূয়াঃ সখি যোগিনী কিমসি ভোঃ কিংবা বিয়োগিন্যসি" প্রভৃতিতে সন্দেহ অলংকারটি চারুতর হয়েছে। কবি জ্ঞানদাসের "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে" প্রভৃতি পদ পরিস্ফুট অলংকারের দ্বারা হীন হলেও ঐ প্রকার বৈচিত্র্যেই রমণীয়।

আর একটি উদাহরণ দেখা যাক। প্রিয়সমাগমের আশায় উল্লসিত নায়িকার স্বভাববর্ণন, সংস্কৃতের অনুসরণে, ছদ্মচণ্ডীদাসকৃত—

চিকুর ফুরিছে, বসন উড়িছে,
পুলক, যৌবন ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে,
দুলিছে হিয়ার হার॥

রসবাদিগণের মতে এখানে অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য রসধ্বনি। কয়েকটি অনুভাবের মধ্য দিয়ে হর্ষশঙ্কাদি ব্যভিচারী-যুক্ত শৃঙ্গারের ব্যঞ্জনা অংশটির কাব্যোৎকর্ষের কারণ। সৌন্দর্যবাদিদের মতে নির্বাচিত শব্দে প্রকাশিত বিশেষ বিশেষ অবস্থা ও স্বভাব বর্ণনাই এর কাব্যগত চমৎকৃতির মূলে। ফুরিছে, উড়িছে, নাচিছে, দুলিছে প্রভৃতি ক্রিয়াপদ এই সৌন্দর্যকে পরিস্ফুট করতে সহায়তা করেছে। ধ্বনিবাদিগণের মতেও এর শৃঙ্গারধ্বনি নির্ভর করছে সুনির্বাচিত কয়েকটি ব্যাপার এবং তিঙন্ত শব্দের উপর।

ফলতঃ প্রাচীন সমালোচনা পদ্ধতিকে দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে দেখতেই হয়, এবং শুধু প্রাচীন কেন, বোধ হয়, চিরকালের শব্দার্থদেহ কাব্যের সমালোচনার এই দুটি সরণি,—একটি হল তার চমৎকৃতি বা সৌন্দর্য-নিরূপণের দিক, আর একটি হল তার রসবিবেচন। সাহিত্যকে ভিন্নভাবে এই দু'দিক থেকে দেখা যায় এবং দেখলে পৃথক্ পন্থায় 'আহ্লাদজনক-জ্ঞানগোচরতা'য়* পৌঁছাতে পারি। এরই মধ্যে কবি প্রতিভার তারতম্যানুযায়ী, কবিব্যাপারের ভিন্নতা অনুসারে কাব্যকে উত্তম ও মধ্যম শ্রেণীর বলে পরিগণনা করা যেতে পারে। আর এর থেকে অপকৃষ্ট রচনা, যার মধ্যে প্রতিভার স্বাক্ষর নেই, কবিকল্পনার স্পর্শ নেই, যার শব্দার্থ আশ্চর্য কবিব্যাপারের দ্বারা গ্রথিত নয়, যা কেবলমাত্র আয়াস বা অনুকরণের অধীন,

কাব্য-বিবেচনে দুই পদ্ধতি

* রমণীয়ার্থপ্রতিপত্তি—কাব্যের এই লক্ষণের ব্যাখ্যাকল্পে জগন্নাথের বচন।

এমন বাগ্‌বিকল্পকে কাব্য ব'লে অঙ্গীকার করা যায় না। সাহিত্যদর্পণকার প্রায় সর্বত্র মম্মটের অনুসরণে নিজ বক্তব্য সমুপস্থাপিত করলেও এই কারণেই 'চিত্রকাব্য' ব'লে তৃতীয় শ্রেণীর কাব্য পরিগণনা করেন নি। তিনি রসবিচারের দিক থেকে করেননি, আমরা চমৎকৃতির দিক থেকেই করি না, কারণ, শব্দার্থের বক্রতা বা অতিশয়ত্ব ঐ প্রকার আয়াসের দ্বারা সিদ্ধ হয় ব'লে আমরা মনে করি না।

সৎকাব্যের কাব্যত্ব অনুধাবন উপরি-উক্ত দুই রীতিতে হয়ে থাকে এই সত্যে বুদ্ধি স্থির হলে তাবৎ কাব্যকে রসপ্রধান এবং রম্যার্থবোধ (বা গৌরবোক্তি)-প্রধান এই দুই পৃথক্ শ্রেণীতে বিভক্ত করা অযৌক্তিক হয়ে পড়ে। একই উত্তম-কাব্য সহৃদয়ের অনুভবের দিক থেকে রসবৎ আবার চমৎকৃতিবোধকতার দিক থেকে সৌন্দর্যের আধার বলে প্রতীত হয়। Beauty এবং Bliss একই আধার থেকে সংগৃহীত হতে পারে। এর কারণ বোধ হয় এই যে আমাদের 'চিৎ' এবং 'আনন্দে'র বৃত্তি মিশ্রাবস্থায় থাকে, বুদ্ধি এবং হৃদয়ানুভবের ক্ষেত্রকে পৃথক্ করা যায় না, কখনও একটির, কখনও বা অন্যটির উপর আমরা জোর দিতে পারি এই পর্যন্ত। সংবিদানন্দের চর্বণা এবং আনন্দসংবিতের স্ফুরণজনিত রমণীয়ার্থ-প্রতীতি—একই কাব্যকে এই দুই বিভিন্ন মানসিক অবস্থার তারতম্যে গ্রহণ করা যেতে পারে। সমালোচকের স্বভাববশতঃ, দৃষ্টিকোণের পার্থক্য অনুসারে, কাব্য-সমালোচনাও তাই দুই পৃথক্ রীতির হয়ে পড়ে। ফলতঃ 'কাব্যালোক' নামক বাঙ্‌লা গ্রন্থে নিবেশিত দ্রুতি এবং দীপ্তি এ দুই বিভাগের মূলে শাস্ত্রসম্মত অথবা বিজ্ঞানসংগত কোনো যুক্তি নেই। ধ্বনিপ্রস্থানের অভিমত অনুসারে বাচ্যাতিশায়ী ব্যঙ্গ্যপ্রধান ধ্বনিকাব্য এবং গুণীভূতধ্বনি এ দুই বিভাগ অবশ্য যথাযথ*। কিন্তু দ্রুতি

* রসবাদীরা কেউ কেউ এ দুই বিভাগের প্রথমটিকে উত্তম এবং দ্বিতীয়টিকে মধ্যম বলে পরিগণিত করলেও ধ্বন্যালোকে এ বিষয়ে তেমন জোর দেওয়া হয়নি।

(মাধুর্যগুণের কার্য) এবং দীপ্তি (ওজঃগুণের কার্য) হিসাবে কাব্যের বিভাগ রসবাদী অথবা চমৎকৃতিবাদী কোনো প্রস্থানেরই সম্মত নয়। দ্রুতিকে রস এবং দীপ্তিকে যদি বাচ্যবাচকের চারুত্বের দিক থেকে গ্রহণ করতে হয় তাহ'লে ধ্বনিপ্রস্থানে পূর্বেই তো সে বিভাগ করা হয়েছে, নূতন ভাষায় পুরাতন বক্তব্যের প্রয়োজন কী ?

আমাদের পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। ভামহ, দণ্ডী, বামন প্রভৃতি অলংকার-রীতি প্রস্থানের আচার্যেরা বিশেষ বিশেষ অলংকারকে কাব্যশোভার কারণ বলে অভিহিত করলেও সর্বালংকারসারস্বরূপ চমৎকৃতির দিকেই তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। এ চমৎকৃতি লঘু ঐন্দ্রিয়ক চমৎকৃতি নয়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "একটি সুগভীর সামঞ্জস্যের আনন্দ, সংস্থান-সমাবেশের আনন্দ, দূরবর্তীর সহিত যোগ-সংযোগের আনন্দ, পার্শ্ববর্তীর সহিত বৈচিত্র্যসাধনের আনন্দ —এইগুলি মানসিক আনন্দ। ভিতরে প্রবেশ না করিলে, না বুঝিলে, এ আনন্দ ভোগ করিবার উপায় নাই। উপর হইতে চট করিয়া যে সুখ পাওয়া যায় ইহা তাহা অপেক্ষা স্থায়ী ও গভীর।" এ সৌন্দর্য অসাধারণ চমৎকারাতিশয়ের জনক, 'A thing of Beauty', 'কিমপি দ্রব্যং', ফলতঃ 'Joy for ever.' যা প্রত্যক্ষ এবং প্রমাণসাধ্য শব্দার্থের অনুগত সেই সৌন্দর্য বিবেচনই তাঁহাদের সমালোচন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। রসবাদীরা স্বাভিমত স্থাপনকল্পে গুণ-রীতি-অলংকারের সর্বত্র সঞ্চারিত এই বক্রোক্তি বা চারুত্বাতিশয় বা বৈচিত্র্যসারসম্পৎটি গণনার মধ্যে আনেন নি। একে পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন এবং অলংকৃতি বলতে বিশেষ বিশেষ অলংকারকে গ্রহণ ক'রে স্বমতের অনুকূলে এদের অস্তিত্ব নাস্তিত্ব সম্পর্কে রায় দিয়েছেন। এই মর্মেই রসপ্রস্থানের অন্যতম আচার্য মম্মট অলংকারের সমবায়বৃত্তি স্বীকার করেন নি, 'অনলংকৃতী পুনঃ ক্বাপি' এই ব'লে কাব্যলক্ষণে অলংকারের সঙ্গে কাব্যের অনিয়ত সম্পর্ক নির্দেশ করেছেন এবং হারাদিবৎ ব'লে

সৌন্দর্যের অলংকারতা বিষয়ে মতামত

অলংকারগুলিকে বহিঃসমানীত এবং শব্দার্থের মধ্যস্থতায় রসের উপকারকমাত্র এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। সাহিত্যদর্পণকার প্রায় অন্যসর্বত্র যেমন, এখানেও তেমনি, মম্মটেরই উক্তির প্রতিধ্বনি করেছেন এবং ভূমিকায় কুন্তকপ্রদর্শিত বক্রোক্তি মার্গের প্রতিপাদ্যকে 'বক্রোক্তেরলংকাররূপত্বাৎ' বলে এক কথায় খারিজ করে দিয়েছেন। হয়তো বা 'বক্রোক্তি'র স্বরূপ জেনেও স্বমতের খাতিরে তাকে তুচ্ছ করেছেন।

অথচ দেখা যায়, অলংকার প্রসঙ্গে ধ্বন্যালোক রচয়িতা ঠিক রসবাদিদের অনুকূলে মত যোজনা করেন নি। ধ্বন্যালোকের একটি কারিকায় গুণ এবং অলংকারের প্রভেদ নিরূপণ কল্পে যদিও বলা হয়েছে যে গুণ ধ্বনিত রসাদিকে আশ্রয় করে থাকে এবং অলংকার ঐ অঙ্গী রসাদির অঙ্গস্বরূপ বাচ্যবাচকের আশ্রয়ে (যেমন দেহের আশ্রয়ে কটককুণ্ডলাদি) দাঁড়িয়ে থাকে,* তথাপি অলংকারের স্বরূপ নির্ণয়ে, কারিকায় এবং বিস্তৃত ব্যাখ্যায় অলংকারকে রস বা ধ্বনির বহিরঙ্গ বস্তু বলে ধ্বনিপ্রস্থানে সাব্যস্ত করা হয়নি। ধ্বনিকারের অলংকারের স্বরূপ নির্ণয়টি এই—

অতিশয়োক্তি বা বক্রোক্তির অন্তরঙ্গতা বিষয়ে ধ্বনিকার

রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ।
অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্যঃ সোঽলংকারো ধ্বনৌ মতঃ॥ ২।১৬

অর্থাৎ "নিষ্পত্তি বিষয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হলেও, এরূপ চমৎকার যোজনা কী করে এত অনায়াসে সম্ভব হল এই বিস্ময়ের উদ্রেক করলেও, তা যদি অপৃথগ্‌ভাবে অর্থাৎ বিভাবানুভাব নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধ হয়, তাহলে ধ্বনিবাদীরা তাকে অলংকার বলে গ্রাহ্য করবেন।" ধ্বন্যালোকের মতে এরূপ অলংকার রসসমাহিতচিত্ত প্রতিভাবান্ কবির লেখনীতে আমি আগে, আমি আগে এইভাবে

* তমর্থমবলম্বন্তে যেঽঙ্গিনং তে গুণাঃ স্মৃতাঃ।
অঙ্গাশ্রিতাস্ত্বলংকারা মন্তব্যাঃ কটকাদিবৎ॥ ২।৬

বাহির হয়ে আসে। রসাদির সঙ্গে বাচ্যের নিগূঢ় কার্যকারণ সম্বন্ধ থাকার জন্য এবং প্রকৃষ্ট বাচ্য রূপকাদি অলংকারনির্মিত ব'লে অলংকারকে রস থেকে পৃথক্ করা করা যায় না। এই বিষয়টি পরবর্তী একটি কারিকায় স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে—

রসবন্তি হি বস্তূনি সালংকারাণি কানিচিৎ।
একেনৈব প্রযত্নেন নির্বর্ত্যন্তে মহাকবেঃ ॥ ২।১৭

তৃতীয় উদ্দ্যোতে গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ধ্বন্যালোক-রচয়িতা পুনরায় বাচ্য এবং ধ্বনির একাত্মতা সম্বন্ধে বুঝিয়েছেন। অভিনবগুপ্তপাদ তাঁর লোচন টীকায় স্পষ্টভাবে বলছেন—"ধ্বনিরেব কাব্যমিতি। আত্মাত্মিনোরভেদ এব, বস্তুতো ব্যুৎপত্তয়ে তু বিভাগঃ কৃতঃ।" রসবাদীরা বাচ্যের সঙ্গে অলংকার, এবং অভিন্ন এই দুইয়ের সঙ্গে রসের একাত্মতার কথা বলেন নি।

ধ্বন্যালোকরচয়িতা, ভামহের বক্রোক্তিকে অতিশয়োক্তি নামেই গ্রহণ করেছেন। তিনি যে সর্বালংকাররূপ চারুত্বাতিশয় সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং রসধ্বনি থেকে একে নিয়ে স্থান দেন নি তা তাঁর গুণীভূতব্যঙ্গ্য আলোচনা-প্রসঙ্গে স্পষ্ট। ভামহের অভিমত সমর্থনকল্পে তিনি বলছেন—"প্রথমং তাবদতিশয়োক্তিগর্ভতা সর্বালংকারেষু শক্যক্রিয়া। কৃতৈব সা মহাকবিভিঃ কামপি কাব্যচ্ছবিং পুষ্যতি। কথং হি, অতিশয়যোগিতা স্ববিষয়ৌচিত্যেন ক্রিয়মাণা সতী কাব্যেনোৎকর্ষমাবহেৎ।" অর্থাৎ—অতিশয়োক্তি সমস্ত অলংকারের মধ্যেই বর্তমান থাকে। মহাকবিরা যখন এর প্রয়োগ করেন তখন এক বিশেষ কাব্যচ্ছবি এর দ্বারা পুষ্ট হয়। যেমন-যেমন বিষয় তেমন-তেমন ভাবে সমুচিত প্রয়োগের দ্বারা এ উৎকর্ষের জনক হয়। কাব্যগত এই অতিশয়োক্তি বা চমৎকৃতি যে নামতঃ অলংকারের অতিরিক্ত অথচ অলংকারের দ্বারাই জ্ঞাপ্য তাও তিনি বুঝিয়েছেন। অতিশয়োক্তি সমস্ত অলংকারের সারভূত। "তত্রাতিশয়োক্তির্যমলংকারমধিতিষ্ঠতি কবিপ্রতিভাবশাৎ তস্য

চারুত্বাতিশয়যোগঃ, অন্যস্য তু অলংকারমাত্রতৈবেতি সর্বালংকার-শরীরস্বীকরণযোগ্যত্বেনাভেদোপচারাৎ সৈব সর্বালংকাররূপা ইত্যয়মেবার্থোবগন্তব্যঃ।” অর্থাৎ—অতিশয়োক্তি যে অলংকরণে ব্যাপ্ত থাকে কবিপ্রতিভাবলে তার চমৎকারাতিশয় নিষ্পন্ন হয়, অন্য অলংকার অলংকারমাত্র। সকল অলংকারের সঙ্গে একাত্ম অবস্থায় থাকে বলে একে সর্বালংকাররূপ বস্তু বলা হয়। এখানে অভিনবগুপ্ত পুনশ্চ বলছেন—“শব্দস্য হি বক্রতা, অভিধেয়স্য চ বক্রতা লোকোত্তীর্ণেন রূপেণাবস্থানমিত্যয়মেব অসাবলংকারভাবঃ। লোকোত্তরতৈব চাতিশয়ঃ, তেনাতিশয়োক্তিঃ সর্বালংকারসামান্যম্।” অর্থাৎ—শব্দের বক্রতা অর্থের বক্রতা হল লোকোত্তররূপে অবস্থান, এই হল অলংকার। লোকোত্তরতাই অতিশয়, সেজন্য অতিশয়োক্তি সর্বালংকারসাধারণ বস্তু। অলংকারের এই লোকোত্তরস্বভাব পরবর্তী রসবাদীরা স্বীকার করেন নি, তাঁরা রসকেই লোকোত্তর বলেছেন এবং অলংকারকে লৌকিক দেহের বহিরঙ্গ ভূষণসংযোগ মাত্র মনে করেছেন।

ধ্বনিকার যমকাদি শব্দকৌশল প্রদর্শনের জন্য নির্মিত বাগ্‌-বিকল্পকে অলংকার বলে স্বীকার করছেন না, অথচ যথার্থ অলংকার যে হারকেয়ূরাদির মত বহিরঙ্গ নয়, বাচ্য-বাচকের সঙ্গে অভিন্ন এবং রসের সঙ্গে একাত্ম সেকথা জোরের সঙ্গেই বলেছেন। বলা বাহুল্য, ধ্বনিকার রসভাবাদির ধ্বনির সঙ্গে অলংকারধ্বনিকেও উত্তম কাব্য বলে গণনা করেছেন। অথচ রসবাদীরা এবং ঔচিত্য-মতাবলম্বীরা, অলংকার নামের মূলে যে লৌকিক ধারণা বিদ্যমান তাকেই শিরোধার্য ক'রে কাব্যের সঙ্গে অলংকারের সংযোগ-সম্বন্ধ মাত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। উত্তম কবিদের অলংকার নির্মাণ লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে মম্মটাদির এই সম্বন্ধনিরূপণ যুক্তিসহ নয়, কারণ, সেখানে কাব্যের সঙ্গে অলংকারকে পৃথক্ করা যায় না, কুণ্ডলের স্থানে কণ্ঠহার বসানোই চলে না। এই কারণেই কালিদাস-রবীন্দ্রাদির উপমায় খ্যাতি, দৃষ্টান্ত স্থাপনে মধুসূদনের, সমাসোক্তি

এবং Pathetic Fallacyতে কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের। অলংকার যোজনার মূলে যে সাধারণ চমৎকৃতিবোধকতা রয়েছে তা-ই রূপ গ্রহণ করে বিশেষ বিশেষ অলংকারে। এইজন্যই বিশেষ বিশেষ অলংকারের স্বরূপ বিদগ্ধের বিচার্য এবং উদীয়মান কবিদের আরাধ্য।

পাশ্চাত্ত্য কাব্য-দার্শনিক Croce' ধ্বন্যালোক-রচয়িতা বা আনন্দবর্ধনের মতই অলংকরণকে বহিরঙ্গ মনে করেন নি, Expression-এর সঙ্গে অভিন্ন মনে করেছেন। তাঁর Æsthetic নামক গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে কলাবস্তুর বহিরঙ্গ বিভাগ অস্বীকার করে তিনি বলছেন—

> "The fact that we divide a work of art into parts, a poem into scenes, episodes, similes, sentences, or a picture into single figures and objects.........such division annihilates the work, as dividing the organism into heart, brain, nerves, muscles and so on, turns the living being into corpse."

অগ্রসর হয়ে তিনি বলছেন—

> "One can ask oneself how an ornament can be joined to expression. Externally ? in that case it must always remain separate. Internally ? in that case either it does not assist expression and mars it, or it does form part of it and is not ornament, but a constituent element of expression, indistinguishable from the whole."

বহিঃসমানীত অলংকার বা যোজনা-করা অলংকারকে তিনি কাব্যাঙ্গ ব'লে স্বীকারই করতে চান না, expression-এর মধ্যে জোর করে অলংকার যোগ করলে তা expression-কে মাটি করে। তবে, আর যা যা expression-এর সঙ্গে অভিন্নভাবে সমুদিত হয় (অভিনবগুপ্তের ভাষায় বিভাবাদির নির্মিতির সঙ্গে সঙ্গেই), তাকে Croce' অলংকার নাম দিয়ে পৃথক্ করে দেখতে চান না। যা কাব্যের সঙ্গে একাত্ম তাকেই আবার বহির্বস্তুরূপে কেমন করে

বিবেচনা করা হয়? আর যদি বহির্বস্তু হয়, তা expression-ধর্মী কাব্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

মনে রাখতে হবে intuition-expression বাদী ক্রোচে শিল্পের বহির্বিন্যাসের কোনও গুরুত্ব আরোপ করেননি। এদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি বাহ্যতঃ স্বতন্ত্র (ভূমিকায় আমরা রবীন্দ্র-সিদ্ধান্ত উদ্ধৃতি সহকারে জানিয়েছি)। তিনি প্রকাশকেই কবিত্বের স্বরূপ বলে মনে করেন। এই প্রকাশ হল বহিঃপ্রকাশ, Crocéএর Expression এর ঠিক সমার্থক এ নয়, যদিও একথা সত্য যে intuition বা আন্তর দর্শন ছাড়া বহিঃপ্রকাশ হতে পারে না এবং সেই অর্থে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ ও Crocé-র আন্তর সাক্ষাৎকার ভিন্ন ভাষায় একবস্তুর প্রতিই ইঙ্গিত করছে। কিন্তু বহির্বিন্যাস কৌশল বা প্রসাধনাদির উপর Crocéর ঘৃণা যেন একটু তীব্র। তিনি বলছেন—

> "The illegitimate division of expressions into various grades is known in literature by the name of doctrine of ornament or of rhetorical categories."

তিনি শাস্ত্র প'ড়ে লেখা কৃত্রিম কাব্য-কবিতা এবং আয়াস-সাপেক্ষ মণ্ডনকলার অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কতদূর আস্থাহীন তা নিম্নলিখিত উক্তি থেকে বোঝা যাবে—

> If an epigram be art, why not a simple word? If a story, why not the news-jottings of the journalist? If a landscape, why not a topographical sketch?

এখানে Corcéর অভিমতকে মান্য করেই অবশ্য তাঁর এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায়। আমরা বলতে পারি যে কবি-কল্পনার দ্বারা অধিবাসিত হলে অর্থাৎ Intuition-এ প্রত্যক্ষীভূত হলে যে-কোনো শব্দই কাব্যাঙ্গ ধারণ করতে পারে, যে-কোনো তথ্যই আনন্দদান করতে পারে। তা না হলে পারে না। কাব্যের বস্তু ব'লে পৃথক্ কোনো পূর্বনির্দিষ্ট পদার্থই নেই! নিশ্চয়ই একটিমাত্র শব্দও কাব্যের যথেষ্ট প্রতিপাদক কখনও কখনও যে না হতে পারে

তা নয়। (তু° শেলি—'The Unique Word')। খবরের কাগজের সংবাদ যে সাহিত্য নয় তার কারণ, কবিকর্তৃক বিভাবিত নয়, অর্থাৎ ঐ Constituent Element of Expression নয়। ক্রোচে কবির এই বিভাবন ব্যাপারের উপর জোর দিয়েছেন তাঁর expression-বাদ গ্রহণ ক'রে। না হলে কাব্য বর্ণহীন শূন্যতা-সাধনের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। ক্রোচের ধারণায় কৃত্রিমতা এবং বহিরঙ্গ প্রসাধন কাব্যের শত্রু এবং তদর্থে তিনি অলংকারশাস্ত্রের নির্দেশগুলির অসারতাও প্রদর্শন করেছেন—

> "It is needless to say how much harm has been done by rhetorical distinctions......In literature the rhetorical categories have contributed, if not to make dominant, at least to justify theoretically that particular kind of bad writing which is called fine writing or writing according to rhetoric."

আমরাও প্রতিভাহীন, বিভাবীকরণে অক্ষম কবিযশঃপ্রার্থী লেখকদের বাগ্‌বিকল্পকে কাব্য ব'লে গ্রহণ করতে রাজি নই এবং যে-অলংকার কাব্য-সৌন্দর্যের সঙ্গে একাত্ম তারই বিবেচন যুক্তিযুক্ত মনে করি। বিশেষ বিশেষ অলংকারে যার প্রকাশ, পদসংঘটনা এবং বর্ণযোজনা যাকে উপচিত করে সেই কাব্য নামক পরমবৈচিত্রীকে তার ঠিক স্বরূপে আমরা দেখতে চাই এবং এই দৃষ্টিতেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অলংকৃতির অনুধাবনও অনুমোদন করি।

আমরা নিম্নে রবীন্দ্রনাথ থেকে কয়েকটি পরিচিত অংশ তুলে দিচ্ছি। এগুলির মধ্যে উপমা, সমাসোক্তি, অপ্রস্তুতপ্রশংসা প্রভৃতি অলংকার রয়েছে। অন্তরঙ্গ অলংকৃতির জন্যই, অথবা শব্দান্তরে, বক্রোক্তির জন্যই রমণীয়তা উৎপন্ন হয়েছে কিনা এবং কবির অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়েছে কিনা বিদগ্ধ ব্যক্তি নিশ্চয়ই তা লক্ষ্য করবেন। পরে অন্য কবির কাব্য থেকেও আমরা কয়েকটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। দেখা

অন্তরঙ্গ অলংকার ও কাব্যসৌন্দর্যের

যাবে সেখানেও কাব্য অলংকারের সঙ্গে এমন একাত্ম যে অলংকার সরিয়ে নিলে কাব্য দুর্লভ হবে।

(১) শুনি সে বারতা
ছাত্রগণ মৃদুস্বরে আরম্ভিল কথা,
মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল
পতঙ্গের মতো।

(২) বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী—
রাজদণ্ডরূপে।

(৩) আরতিদীপ এই কি জ্বালা, এই কি আমার সন্ধ্যা।
গাঁথব রক্তজবার মালা, হায় রজনীগন্ধা!

(৪) এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য হাটে।

(৫) নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোনার আঁচলখসা হাতে দীপশিখা।

এর মধ্যে প্রথমটিতে উপমান যোজনা, দ্বিতীয়টিতে পরিণাম ও বক্রোক্তির প্রয়োগ, তৃতীয়টিতে সাংকেতিক শব্দের দ্বারা অপ্রস্তুত-প্রশংসা নির্মাণ, চতুর্থটিতে সমাসোক্তি ও বিষমের সংকীর্ণতা, পঞ্চমটিতে সমাসোক্তি কবির প্রতিভাবলে সমাহৃত ও কাব্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বিচ্ছিত্তিবিশেষের জন্ম দিয়েছে। বক্তব্য থেকে এই অলংকারগুলিকে পৃথক্ করে কে দেখবে? অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত উদাহরণ দেখা যাক। নিম্নের অংশ তিনটির প্রথম দুটি কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের রচনা থেকে, তৃতীয়টি মধুসূদনের মেঘনাদবধ থেকে।

(১) দারুণ শীতের সাঁঝ হে আমার নটরাজ,
কোন্ রূপে এসেছিলে দ্বারে?
অশ্রুর সাগরমন্থ হে আমার নীলকণ্ঠ!
ভাগ্যে ফিরাইনি একেবারে!
শীতাতপে দিগম্বর, দিশাহীন পথচর,
দেহ টলে ক্ষুধার নেশায়,
অনন্ত-শ্মশানে চিতা সারি সারি নির্বাপিতা,
তাহারই বিভূতি ফুটে গায়।

সর্বাঙ্গে হাড়ের মালা, শিরায় ফণীর জ্বালা,
গণ্ডে ঝরে জাহ্নবী উতলা।
কৃষ্ণাচতুর্দশী-শেষে তোমারি ললাটে এসে
অস্ত গেছে শেষ শশিকলা!

'কচি ডাব' কবিতার জীর্ণশীর্ণ নগ্নকায় ন্যুব্জদেহ ডাবওয়ালার বর্ণনা। কবি তীব্র সহানুভূতিবলে কী অপূর্ব চিত্রই না নির্মাণ করেছেন! এই চমৎকারাতিশয়কে বিশ্লেষণ করে নাম দিয়ে বোঝাতে গেলে বলতে হয় রূপক এবং অতিশয়োক্তির সংকর দ্বারা এ সিদ্ধ হয়েছে। ঐ অলংকারগুলি তুলে নিয়ে সাধারণভাবে বর্ণনা করলে, কিম্বা উপমাদি অন্য অলংকার সংযুক্ত করলে এর কাব্যত্ব থাকবে? কিম্বা যে সব শব্দের শক্তিবলে অদ্ভুত ব্যঞ্জনাময় কাব্যসৌন্দর্য গড়ে উঠেছে তাদের একটি তুলে দিলে কাব্য অক্ষত অনুভব করা যাবে? এই অংশে বাচ্য-বাচকে যে চমৎকারের প্রয়োগ দেখা যায় তাকে ঠিক প্রয়োগ বলাও সংগত নয়। এ অলংকার সংযোগসম্বন্ধে আসেনি, আপনা থেকে অনিবার্যভাবে সমুদ্ভুত হয়েছে।

(২) হে আমার জ্যোতি, হে আমার সতি,
গৃহিণি, সচিব, সখি, হে প্রিয়া,
যে মন্ত্র তুমি কহ কানে কানে
আমার মুক্তি তাহাই দিয়া।
আমার গুরুর উপবীত নাই,
কণ্ঠে তাহার কনক-হার;
শিরে নাই শিখা নাই জটাজুট,
আছে বেণী, আছে অলক-ভার।

এই অপূর্ব প্রিয়াস্তুতি বিরচিত হয়েছে উল্লেখ, সমাসোক্তি এবং বিশেষতঃ ব্যতিরেক অলংকারের সাহায্যে। এবং এখানেও অলংকার বিভাবনির্মাণের সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে এবং একে তুলতে গেলে কাব্যের মূল উৎপাটিত করা হবে।

(৩) মন্দ্রিলা জীমূতবৃন্দ আবরি অম্বরে ;
ইরম্মদে ধাঁধি বিশ্ব, গর্জিল অশনি ;
চামুণ্ডার হাসিরাশি সদৃশ হাসিল
সৌদামিনী, যবে দেবী হাসি বিনাশিলা
দুর্মদ দানবদলে, মত্ত রণমদে।

ডুবিলা তিমিরপুঞ্জে তিমিরবিনাশী
দিনমণি ; বায়ুদল বহিলা চৌদিকে
বৈশ্বানরশ্বাসরূপে ; জ্বলিল কাননে
দাবাগ্নি ; প্লাবন নাদি গ্রাসিল সহসা
পুরী, পল্লী , ভূকম্পনে পড়িল ভূতলে
অট্টালিকা, তরুরাজি ; জীবন ত্যজিল
উচ্চ কাঁদি জীবকুল, প্রলয়ে যেমতি !

এখানে ভয়ানক রসের সঙ্গে করুণরস বর্ণনীয়। 'বিস্ময়' এর সংযোগ একে পুষ্ট করেছে। উপনাগরিকা, পরুষা এবং কোমলা, তিনটি বৃত্তিরই অদ্ভুত সমবায়ে এর শব্দময় দেহ নির্মিত। বিবিধ অনুপ্রাস রসবৈচিত্র্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে প্রলয়কল্প অবস্থার স্বভাবটিকে অত্যন্ত রমণীয় করে তুলেছে। কষ্টকল্পিত যমকাদি নেই।

অন্য একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক। সুপরিচিত কবিতা। কিন্তু ক'টা কবিতাই বা আমরা তন্ময় হয়ে পড়ি, আর আজকের দিনে ক'টা কবিতাই বা আমাদের মর্ম নিঙড়ে অশ্রুপাত ঘটাতে পারে ? এ অসাধ্যসাধন শিক্ষক কবি, বাঙালির ঐতিহ্যের প্রতিনিধি কালিদাস রায় করেছেন তাঁর 'ছাত্রধারা' কবিতায়। ছাত্র সম্পর্কে শিক্ষকের মনোভাব বর্ণন মুখ্যতঃ স্বভাবোক্তির পর্যায়েই পড়ে। মাঝখানে ছোটখাটো রূপক বা উৎপ্রেক্ষা যা আছে তা যেন অলংকৃতিই নয়। কিন্তু এ স্বভাবোক্তি নির্মাণদক্ষ কবি ছাড়া ক'জন শিক্ষকই বা উচ্চারণ করতে পারেন, এ ভাবসংযম ও পরিমিতিবোধ আধুনিক ক'জন কবিরই বা আছে ? গীতিকবিতার 'form' সম্বন্ধে যাঁরা অবহিত তাঁরা দেখবেন এ কবিতার প্রারম্ভ থেকে পরিণাম

পর্যন্ত ভাব ও তার বিন্যাসের দ্বান্দ্বিক গতি সুচারু নির্বাহ লাভ করেছে।

কবিতাটির প্রথম স্তবকে ছাত্রশ্রেণী সম্পর্কে কবির একটি সামগ্রিক ও সাধারণ অনুভব মাত্র প্রকাশ পেয়েছে—'কৈশোরের কিশলয় পর্ণে পরিণত হয় যৌবনের শ্যামল গৌরবে' এবং স্বানুভব সম্পর্কে নিষ্ঠাবান্ ঐ কবির প্রাথমিক আত্মবিশ্লেষণ—"থাকে নাক হায় কোন স্মৃতি।" এই শেষ উক্তিটিকে ধ'রে অতঃপর কবি এরই বিস্তাররূপে ছাত্রদের আসা যাওয়া সম্পর্কে শিক্ষকের বেদনাকরুণ মনোভাবের একটি নিপুণ পরিচয় বিন্যস্ত করেছেন কয়েকটি সংক্ষিপ্ত ও পরিচিত অলংকৃতিতে। এ অলংকৃতি সমগ্রভাবে বর্ণন-বৈচিত্র্যেরই অঙ্গ হয়েছে, সহজ স্বকীয়তা ত্যাগ ক'রে বাক্যমাত্রসার হয়ে ওঠেনি—

ক'দিনের এই দেখা ? সাগর-সৈকতে রেখা
নূতন তরঙ্গে মুছে যায়।
ছোট ছোট দাগ পা'র ঘুচে হয় একাকার
নব নব পদ-তাড়নায়।
জানে না কে কোথা যাবে, জোটে হেথা, নাহি ভাবে ;
পাঠশালা—যেন পান্থশালা ;
দুদিন একত্রে মাতে মেলে মেশে, ব'সে গাঁথে
নীতি-হার আর কথা-মালা।

সাগর-সৈকত প্রভৃতি উপমান আকৃতিতে পুরাতন ও গতানুগতিক (cliché) হলেও এক্ষেত্রে একমাত্র উপমান। আর কোন্ উপায়েই বা ছাত্রদের আসা, থাকা ও চ'লে যাওয়ার করুণ সৌন্দর্য প্রকাশিত হতে পারে ? শেষ চরণে যে-শ্লেষালংকার হয়েছে এমন অনায়াস ও অন্তরঙ্গ শ্লেষ বাঙ্‌লা কবিতায় খুব বেশি দেখেছি ব'লে তো মনে হয় না।

এর পরপর্যায়ে কবি তাঁর ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা এমনভাবে বর্ণনা

করেছেন যাতে তা সকল কালের শিক্ষকেরই বাস্তব অভিজ্ঞতা ও আত্মকথা হয়ে উঠেছে। এরই নাম সহজ চাতুরি।

রাজপথে দেখা হ'লে কেহ যদি গুরু ব'লে
হাত তুলে করে নমস্কার,
বলি তবে হাসিমুখে "বেঁচে থাক, রও সুখে,
কি করিছ কাজ-কারবার ?"
ভাবিতে ভাবিতে যাই কী নাম ? মনে তো নাই,
ছাত্র ছিল কতদিন আগে ?
কৈশোরের মুখখানি স্মৃতি-সূত্রে ধরি' টানি'
দেখি মনে জাগে কি না জাগে।

এই বিস্মৃতি-প্রসঙ্গের সুন্দর সমাপ্তি ঘটেছে কবির একটি 'প্রৌঢ়ি' উক্তিতে—

ব্যক্তি ডুবে যায় দলে, মালিকা পরিলে গলে
প্রতি ফুলে কেবা মনে রাখে ?

এর পর স্মৃতি-প্রসঙ্গ। যে-বেদনা এতক্ষণ স্মৃতিচারণা ও স্বভাব-বর্ণনের সঙ্গে জড়িত মিশ্রিত হয়ে ক্ষণে ক্ষণে দীপ্তি পাচ্ছিল তা এখন ভিন্ন আকারে ঘনীভূত হয়েছে—'আমার জীবন ঘেরি জাগে শুধু ম্লান মুখগুলি' এই প্রত্যক্ষ স্মৃতিকথায়। স্বল্প পৃথক সুর, গীতিকবিতার তৃতীয়াংশ। এরই আকর্ষণীয় বাৎসল্যের বিস্তারিত চিত্র—

কেহ বা ক্ষুধায় ম্লান কেহ রোগে ম্রিয়মাণ,
শ্রমে কারো চাহনি করুণ ;
কেহ বা বেত্রের ডরে বন্দী হয়ে আছে ঘরে,
নেত্র কারো তন্দ্রায় অরুণ।

এ চিত্রগুলি কবিপ্রতিভার স্ববশে নির্বাচিত এবং শিক্ষককুলের অতিপরিচিতও বটে। কিন্তু এই নাতিদীর্ঘ প্রস্তুতির প্রকর্ষরূপ উপসংহারে কবি যে-রমণীয় করুণ লোকে আমাদের পৌঁছে দিয়েছেন

সেখানে আমরা রুশো-মন্তেসরি-রবীন্দ্রের মুক্তি-ভাবনা ও শিশু-সহানুভূতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ি—

ডাকিছে উদার বায়ু লয়ে স্বাস্থ্য লয়ে আয়ু,
ডাক শোনে ব'সে রুদ্ধ ঘরে,
হাতে মসী মুখে মসী মেঘে ঢাকা শিশু-শশী
প্রতিবিম্বে মোর স্মৃতি ভরে।

যে-সহজ চমৎকৃতিবলে কবি এই দুরূহ কার্য সম্পাদন করেছেন তা ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। তবু বলা যেতে পারে, অক্ষরমাত্রিক ছন্দোরীতির পর্ব-পর্বাঙ্গের পরিমিত বিরাম এবং মধ্য ও অন্ত্যানুপ্রাস, ঠিক যুগ্ম অক্ষরে অর্ধ ও তদর্ধ যতিপাতের সমতা, প্রথমাংশে সমাসোক্তি এবং দ্বিতীয়াংশে সহজ অতিশয়োক্তির প্রয়োগ কবির অভিপ্রেত সৌন্দর্য সিদ্ধ করেছে। এই সব বন্ধনের মধ্য দিয়েই কবি সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে আমাদের অনায়াস মুক্তি সম্ভব করেছেন।

পাঠকেরা লক্ষ্য করবেন বক্রকবিব্যাপারের দৃষ্টান্তরূপে আমরা সেইরকম রচনাই বেশি উদ্ধৃত করছি যেগুলি অতিবিদগ্ধ কবির সচেতন আলংকারিক বাক্‌পটুতার নিদর্শন নয়। সহজ প্রয়াসে যাঁদের রচনায় কবিগুণ এবং রম্যতা একাধারে ফুটে ওঠে তাঁদের বলা হয়েছে সুকুমারমার্গের কবি, আর যাঁদের কবিধর্ম আত্মপ্রকাশের বশে পদে পদে শব্দপ্রৌঢ়ি এবং অর্থপ্রৌঢ়ি * অবলম্বন ক'রে থাকে তাঁদের বলা হয়েছে বিচিত্রমার্গের কবি। বাঙ্‌লা কাব্যধারায় বিচিত্রমার্গের পথিক কবির সংখ্যা স্বল্প, রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ সুকুমার

* কবির অভিপ্রায় অনুসারে যেখানে একটি পদের জন্য একটি বাক্য ব্যবহার করা হয় অথবা একটি বাক্যকে একটি পদে প্রকাশ করা হয়, সমাসের দ্বারা যা প্রকাশিতব্য তাকে ব্যাসবাক্যে, অথবা ব্যাসবাক্যে যা সচরাচর প্রকাশ লাভ করে তাকে সমস্তপদে প্রকাশিত করা হয়—সেখানে 'প্রৌঢ়ি' হয়েছে বলা যেতে পারে। বাঙ্‌লায় সাধারণ ভাবে উত্তম বাঙ্‌নির্মিতিকে আমরা প্রৌঢ়ি বলছি।

মার্গের, ক্বচিৎ বিচিত্রমার্গের এবং মধ্যমপথের পথিক। কবি বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দদাসকে এবং স্থানে স্থানে কবি সত্যেন্দ্রনাথকে বিদগ্ধ কবিরূপে দেখা যায়। আধুনিক কালের মধ্যে একমাত্র মোহিতলালকেই এই দুরূহ বিচিত্রমার্গের কবিরূপে নির্দেশ করা যেতে পারে। অবশ্য সাম্প্রতিকদের মধ্যে সুধীন্দ্র-অনুবর্তী দু-একজন এজাতীয় শাব্দিক ও প্রতীকী বৈদগ্ধ্যের পথ দেখাচ্ছেন। যাই হোক, আমি ঐরকম সুকুমারমার্গের অপর একজন কবির অনায়াস সিদ্ধির একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

> দিন চ'লে যায়, পথ না ফুরায়, নয়নে লাগায় ধাঁধা—
> মরু-মাঝখানে তৃষাতুর প্রাণে সংসারে আছি বাঁধা।
> তুরগ পঙ্ক হইল খঞ্জ, বল্গা ছিন্ন তার,
> এখন আমার কে লইবে ভার বন্ধু ভিন্ন আর ?
> চাও মুখ তুলে' বন্ধন খুলে দাও প্রভু পরমেশ !
> ক্ষণভঙ্গুর ক্ষীণ পঙ্গুর ক্রন্দন হোক শেষ !

একান্তভাবেই গীতিকাব্য। উপসংহার অংশে সংসারদুঃখাভিতপ্ত কবির হতাশা ও আত্মসমর্পণের ভাবটি ফুটে উঠেছে। প্রতিচরণে মধ্যানুপ্রাস ও রসানুকূল বর্ণের যোজনা অভিপ্রেত করুণ কোমল সৌন্দর্য বিস্তৃত করেছে। কয়েকটি অনায়াস অর্থালংকার এ রমণীয়তাকে পরিপুষ্ট ক'রে পাঠকের হৃদয়ে আহ্লাদজনক বৈচিত্রী উপচিত করেছে। নামোল্লেখ করলে বলা যায়, পাশ্চাত্ত্য মতে 'Suppressed Metaphor, প্রাচ্য মতে অপ্রস্তুতপ্রশংসা এবং অতিশয়োক্তি এর অর্থগত রমণীয়তার কারণ। মরু, পঙ্গু, পথ, তুরগ, বন্ধু ইত্যাদি শব্দেরও বক্রবিন্যাস লক্ষণীয়। ধ্বনিতে কুত্রাপি অতি-তারল্য ঘটেনি, মিলের মধ্যে কোথাও গরমিল নেই। একটি সর্বাঙ্গসুন্দর রচনা, বলা যেতে পারে—'গীতবৎ হৃদয়াহ্লাদং তদ্বিদাং বিদধাতি যৎ।'

আজকের দিনের প্রধান সমাজবাদী মানবিক সুকান্ত ভট্টাচার্য তো সাধারণ লোকভাষারই কবি। আর সমাজবাদী না হয়েও

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মৌখিক-রীতি-বিন্যাসেই উৎসাহী। এই দু'জনের দুটি কবিতায় সামান্যের মধ্যে অসামান্য কিভাবে লক্ষণীয় হয়েছে দেখা যেতে পারে।

সুকান্তের 'ঠিকানা'। প্রারম্ভে নাট্যিক রীতিতে সূত্রনির্দেশে প্রবন্ধগত বক্রতা—'ঠিকানা আমার চেয়েছ বন্ধু—'। কল্পিত এই প্রশ্নের জবাবেই কবি তাঁর অনুভব বিন্যস্ত করেছেন। প্রারম্ভে কবি যেন পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে অনুভব করেছেন, তাঁর নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই এবং সর্বত্র শোষণের পরিস্থিতিতে তা থাকতেও পারে না, আর উপসংহারে জানিয়েছেন, স্বাধীন স্বদেশের আগামী মুক্ত মানবিকতার বাস্তবে তাঁর স্থির ঠিকানা মিলবে। কবিতাটি নৈরাশ্য অতিক্রম ক'রে আশার কথা দ্যোতনা করছে। পথের নুড়ি দিয়েই তিনি মজবুত ইমারত গড়বেন এই সাংকেতিক বাক্যে তিনি সর্বহারাদের আশার বাণী শুনিয়েছেন। আশ্বাসের দৃঢ়তা ফুটিয়েছেন রুশ, চীন, যুগোস্লাভিয়া, জালালাবাদের দৃষ্টান্তে। আবার পরমুহূর্তে জড়তায় সমানীত হৃতসর্বস্ব মানুষের, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনের, আশা নৈরাশ্য বিমিশ্র অবস্থার সাংকেতিক চিত্র নির্মাণে যত্ন নিয়েছেন নিম্নলিখিত স্মরণীয় পঙ্‌ক্তিগুলিতে—

> বন্ধু, আজকে জানি অস্থির
> রক্ত, নদীর জল,
> নীড়ে পাখি আর সমুদ্র চঞ্চল।

উৎসাহ এবং সম্ভাবনার অনুভবের মধ্যে সর্বত্র সঞ্চারিত আর্তকারুণ্যের সুরপ্রবাহ কবির অসহায় অন্তর্দাহ প্রকাশ করেছে। এ দুয়ের মিশ্রণে কবিতাটি বেদনাহত আশার একটি বিশিষ্ট সংগীতের রূপ নিয়েছে। সুকান্ত ভাষাছন্দে রবীন্দ্রানুগামী, স্বপ্নেও অনেকটা রোম্যান্‌টিক। আবার, বিষয়বিন্যাসে বাস্তব দুর্বিপাক ও ভাবী সংগ্রামের নৈরাশ্যমিশ্র উৎসাহের কবি। কিন্তু তিনি আমাদের প্রিয় কবিতাকার হতে পেরেছেন রচনার আর্টে, শব্দের শিল্পকর্মে সমুত্তীর্ণ ব'লেই। উপরে

উদ্‌ধৃত চরণগুলিতে রক্তের সঙ্গে নদীর জল, নীড়মধ্যবর্তী পাখি এবং তরঙ্গিত সমুদ্র, পরস্পর অতি পৃথক্ বস্তু হয়েও কিভাবে অনায়াসে সৌন্দর্যসিদ্ধি ঘটিয়েছে তা মরমীর কাছে স্পষ্ট।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'কলঘরে চিলের কান্না' উক্ত কল্পনা আশা আদর্শের সংকেতচিত্রবাহী কবিতা নয়। নিতান্ত সাদামাটা বর্ণনা দিয়ে কবি একটি আকাশবিহারী স্বচ্ছন্দ প্রাণের 'ছয় বাই তিনফুট কলঘরে' অবরুদ্ধ হওয়ার বিসদৃশ পরিস্থিতির বেদনাময় বিবরণ দিয়েছেন। চিলকে কবি আকাশ-সম্রাট ব'লে অভিহিত করেছেন, অবাধ স্বাধীনতার এবং আকাশের মৃত্যুতে বিলাপ করেছেন, স্বকীয় ব্যথাহত ইমোশনও গোপন করেন নি, কিন্তু সর্বত্র দ্বান্দ্বিক চিত্রের সাহায্যেই তাঁর কাব্যসিদ্ধি সপ্রযত্নে রক্ষা করেছেন, যেমন—

> সম্রাটের মতো তুমি সমস্ত আকাশ ঘুরে এসে
> তারপর
> শহরতলির এক গৃহস্থের ছয় বাই তিনফুট ওই কলঘরে
> অন্ধকারে বন্দী হয়েছিলে।

এবং

> সমস্ত আকাশ আজ
> নিতান্ত ছাপোষা এক গৃহস্থের ক্লিন্ন অন্ধকারে
> মরে পড়ে আছে।

মুমূর্ষু চিলের উপর অসামান্যতার অনুভব আরোপ করতে গিয়ে কবিকে বারংবার গগনবিহারী, সম্রাট, সাম্রাজ্য, আকাশ প্রভৃতির শব্দচিত্র ব্যবহার করতে হয়েছে। আর এর বিপরীত পরিস্থিতি জানাতে—কলঘর, ছয় বাই তিনফুট কলঘর, ছাপোষা গৃহস্থের কলঘর প্রভৃতির সামান্যতা দ্যোতিত করতে হয়েছে। ভাষণে—মৌখিক রীতি এবং আধুনিক বাস্তবতা কুত্রাপি উল্লঙ্ঘিত হয়নি। তবু কারুণ্যের বশীভূত হওয়ায় কবিতাটিতে কথনের অতিরেক ঘটেনি এমন নয়, আর, বর্ণনে বিশেষ দুর্বল স্থান হ'ল—

কাকের তাড়নায় লাঞ্ছিত চিলের স্বরূপ পরিস্ফুট করতে গিয়ে মস্তানদের হাতে 'ঊর্ধ্বচারী মানুষের' লাঞ্ছনার উল্লেখ। এ প্রসঙ্গ না তুললেই ভালো হ'ত। এ অতিরিক্তও বটে, কারণ, দলবদ্ধ কাকের 'গুণ্ডামি' শব্দেই তা ব্যঞ্জিত। কয়েকটি অনায়াস-আগত অলংকার স্থানবিশেষে বর্ণনায় চারুত্ব এনেছে বলতেই হবে, যেমন—শূন্যের মেখলা থেকে যেরকম উল্কা খসে যায়, অথবা, বৈদূর্যমণির তীব্র দাহনে উজ্জ্বল খর দুপুরবেলা, আর, মুমূর্ষু চিলের অবস্থাবর্ণনের স্বভাবোক্তিও।

সাম্প্রতিকে নির্মিত যে কয়েকটি কবিতা সৌন্দর্যগুণে আমাদের চমকিত করেছে তার মধ্যে মাত্র তিনটির উল্লেখ করা যাক। বিষ্ণু দে'র চোরাবালি, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পদাতিক এবং বিমল ঘোষের নূতন উইল। 'চোরাবালি' রূপক কবিতা নয়। কোনো সূত্র ধ'রে কবির কল্পচিত্র নির্মাণের উৎসাহ। এর প্রকৃতি পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' কাব্যে পসারিণী, আবির্ভাব, মদনভস্মের পর প্রভৃতিতে বিশেষভাবে দেখা গেছে। ছন্দানুগ শব্দবিন্যাস-রমণীয়তা নিয়ে, নিসর্গ এবং সেই সঙ্গে বীর্যশুল্কা রমণীর প্রতীক্ষমাণ বিপ্রলম্ভের আভাসমাত্র নিয়ে কবিতাটি শুধু প্রকাশগত রম্যতাতেই আস্বাদ্য হয়েছে। অথচ এর অর্থ অনুসন্ধানে অনেকেই পণ্ডশ্রম করেছেন! অন্যপক্ষে 'পদাতিক' স্পষ্টভাবেই নূতনতর লোকে চিত্তের জাগরণের, উদ্বোধনের বাণীবাহী। কিন্তু এই উদ্বোধন সম্ভব হত না, যদি না এর মাত্রারীতির ছন্দে প্রতি-পর্বাঙ্গের উচ্চারণে প্রারম্ভিক জোর দেওয়ার ব্যবস্থা থাকত, আর সাংকেতিক অথচ অনায়াস চিত্রের সম্মুখীন করা হত প্রতি পদক্ষেপে। একদা কবিতাটি যে আমাদের মুখে মুখে ফিরেছিল তার কারণ ওর নূতন ভাবুকতার উপর প্রভাব-বিস্তারী ছন্দ, ধ্বনি ও চিত্রবিন্যাস। নূতন উইলে কবি বিমল ঘোষের বুড়ো ভগবানের কল্পনা ও তার চারিত্র্যের প্রত্যক্ষ একটি চিত্র নির্মাণই কবিতাটির আকর্ষণের মূল কারণ। সবহারাদের জন্য বুড়ো তার নোতুন এবং শেষ দলিল লিখে দিচ্ছে—এটি কবি শুধু ভাবের মধ্যে রাখেন নি, চিত্রবিন্যাসেই সার্থক করেছেন।

এ সবই কবিতার অলংকরণ, অন্তরঙ্গ ও সামগ্রিক। আয়াসপূর্বক আকৃষ্ট নয়, প্রকাশধর্মে আপনা থেকেই সমাগত। এবং পূর্বাহ্নে এমন কোনো নির্দেশদানই সম্ভব নয় যে, কবি এই কল্পনা এই ভাবকে প্রকাশ করতে এই এই চিত্রের, ছন্দের ও ভাষারীতির সমাবেশ করুন।

অতএব কবিকুলের বিচিত্র বাক্ নির্মাণের নিগূঢ় রীতিই হল অলংকারস্থানীয়। এর সম্বন্ধ কাব্যের সঙ্গে, Expression-এর সঙ্গে একাত্মতা। এবং সে কাব্যের ফল সম্প্রদায়বিশেষে রসনিষ্পত্তি, সম্প্রদায়বিশেষে কল্প শব্দার্থের অলৌকিক চমৎকৃতি যা রস-ভাবকে লঙ্ঘন ক'রেও পরিস্পন্দিত হয়, যা সৌন্দর্যের বিস্ময় নিয়ে আসে— "রসে সারশ্চমৎকারঃ"। যেখানে স্ফুট কোনও অলংকার নেই, অর্থাৎ নাম-করা অলংকার একটিও যেখানে দেখা যাচ্ছে না, সেখানেও উত্তম কাব্য হ'লে বাচ্য-বাচকের চমৎকৃতি আছেই। পুনশ্চ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি, "অলংকৃত বাক্যই হচ্ছে রসাত্মক বাক্য" এবং পৃথক্ পৃথক্ অলংকারের অতিপ্রয়োগ সম্পর্কেও এই কবি-আলংকারিকের মহাবাক্য স্মরণ করি—"রূপকে মানতেও হবে, নাও মানতে হবে, তাকে ধরতেও হবে, তাকে ঢাকতেও হবে। রূপের প্রতি লোভ না থাকে যেন।"

আমাদের এই আলোচনা থেকে এই বিষয়টিও প্রতিপন্ন হ'ল যে রসবাদীরা যাকে রস ব'লে নির্দেশ করেছেন সেই অপূর্ব-জ্ঞানগোচর আহ্লাদজনক বস্তু অলংকৃতি-নিরপেক্ষ নয়। 'বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তা' রক্ষিত না হলে কোনও রসনির্মিতিই সিদ্ধিলাভ করে না। যা অনির্বচনীয় সেই কাব্যসৌন্দর্যকে অনির্বচনীয় বাক্য বা 'বক্রোক্তি' ছাড়া প্রকাশ করা যায় না। এই দৃষ্টিতেই অলংকারের সঙ্গে কাব্যের সম্বন্ধ নিয়ত, মাত্র সংযোগমূলক নয় এবং কাব্যকে রসাত্মক বাক্য না ব'লে অলংকৃত বা বক্রোক্তিময় শব্দার্থ-সমাবেশ বললে কিছু অযৌক্তিক হয় না।

অতঃপর আমরা সুনির্দিষ্ট ও মুখ্য অলংকারগুলির সৌন্দর্য বিচারে প্রবৃত্ত হচ্ছি।

অলংকার-পরিচয়

দ্বিতীয় পর্ব অলংকার-পরিচয়

(ক) শব্দালংকার

অনুপ্রাস

লক্ষণ :—যে-কোনো স্বরসংযোগে সমধ্বনিময় ব্যঞ্জনের পুনরাবৃত্তির ফলে উদ্ভূত শ্রুতিমাধুর্য। বক্রকবিব্যাপারের দিক থেকে একে ধ্বনিবক্রতা বলা যেতে পারে।

আবৃত্তি প্রধানতঃ চার প্রকারের হতে পারে :—

(১) একটিমাত্র অযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের একাধিকবার উচ্চারণ।

(২) সংযুক্ত বর্ণ অথবা একত্রাবস্থিত একাধিক বর্ণের মাত্র দু'বার উচ্চারণ।

(৩) সংযুক্তবর্ণ অথবা একত্রাবস্থিত একাধিক বর্ণের দুয়ের অধিকবার উচ্চারণ।

(৪) শুধু উচ্চারণস্থানের সাম্য অনুসারেই বিভিন্ন ব্যঞ্জনের একাধিকবার উচ্চারণ।

প্রথমটির ও তৃতীয়টির নাম বৃত্ত্যনুপ্রাস। বৃত্তি শব্দের অর্থ (গুণানুকূল বা রসানুকূল) বর্ণযোজনা।*

উদাহরণ :

(/০) ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়সমীরে।

(ল-ধ্বনির বহুবার আবৃত্তি)

(৵০) কলকল্লোলে লাজ দিল আজ নারীকণ্ঠের কাকলি

(ক ও ল ধ্বনির আবৃত্তি)

---

* বৃত্তি তিন প্রকার। মাধুর্যব্যঞ্জক 'উপনাগরিকা', ওজোগুণব্যঞ্জক 'পরুষা' এবং প্রসাদব্যঞ্জক 'কোমলা'। কিন্তু এ বিভাগ খুব যথাযথ নয়, কারণ প্রসাদগুণ এমন একটি জিনিস যা অন্য গুণের, বিশেষতঃ মাধুর্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে।

(৶৹) যখনি জাগিলে বিশ্বে যৌবনে গঠিতা। (জ ধ্বনির)

(।৹) সিংহদুয়ারে বাজিল বিষাণ,
বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান,
মন্ত্রণা-সভা হোল সমাধান (মধ্য ও চরণান্ত নাসিক্য ধ্বনির)

(।৴৹) বিদায়বিষাদশ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস (ব ও স-ধ্বনির)

(।৵৹) ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে যদি নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবি
(ন্ত-ধ্বনির দুয়ের অধিকবার)

(।৶৹) কলকোকিল অলিকুল বকুল ফুলে (কল-ধ্বনির দুয়ের বেশি)

(॥৹) কেন বাজাও কাঁকন কনকন কত ছলভরে (কন-ধ্বনির দুয়ের বেশি)

(॥৴৹) শ্যামমঞ্জুল বঞ্জুল বন কুঞ্জবিতান তলে (ঞ্জ-ধ্বনির দুয়ের অধিকবার)

দ্বিতীয়টির নাম **ছেকানুপ্রাস**।* 'ছেক' শব্দের অর্থ বিদগ্ধ, মতান্তরে শুকপক্ষী। যুক্তব্যঞ্জন অথবা একত্রাবস্থিত ভিন্নস্বরের দ্বারা সংগ্রথিত একাধিক ব্যঞ্জনের দু'বার মাত্র আবৃত্তি।

উদাহরণ :

(৴৹) বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান

(৵৹) মম যৌবন-বনে

(৶৹) উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে
(এখানে বৃত্ত্যনুপ্রাসও লক্ষণীয়)

(।৹) উড়ে কুন্তল উড়ে অঞ্চল
উড়ে বনমালা বায়ুচঞ্চল
বাজে কঙ্কণ বাজে কিঙ্কিণী
মত্ত বোল।
('ঞ্চল'-ধ্বনির এবং 'কঙ্কণ'-ধ্বনির)

(।৴৹) করিয়াছে পান চুম্বনভরা সরস বিম্বাধরে।

(।৵৹) নীল অঞ্জন-ঘন-পুঞ্জ-ছায়ায় সম্বৃত অম্বর

---

* বাঙ্‌লার ক্ষেত্রে ছেকানুপ্রাস ব'লে স্বতন্ত্র বিভাগ না মানলেও ক্ষতি নেই। লক্ষ্য করতে হবে যে এই অনুপ্রাসে স্বরের একত্ব ঘটলেই তা যমক হয়ে পড়বে।

(।৶০) বনবিহারিণী চকিত হরিণী।

"আত্মবিস্মৃতিতে, হায়, অকস্মাৎ সতী,
মুছিলা সিন্দুর-বিন্দু সুন্দর ললাটে !"

এবং "ফাল্গুন-মাধুরী তার চরণের মঞ্জীরে মঞ্জীরে
নীলমণি-মঞ্জরীর গুঞ্জন বাজায়ে দিল কি রে !"

—প্রভৃতি অংশে নিয়মানুসারে ছেকানুপ্রাস হয়নি, কারণ ন্দ, ঞ্জ ধ্বনির দুবারের অধিক বিন্যাস ঘটেছে। কেবল 'স্ম' এর ছেকানুপ্রাস প্রথম অংশে ঘটেছে।

চতুর্থটির নাম **শ্রুত্যনুপ্রাস**—শ্রুতিতে সাম্য অনুভূত হলে ভিন্ন ব্যঞ্জনেও দোষ নেই, অনুপ্রাসের মাধুর্য ঘটবে, এই ভাব।

উদাহরণ :

(৵০) শ্রাবণ-গগনে ঘোর ঘনঘটা [গ ও ঘ]

(৵০) মাথহি তপন তপত পথ-বালুক
আতপ-দহন-বিথার। [ত ও থ]

(৶০) কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত, দাদুরি ডাকিছে সঘনে।
[ত ও দ]

(।০) ওগো নির্জনে বকুল শাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে, দোদুল দুলিছে।
ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল
আঁচল আকাশে হতেছে আকুল
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক, কবরী খসিয়া খুলিছে।
[চ, ছ, জ ও ঝ]

(।৵০) একাকার হ'ল তীরে আর নীরে তালতলায়
[র ও ল] ইত্যাদি

সংস্কৃতে এ ছাড়া 'লাটানুপ্রাস' আছে। বাঙ্‌লায় তার প্রয়োগ নেই। বস্তুতঃ প্রয়োগের বৈচিত্র্যে অনুপ্রাস অসংখ্য রকমের হতে পারে। তাদের গণনা সম্ভবপর নয়। ইংরেজী Onomatopœia-র সাদৃশ্যে অথবা ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যঞ্জনাগুণ আছে মনে করে কেউ কেউ

"ধ্বন্যুক্তি" নামে অলংকারান্তরের যোজনা করতে চেয়েছেন। এরূপ করার কোনো সার্থকতা আমরা দেখি না। কারণ, সার্থক অনুপ্রাস মাত্রেই ধ্বন্যুক্তি। আর সংস্কৃত-দুহিতা বাঙ্‌লার শব্দগত ধ্বনিমাধুর্য এত বেশি যে ইংরেজির Onomatopœiaর কোনো অতিরিক্ত বৈচিত্র্য আমাদের ভাষায় স্বীকৃত হয় না।

যমক

লক্ষণ:—পাশাপাশি অবস্থিত একাধিক ব্যঞ্জন যদি অবিকল স্বরসহ একাধিকবার উচ্চারিত হয়, এবং ঐ শব্দ বা শব্দাংশগুলি যদি সমার্থক না হয়, অথবা নিরর্থক হয়, তাহলে তাকে **যমক** বলা যায়। সমার্থক হলে চমৎকৃতি থাকে না, যেমন, "ঘরে ঘরে" "পাতায় পাতায়"।

যমক যেন ছেকানুপ্রাসেরই পরবর্তী বিশিষ্ট গঠনভঙ্গিমা। অনুপ্রাসে স্বরসাম্যের প্রয়োজন অনুভূত হয় না, যমকে স্বরসাম্য থাকতে হবে, এই তফাত। যমক অনেকটা কষ্টকল্পিত অলংকার, এজন্য বিদগ্ধ-সমাজে এর কাব্যমূল্য স্বীকৃত হয়নি।

এই যমক চরণের আদিতে, অন্তে বা মধ্যে থাকতে পারে। যমক সংস্কৃতেই কষ্টকল্পিত অলংকার, বাঙ্‌লার তো কথাই নাই। কবিওয়ালাদের রচনাই এর প্রমাণ। ঘটকর্পর ছোট একটা বর্ষার কাব্য যমকে লিখে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। ক্বচিৎ অনায়াসে সমাগত হয়েছে এমন দৃষ্টান্তও অবশ্য দেখা যায়, যেমন, 'তব উপ**বন**-প**বন** এসে', 'জলসিঞ্চিত-ক্ষিতি-সৌ**রভ**-**রভ**সে'। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল—

(/০) **কীর্তিবাস কীর্তিবাস** কবি, এ বঙ্গের অলংকার!

(৵০) আশার **আশা** ভবে **আসা** আসা মাত্র হোলো!

(৶০) **গিরি, যায়** হে লয়ে হর প্রাণ-কন্যা **গিরিজায়**।
পার তো রাখ প্রাণের ঈশানী, বাঁচে পাষাণী, **গিরি, যায়**।

(।০) বৎসরা**ন্তে আনতে** যেতে হবে না।

(।৵০) **মৌলোভী** যত **মৌলবী** আর মোল্লারা কন হাত নেড়ে।

(।৶০) সুদূর গোঠের শ্যাম**বার্তা** কি স্মরিছে রে **বার্তাকু** ?

(॥০) ভাবুক স্ব**ভাবে ভাবে** করে অনুরাগ।

(॥/০) **তারে** তার জানা যায় রস ষোল-**আনা**।
অরসিক লোক তবু বলে **তারে আনা** ॥

(॥৵০) **কাল** কোকিল রএ **কাল** বৃন্দাবনে।
এবে **কাল** ভৈল মোকে নান্দের নন্দনে ॥

(॥৶০) **সহস্র কিরণ** ধরে **সহস্রকিরণ**।
সহিতে তাহার তাপ নাহি কোন জন ॥

(৸০) তব **পুর**সুন্দরীর নূ**পুর**-নিক্কণ

(৸/০) বাজে পূ**রবীর** ছন্দে **রবির**

(।/০) **রূপ**শালী-ধান-ভানা **রূপ** দ্যাখো তোমরা।

শ্লেষ

লক্ষণ ঃ—একটি শব্দ উচ্চারিত হলে যদি একাধিক অর্থের প্রতীতি হয় তাহলে শ্লেষালংকারের চমৎকারিতা উদ্ভূত হয়। এই শ্লেষ **শব্দ-শ্লেষ**, শুধু ধ্বনির উপর নির্ভরশীল।

শ্লেষ যেন সার্থক যমকের পরবর্তী রূপ। যমকের ভিন্নার্থক দুটি অংশ যেন এখানে এক হয়ে যায়। অবশ্য পৃথক থেকেও শ্লেষ হতে পারে। ইংরেজি 'Pun' এর সঙ্গে এর আংশিক সাদৃশ্য আছে। শ্লেষ কখনও **সভঙ্গ,** অর্থাৎ যে দুটি অর্থ অভিপ্রেত তার একটি শব্দকে ভেঙে নিলে তবে পাওয়া যাবে। যেমন কীর্তনিয়ার গানে—'নয়ন নাচাইছে'। দ্বিতীয় অর্থটি পেতে হলে "না + চাইছে" এইভাবে ভেঙ্গে নিতে হবে ; "এলোনা মাধব" দ্বিতীয় অর্থে এলোনা "মা + ধব"। অথবা যেমন দাশরথির—

"যখন অধিকার করবে কফে
অধিকার কি থাকবে জপে ?"

এখানে দ্বিতীয় 'অধিকার' শব্দটিকে ভেঙে নিলে (অধিক + আর) অন্য একটি অর্থ পাওয়া যাবে। 'নিত্য সেবার পেয়ে আয়োজন,

তৃপ্ত পরানে করিছে কূজন' এখানে ভাঙা 'নিত্য ও সেবা' শব্দ দুটিকে একত্র গেঁথে নিলেই বৈষ্ণবীয় বিগ্রহের নিত্যসেবার দ্যোতনা মিলবে।

অভঙ্গ শ্লেষে শব্দটিকে না ভাঙ্‌লেও দুটি অর্থ পাওয়া যাবে। এককালে বাঙলায় এ সবের খুবই প্রচলন ছিল। কবিগান ও ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় এর দৃষ্টান্ত প্রচুর। এখন অভঙ্গ শ্লেষও বিশেষ দেখা যায় না। যমকের মত শ্লেষও কষ্টকল্পিত অলংকার। তবে শ্লেষ যেখানে অন্য অলংকারকে পুষ্ট করে সেখানে রমণীয়তা বিশেষ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।*

উদাহরণ :

(/০) **মধু**হীন কোরোনা গো তব মনঃকোকনদে।

(৵০) মাথার উপরে জ্বলিছেন **রবি**, রয়েছে সোনার শত ছেলে।

(৶০) বুদ্ধের মতন যাঁর **আনন্দ** সে নিত্য সহচর।

(।০) জিতলে **চতুরঙ্গ** খেলায় নৌকা-গজে জোড় ধ'রে।

('চতুরঙ্গে'র দ্বিতীয় অর্থে সেনানীর চারটি অঙ্গ)

(।/০) হেমাঙ্গী হইয়াছে **কালীর** বরণ

(১) কন্যার রূপ মলিন হয়েছে (২) দুর্গা কালীতে পরিণতা হয়েছেন।

(।৵০) বাজে পূরবীর ছন্দে **রবির** শেষ রাগিণীর বীণ

(সূর্য এবং রবীন্দ্রনাথ)

(।৶০) চন্দ্র সবে ষোল কলা হ্রাসবৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥
চন্দ্রের হৃদয়ে কালী কলঙ্ক কেবল।
কৃষ্ণচন্দ্রহৃদে কালী সর্বদা উজ্জ্বল॥
পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি চন্দ্রেরে দেখিলে।
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মেলে॥

এখানে 'কলা' 'কালী' এবং 'পদ্মিনী' শব্দকে পৃথকভাবে বসিয়ে শ্লেষ গঠন করা হয়েছে। বলা যায় সভঙ্গ শ্লেষ। আর এই শ্লেষই এখানে ব্যতিরেক অলংকারের কারণ হয়েছে, সুতরাং এখানে শুধু যমক

* তুং দণ্ডী—শ্লেষঃ সর্বাসু পুষ্ণাতি প্রায়ো বক্রোক্তিষু শ্রিয়ম্।

বললে ভুল করা হবে। সব মিলিয়ে এখানে শ্লেষ ও ব্যতিরেকের এবং বিরোধের সংকর হয়েছে।*

মনে রাখতে হবে অলংকার-সংকর নামে স্বতন্ত্র কোন অলংকার নেই, আর সাহিত্যিক শব্দার্থে প্রায়শই একাধিক অর্থালংকার মিশ্রিত থাকে।

শ্লেষ শব্দালংকার এবং অর্থালংকার দুই-ই হতে পারে। শ্লেষবাচী শব্দটি তুলে নিয়ে অন্য শব্দ বসালেও যদি শ্লেষ থাকে তা হলে বুঝতে হবে শ্লেষটি শব্দের উপর নির্ভরশীল নয়, অর্থের উপর নির্ভরশীল এবং সেখানে **অর্থশ্লেষ** হয়েছে। যেমন, (কু-কথায় পঞ্চমুখ) 'কণ্ঠভরা বিষ' এর জায়গায় 'কণ্ঠেতে গরল' বললেও যেহেতু শ্লেষ সিদ্ধ হয় সেইহেতু এই অংশে অর্থশ্লেষ।

বক্রোক্তি

লক্ষণ :—বক্রোক্তি শব্দের একটি সামান্য অর্থ আছে, যা দ্বারা যাবতীয় বাচ্য-বাচকের বক্রতা বা বৈচিত্র্যকারক অলংকরণকে বোঝায়। তখন এটি সর্বালংকারসামান্য চমৎকৃতি, বিশেষ 'বক্রোক্তি' অলংকার নয়। পূর্বাধ্যায়ে ঐ বিষয়টি দেখানো হয়েছে।

বিশেষ অর্থে, **যেখানে বক্তব্যকে ঘুরিয়ে বলা হয়, যেমন 'না' বা 'হাঁ'-জ্ঞাপক বাক্যকে প্রশ্নবাক্যের দ্বারা জানানো হয়,** কতকটা ইংরেজি Interrogation এর সদৃশভাবে, অথবা শ্লেষ প্রয়োগ করে উক্তি-প্রত্যুক্তির চমৎকারিতা আনা হয় সেখানে এই অলংকার হয়েছে বলা যায়।

*কোন অংশে একাধিক অলংকার স্বতন্ত্রভাবে থাকলে 'অলংকার-সংসৃষ্টি', আর একটি অন্যটির উপর নির্ভরশীল হলে অথবা একাধিক অলংকার পৃথক্ করা যায় না এমনভাবে মিশ্রিত থাকলে অলংকার-সংকর হয়, তবে বাঙ্‌লার ক্ষেত্রে যে-কোন প্রকার মিশ্রণকেই আমরা সাধারণভাবে অলংকার-সংকর নামে অভিহিত করব।

প্রথম ক্ষেত্রে **কাকু-বক্রোক্তি**। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে **শ্লেষ-বক্রোক্তি**। প্রথমটির প্রয়োগ বাঙ্‌লায় আছে, দ্বিতীয়টির নেই বললেই চলে। অথচ প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টির সৌন্দর্যই বেশি।

উদাহরণ :

কাকু-বক্রোক্তি

মাতা আমি নহি? গর্ভভার-জর্জরিতা
জাগ্রত হৃৎপিণ্ডতলে বহি নাই তারে?
স্নেহবিগলিত চিত্ত শুভ্র দুগ্ধধারে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে নাই দুই স্তন বাহি
তার সেই অকলঙ্ক শিশুমুখ চাহি?
শাখাবন্ধে ফল যথা, সেই মত করি
বহুবর্ষ ছিলনা সে আমারে আঁকড়ি
দুই ক্ষুদ্র বাহুবৃন্ত দিয়ে—লয়ে টানি
মোর হাসি হ'তে হাসি, বাণী হ'তে বাণী
প্রাণ হতে প্রাণ?

শ্লেষ-বক্রোক্তি

প্রশ্নকর্তার উক্তির মধ্যে কোনো কোনো শব্দে শ্লেষ রয়েছে। তাঁর অনভিপ্রেত অর্থ ধ'রে উত্তরপক্ষ উত্তর দিচ্ছেন—

(৵০) '**দ্বিজরাজ** হয়ে কেন **বারুণী** সেবন?'
'রবির ভয়েতে শশী করে পলায়ন।'
'বিপ্র হয়ে **সুরাসক্ত** কেন মহাশয়?'
'সুরে না সেবিলে বল মুক্তি কিসে হয়?'

এখানে প্রশ্নোত্তরের মধ্যে শ্লেষ-গ্রথিত উক্তি-প্রত্যুক্তির রমণীয়তা আছে।

(৶০) 'দুয়ার-বাহিরে কে ওই দাঁড়ায়ে?'
'**হরি** আমি,' 'যাও এখান ছাড়ায়ে,
অরণ্যে যাও, বানরে কী কাজ'?

'প্রিয়তমে আমি কৃষ্ণ'। 'ছি, আজ
বড় ভয় পেনু। একে শাখামৃগ
তাহাতে কৃষ্ণ! যাও হে শীঘ্র'।
'হায়, মূঢ়ে, আমি শ্রীমধুসূদন!'
'বল কী, ভ্রমর? যাও উপবন।
দোলে যেথা নব ফুল অনিলে,
বাসি ফুলে, সখা, মধু কি মিলে?'

('কোঽয়ং দ্বারি' ইত্যাদির ভাবানুবাদ)

(৶৹) 'এখন আমার নাম চিদানন্দস্বামী, ইচ্ছা হয়তো পরমানন্দও বলতে পার।' 'বাবা, তা এখন আপনাকে চিঁড়েই বল্, আর পরমান্নই বল্, তুই যে আমার মাখন, বাবা, সে তো আমি ভুলতে পারব না।'

(।৹) কশ্চিৎ ব্রাহ্মণপণ্ডিত—"দাশরথি, তুমি সিদ্ধপুরুষ।" দাশরথি—"আমি হ'লাম সিদ্ধ, আর আপনারা আতপ।"

মনে রাখতে হবে, বক্রোক্তি এখানে শ্লেষনির্ভর, এবং শ্লেষের জন্যই যাবতীয় চমৎকারিত্ব। সুতরাং এখানে শ্লেষই প্রধান অলংকার। কিন্তু কেবল উক্তি-প্রত্যুক্তির ক্ষেত্রেই নয়, **সাধারণ ভাষণেও কোনও শব্দের ব্যুৎপত্তি বা ধ্বনির সাদৃশ্য নিয়ে অন্য শব্দ গঠন ক'রে এ দুয়ের মধ্যে যে চমৎকার-জনক সম্বন্ধ দেখানো হয় সেখানেও 'বক্রোক্তি' স্বীকার করতে হবে**, যেমন,—

বৈশেষিকে বিশেষ কহিতে কিছু নারে।
পতঞ্জলি মাথায় অঞ্জলি বান্ধি হারে॥
সাংখ্যেতে কি হবে, সংখ্যা আত্মনিরূপণ।
পুরাণ সংহিতা শ্রুতি মনু ভিন্ন নন॥

ইংরেজি মতে এখানে Wit. প্রমথ চৌধুরীর বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপূর্ণ উক্তিতে বহুশঃ এই ধরনের বক্রোক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনায় এবং নাট্যগত সংলাপে ছড়া ও হাস্যরসের কবিতাতেও এর লক্ষণীয় প্রয়োগ রয়েছে।

পুনরুক্তবদাভাস

বাঙ্‌লায় এর তেমন ব্যবহার নেই।

লক্ষণ :—ভিন্ন ভিন্ন আকারের শব্দের প্রয়োগে একই পদার্থের ভাষণ। আপাতভাবে মনে হয় পুনরুক্তি হচ্ছে।

উদাহরণ :

(/০) শিখিধ্বজ স্কন্দ তারকারি
সুন্দর লক্ষ্মণ শূরে দেখিলা বিস্ময়ে
নিজ প্রতিমূর্তি মর্ত্যে !

(৵০) কোথা মধু কামসখা ঋতুরাজ আজ,
ময়লা আকাশ, ভ্যাপসা গন্ধ, মাটিতে পাঁক।

(খ) অর্থালংকার

(উপমা-শ্রেণীর বা সাদৃশ্য-মূল অলংকার)

উপমা

লক্ষণ :—লোকপ্রসিদ্ধ অন্যবস্তুর সঙ্গে বর্ণনীয় বস্তুর সাদৃশ্য নির্মাণের ফলে উদ্ভূত চারুত্ব।

এই সাদৃশ্য নির্মিত হয় সাধর্ম্য আবিষ্কারের ফলে। সাধর্ম্য আবিষ্কার কবি-প্রতিভার গুণ। নতুবা, কোথায় বা মুখ, কোথায় বা চাঁদ, কোথায় সজলপক্ষ্ম নেত্র, কোথায় হিমসম্পৃক্ত-কেশর পদ্ম-পত্র, কোথায় সুগৌর দেহ, কোথায় কনকাচল—দুই-ই বিসদৃশ। শক্তিমান্ কবি এর মধ্যে সাধর্ম্য আবিষ্কার ক'রে একটি সুচারু নববস্তু গঠন করেন। সুতরাং এমনও বলা যায় যে **দুই পরস্পর-অসম্বন্ধী বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কারের ফলে যে চমৎকৃতি** তা-ই উপমা অলংকারের বিষয়। ইংরেজিতে Simile বলতে সাধারণভাবে বিসদৃশের ও বিজাতীয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কার বোঝায়। কিন্তু সংস্কৃত-বাংলায় উপমান-উপমেয় নিতান্ত বিসদৃশ ও বিরুদ্ধ হলে এ

অলংকার হবে না। সর্বজনগ্রাহ্য মোটামুটি একটা সাদৃশ্য থাকতেই হবে। বাকিটুকু হবে কবিকল্পিত।

কবি কালিদাসের উপমায় খ্যাতি। তাঁর আহৃত উপমান বস্তু প্রায়শই নৈসর্গিক, আর তা এমন যথাযথ যে পরিবর্তিত করলে ঐ সৌন্দর্য আর থাকে না। এইখানে তাঁর প্রতিভার অসাধারণত্ব। কবিপ্রতিভা নিয়তিকৃতনিয়মরহিতা ব'লেই আবার উপমানবস্তু, উপমানোপমেয়ের সাধর্ম্যের রূপ যায় বদলে। আধুনিক কবি চাঁদকে ঝলসানো রুটির সঙ্গে তুলনা করেছেন, করেছেন ক্ষুধাতুরা রুগ্ণা ষোড়শীর সঙ্গে, কাস্তের সঙ্গে। কোনো সংস্কৃত কবি চাঁদকে নির্লজ্জ চপল ব্যক্তির সঙ্গে, কমলালেবুকে মদ্যপায়ী হূনের চিবুকের সঙ্গে।

উপমার এই সাদৃশ্য-গুণ কয়েকটি উত্তম চমৎকৃতি-কল্পনার বা অলংকারের মূলে রয়েছে। সেগুলি এর পরেই নির্দেশিত হচ্ছে।

উপমা অলংকারের চারটি অবয়ব থাকে—

(১) **উপমেয়**—অর্থাৎ বর্ণনীয় বস্তু। একে বিষয়, প্রকৃত, প্রস্তুত প্রভৃতি শব্দের দ্বারা জ্ঞাপন করা হয়।

(২) **উপমান**—অর্থাৎ যার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখানো হয়। একে বিষয়ী, অপ্রকৃত, অপ্রস্তুত প্রভৃতি শব্দের দ্বারাও জ্ঞাপন করা হয়।

(৩) **সাধারণ ধর্ম**—যেমন, উজ্জ্বলতা, গোলত্ব, উত্তাপ, শুভ্রতা, বাচালতা প্রভৃতি।

(৪) **সাধারণ ধর্মের বাচক বা দ্যোতক শব্দ**—মত, সদৃশ, তুল্য, যেমন, যথা, যেন প্রভৃতি।

এ চারটি অবয়বের কখনো কখনো যে-কোনো একটি, দুটি বা তিনটি লুপ্ত বা উহ্য থাকে। তখন একে বিশেষভাবে বলা হয় **লুপ্তোপমা**। চারটি অবয়বই উল্লিখিত থাকলে বলা হয় **পূর্ণোপমা**। সংস্কৃতে পূর্ণোপমাকে দুটো ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, **শ্রৌতী** যখন যথা, ইব প্রভৃতি অব্যয় ঔপম্যের বাচক হয়, আর **আর্থী**, যখন তুল্য,

সদৃশ' প্রভৃতি শব্দ ঔপম্যের দ্যোতক হয়। বাঙ্‌লায় এরকম শ্রেণী-বিভাগের আবশ্যকতা দেখি না।

উপমা অর্থাৎ পূর্ণোপমার উদাহরণ ঃ

(৵০) শুনি সে বারতা
ছাত্রগণ মৃদুস্বরে আরম্ভিল কথা,
মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল
পতঙ্গের মতো।

এখানে উপমেয় 'ছাত্র', উপমান 'পতঙ্গ', সাধারণ ধর্ম 'চাঞ্চল্য' এবং ঐ ধর্মের বাচক শব্দ 'মতো'।

(৶০) পাটলবর্ণা নন্দিনীর পশ্চাতে আছেন মহারাজ দিলীপ, আর সম্মুখে রয়েছেন রাণী সুদক্ষিণা, এই অবস্থায় দিবস ও রজনীর মধ্যবর্তিনী সন্ধ্যার মত নন্দিনী শোভা পেতে লাগলেন।

—এখানে উপমেয় 'নন্দিনী', উপমান 'সন্ধ্যা', সাধারণ ধর্ম পাটলাভা, বাচক শব্দ 'মত'।

(৶৹০) একটি ক্ষুদ্র ছিপছিপে তকতকে ষ্টীম নৌকা যেমন বৃহৎ বোঝাইভরা গাধাবোটকে স্রোতের অনুকূলে ও প্রতিকূলে টানিয়া লইয়া চলে, তেমনি আমাদের দেশীয় গৃহিণী লোক-লৌকিকতা আত্মীয়- কুটুম্বিতা-পরিপূর্ণ বৃহৎ সংসার এবং স্বামী নামক একটি চলৎশক্তি-রহিত অনাবশ্যক বোঝা পশ্চাতে টানিয়া লইয়া আসিয়াছে।

এখানে উপমেয় 'গৃহিণী' প্রভৃতি, উপমান 'স্টীম নৌকা' প্রভৃতি, সাধারণ ধর্ম 'ছিপছিপে, তকতকে, বহনক্ষমতা' এবং বাচক শব্দ 'যেমন-তেমনি'।

(৷০) লতার সহিত ফুলের যেরূপ সম্বন্ধ তপোবনের সহিত শকুন্তলার সেইরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ।

(৷৵০) যেমন শ্লোকের এক চরণ সম্পূর্ণ মিলনের জন্য অন্য চরণের অপেক্ষা করে, তেমনি দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রথম মিলন সম্পূর্ণতা লাভের জন্য দ্বিতীয় মিলনের একান্ত অপেক্ষা রাখে। (এখানে মিলনের ভাব সাধারণ ধর্ম)।

(।৵০) অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য ভাসে।
তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ পরকাশে ॥

উপমেয় 'জীব' ও 'গোবিন্দ', উপমান 'স্ফটিক' ও 'সূর্য', সাধারণ ধর্ম ভাস বা প্রকাশ, বাচক শব্দ 'যৈছে-তৈছে'।

(।৶০) কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম।
নির্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম ॥

(॥০) সূর্যচন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্মের প্রচার ॥
এই মত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান-
তমোনাশ করি কৈল বস্তুতত্ত্বদান ॥

উপমেয় দুই ভাই (গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ), উপমান সূর্যচন্দ্র, সাধারণ ধর্ম—অন্ধকার-বিনাশ, বাচক শব্দ 'মত'।

(॥/০) বন্দী হয়ে সনেটের ক্ষুদ্র কারাগারে
কাঁদে যথা সুকবিতা গুমরে গুমরে
মনোদুঃখে, ঘোমটায় জলদ-আঁধারে
তোমার ও-মুখশশী কাঁদিছে কাতরে।

—উপমেয় 'প্রিয়ামুখ', উপমান 'সুকবিতা', সাধারণ ধর্ম 'বন্দীত্ব' প্রভৃতি, বাচক শব্দ 'যথা'। রূপক-গর্ভ।

(॥৵০) এক ফুলে মকরন্দ পান করি সদানন্দ
ধায় অলি অপর কুসুমে।
এক ঘরে পায়্যা মান গ্রামযাজী দ্বিজ যান
অন্য ঘরে যেমত সম্ভ্রমে ॥ (সম্ভ্রমে = দ্রুত)

উপমেয় 'অলি' 'ফুলে', উপমান 'দ্বিজ' 'ঘরে' প্রভৃতি, সাধারণ ধর্ম 'আনন্দ', 'ধায়', 'সম্ভ্রম', বাচক শব্দ 'যেন'। *

* কোনো কোনো বাংলা অলংকার গ্রন্থে 'যেন' শব্দ থাকলেই 'উৎপ্রেক্ষা' ধ'রে নেওয়ার বাতিক দেখা যায়। 'উৎপ্রেক্ষা' অলংকারের আলোচনায় এ বিষয়টি পরিস্ফুট করা হচ্ছে।

(৷৶৹) **সম্প্রতি তিনি অহরহ শিশুপঙ্গপালে আচ্ছন্ন হইয়া বর্জাইস অক্ষরের ছোটোবড়ো নোটের দ্বারা আদ্যোপান্ত সমাকীর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধের ন্যায় শোভমান হইলেন।**

উপমেয় 'তিনি' 'শিশু-পঙ্গপাল' প্রভৃতি, উপমান 'ঐতিহাসিক প্রবন্ধ' 'বর্জাইস অক্ষরের নোট' প্রভৃতি। সাধারণ ধর্ম 'শোভা' 'আচ্ছন্নতা, 'সমাকীর্ণতা', বাচক শব্দ 'ন্যায়'।

(৸৹) বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ-প্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী-পরমেশ্বরৌ॥

উপমেয় 'পার্বতী-পরমেশ্বর'; উপমান 'বাগর্থ', সাধারণ ধর্ম 'সম্পৃক্ততা', বাচক শব্দ 'ইব'।

(৸৴৹) শুভ্রখণ্ডমেঘ
মাতৃদুগ্ধ-পরিতৃপ্ত সুখনিদ্রারত
সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মতো
নীলাম্বরে শুয়ে।

(৸৵৹) প্রভু কহে, পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দুপাতে কেহো না করে পরশ॥
যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্বগুণবান্।
তাহারে মলিন করে এক রাজ নাম॥

(৸৶৹) পশিলা পুরে রক্ষঃ-অনীকিনী—
রণবিজয়িনী ভীমা চামুণ্ডা যেমতি
রক্তবীজে নাশি দেবী, তাণ্ডবে উল্লাসে,
অট্টহাসি রক্তাধরে, ফিরিলা নিনাদে,
রক্তস্রোতে আর্দ্রদেহ! দেবদল মিলি
স্তুতিলা সতীরে যথা, আনন্দে বন্দিলা
বন্দিবৃন্দ রক্ষঃসেনা বিজয়-সংগীতে!

এরকম উপমার সঙ্গে ব্যাপক চিত্রকল্পনা যুক্ত রয়েছে বলে ইংরেজি মতে এটি Homeric Simile.

লুপ্তোপমা

উদাহরণ :

(/০) অধর কিসলয়-রাঙিমা-আঁকা
যুগল বাহু যেন কোমল শাখা।
হৃদয়-লোভনীয় কুসুম হেন
তনুতে যৌবন ফুটেছে যেন।

এখানে প্রথম পাদে বাচক শব্দ লুপ্ত হওয়ায় লুপ্তোপমা, পরবর্তী অংশে পূর্ণোপমা।

(৵০) নবাবী আমল শীতকালের সূর্যের মত অস্ত গেল, মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠল।

এখানে সাধারণ ধর্ম বলা হয়নি।

(৶০) এই প্রেমা আস্বাদন তপ্তইক্ষু চর্বণ
জীভ জ্বলে না যায় ত্যজন।

এখানে বাচক শব্দ অবিদ্যমান।

(।০) সে সবার কণ্ঠস্বর কর্ণে আসে মম
সমুদ্রের তরঙ্গের কলধ্বনি সম
তব কাব্য হতে।

এখানে সাধারণ ধর্ম লুপ্ত।

(।/০) আকাশ সোনার বর্ণ সমুদ্র গলিত স্বর্ণ

এখানে সাধারণ ধর্ম ও বাচক শব্দ লুপ্ত।

(।৵০) বড়ো বড়ো দুটি চক্ষু পল্লব-প্রচ্ছায়
রেখো মোর মুখ-পানে।

এখানে উপমান 'পুষ্পদল' লুপ্ত। ইংরেজি মতে Suppressed Metaphor.

(।৶০) দুটি স্বচ্ছ নেত্র হতে
কাঁপিত আলোক নির্মল নির্ঝরস্রোতে
চূর্ণরশ্মিসম।

—এখানে 'নেত্রের' উপমান লুপ্ত।

(৷৹) রাত্রির রাজ্ঞীর বেশে পূর্ণচন্দ্র কভু দেয় দেখা

—এখানে সাধারণ ধর্ম লুপ্ত।

(৷৴৹) সূর্যকান্তমণি-
সম এ পরাণ কান্তে; তুমি রবিচ্ছবি;
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।

এখানে 'সূর্যকান্তমণি ও প্রাণের' মধ্যে 'রবি ও প্রমীলা'র মধ্যে সাধারণ ধর্ম লুপ্ত।

(৷৵৹) হায়, সখি, জানিতাম যদি
ফুলরাশি মাঝে দুষ্ট কাল-সর্প-বেশে,
বিমল সলিলে বিষ, তাহ'লে কি কভু
ভূমে লুটাইয়া শিরঃ নমিতাম তারে?

এখানে প্রথমটিতে উপমা, দ্বিতীয়টিতে রূপক।

(৷৶৹) না ধরিলে রাজা বধে, ধরিলে ভুজঙ্গ।
সীতার হরণে যেন মারীচ কুরঙ্গ॥

(৸৹) সীতাহারা আমি যেন মণি-হারা ফণী।

(কোনো কোনো অলংকার-পুস্তকে ভুলক্রমে এটি উৎপ্রেক্ষার উদাহরণরূপে আহৃত হয়েছে।)

(৸৴৹) তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম সুতমিত রমণী সমাজে।

সমাসবদ্ধ হলে উপমেয়, অথবা সাধারণ ধর্ম এবং বাচক শব্দ লুপ্ত থাকে। যেমন "বিছাইছ দুগ্ধশুভ্র বিরহশয়ন", "করুণ কপোতকণ্ঠে গাও মূলতান", "চকিত-হরিণী-লোচনা", "কুমুদহাসিনী" প্রভৃতি।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপমা পরিস্ফুট ভাবে প্রকাশিত না হয়ে ব্যঞ্জিত হয়।

মালোপমা

লক্ষণ :—একটি উপমেয়ে বহু উপমানের যোজনায় যে সৌন্দর্য ফুটে ওঠে তা মালোপমার বিষয়।

উদাহরণ :

(৵০) মহাপুরুষদের উপর যে ভক্তিটুকু ছিল মরিচহীন কর্পূরের মত, ছিপিহীন ইথরের মত একেবারে উবে গেল।

(৶০) যেমন পদ্মের দ্বারা সরসী, শশীর দ্বারা রজনী, যৌবনের দ্বারা বনিতা, তেমনি নীতির দ্বারা রাজ্যশ্রী মনোহরা হয়ে উঠল।

(৶৹০) মেহগিনির মঞ্চ জুড়ি পঞ্চ হাজার গ্রন্থ,
সোনার জলে দাগ পড়ে না, খোলে না কেউ পাতা,
অস্বাদিত মধু যেমন, যূথী অনাঘ্রাতা, *

(।০) সিংহপৃষ্ঠে যথা
মহিষমর্দিনী দুর্গা ; ঐরাবতে শচী
ইন্দ্রাণী ; খগেন্দ্রে রমা উপেন্দ্র-রমণী,
শোভে বীর্যবতী সতী বড়বার পিঠে—

(।৵০) মলিন-বদনা দেবী, হায়রে, যেমতি
খনির তিমির-গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্যকান্ত মণি ;
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে !

সাধারণ ধর্মের উল্লেখ না থাকলেও মালোপমার ব্যাঘাত হবে না।

অনন্বয়

লক্ষণ ঃ—উপমেয়ে কোনো উপমানেরই সঙ্গে সাদৃশ্য সম্বন্ধ স্থাপন সম্ভব না হলে **অনন্বয়** হয়। অর্থাৎ উপমেয় এমন ধরনের ন ভূতো ন ভবিষ্যতি যে ঐ উপমেয়টিই তার একমাত্র উপমান হওয়া উচিত।

উদাহরণ :

(৵০) রামরাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব—রাম-রাবণের যুদ্ধ রাম-রাবণের মতই।

* তুলনীয় কালিদাস—"অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈঃ" ইত্যাদি।

(৵০) গোরাচাঁদের তুলনা গোরাচাঁদ গোঁসাই রে
বিচার করিয়া দেখ সভে।

(৶০) অতি ছল, অতি খল, অতীব কুটিল,
তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল।

(।০) তার যাহা কিছু তাহারি মতন—একবার হলে গত,
এ ছায়া-আলোকে আর পড়িবে না কায়াখানি তার মত !

প্রতীপ

লক্ষণ :—উপমেয়কেই উপমানরূপে প্রতিষ্ঠিত করলে (আর সেই সঙ্গে উপমানকে উপমেয়রূপে গণ্য করলে) **প্রতীপ** অলংকার হয়। একে বিপরীত-উপমাও বলা হ'ত।

উদাহরণ :

(৴০) তব নেত্রসমকান্তি সরোবরে ছিল ইন্দীবর,
আজ সে সলিলে মগ্ন। নিবিড় মেঘের অন্তরাল
বিলুপ্ত করেছে তব মুখচ্ছায়া-অনুকারী শশী।
তোমার ললিত গতি নিয়েছে যে-বলাকামরাল
সেও গেছে দূরে। বল, এ দীর্ঘ বিরহ আজ কী দৃশ্যে জুড়াই।
('যৎ ত্বন্নেত্রসমানকান্তি' ইত্যাদির অনুবাদ)

এখানে নেত্র, মুখ প্রভৃতি উপমেয় উপমানরূপে স্থাপিত। বিপরীত ভাবে, প্রসিদ্ধ উপমানগুলিকেই উপমেয় করা হয়েছে এমনও বলা যেতে পারে।

(৵০) তব কণ্ঠধ্বনি নিয়ে বীণা এল ধরণীর 'পরে—

(৶০) শেফালিকা এল উমার বর্ণ মাখি

(এখানে দু-জায়গাতেই অতিশয়োক্তির সঙ্গে সংকর ঘটেছে)

(।০) মায়ের মুখের হাসির মত কমলকলি উঠল ফুটে।

(।৴০) উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম !

(এখানেও অতিশয়োক্তি ও প্রতীপের সংকর)

এরকম ক্ষেত্রে সর্বত্র উপমেয়ের প্রতি অনুরাগবশতঃ তার উপমানকল্পনা এবং উপমানের প্রতি অনাদরবশতঃ তার উপমেয়ত্ব স্থাপন।

ব্যতিরেক

লক্ষণ :—উপমান থেকে উপমেয়ের বিশেষ গুণাতিরেক। অর্থাৎ উপমান অপেক্ষা উপমেয়কে অধিকগুণ বা উৎকৃষ্ট করে, বর্ণনা করলে যে চমৎকারিত্ব ফুটে ওঠে তা ব্যতিরেক অলংকারের বিষয়।

ব্যতিরেক 'নিন্দি', 'জিনি' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা পরিস্ফুটভাবে বাচ্য অর্থাৎ শব্দোপাত্ত হতে পারে, আবার তা গূঢ়ভাবে থাকতে পারে বা বর্ণনায় ভাবে ব্যঞ্জিত হতে পারে। পরবর্তীটি অধিকতর সৌন্দর্যের জনক।

উদাহরণ : **পরিস্ফুট ব্যতিরেক :**

(/০) নিন্দি ইন্দীবর মুখ, আকর্ণ দীঘল বিলোচন

(৵০) ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত

(৶০) বদন জিতল শারদ ইন্দু

(।০) কদম্বকেশর জিনি একটি পুলক রে

(।/০) শত মুক্তাধিক আয়ু কাল-সিন্ধু-জলতলে ফেলিস পামর

(।৵০) দেখ আসি সুখে,
রোহিণী-গঞ্জিনী বধূ ; পুত্র, যাঁর রূপে
শশাঙ্ক কলঙ্কী মানে।

(।৶০) বঙ্গের নিকুঞ্জবনে,—পিক-কণ্ঠে আছে মধু জানি,
তা হ'তে অধিক মধু মঞ্জুবাক্ বঙ্কিমের বাণী।

(॥০) এ যে সরস্বতীর শয্যা, ইন্দ্রের রণভূমি, মদনের সুখকুঞ্জ,
লক্ষ্মীর সিংহাসন। ইহার কাছে প্রতাপ ? ছি! ছি!
সমুদ্রের কাছে গঙ্গা!

গূঢ় ব্যতিরেক :

(/০) যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন।

সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ॥

(মরাল-বারণের চলন অপেক্ষা বিদ্যার চলনের উৎকর্ষ)

(৵৹) বাসব যাহার করেন পীড়ন
সহায় শরণ তুমিই তাহার।

(এখানে ইন্দ্রের থেকে সমুদ্রের প্রতাপাধিক্য)

(১৹) গোরার তুলনাস্থল অতসী কুসুম ছিল
কীট তারে করিল বিরূপ।
দামিনী চঞ্চল ভেল মেঘ আড়ে লুকাওল
যব সো হেরল গোরারূপ॥

(দ্বিতীয়াংশে উৎপ্রেক্ষার সঙ্গে সংকর হয়েছে)

(৷৹) পরশমণির সাথে কি দিব তুলনা রে,
পরশ ছোঁয়াল্যে হয় সোনা।
আমার গৌরাঙ্গ-গুণে নাচিয়া গাহিয়া রে
রতন হইল কত জনা॥

(স্পর্শমণি অপেক্ষা গৌরাঙ্গের গুণাধিক্য)

(৷৴৹) গৌরাঙ্গ-চাঁদের ছাঁদে ও চাঁদ কলঙ্কী রে
এমন করিতে নারে আলো।
অকলঙ্ক পূর্ণ চাঁদ উদয় নদীয়াপুরে
মনের আঁধার দূরে গেল॥

(এখানে ব্যতিরেকটি রূপকের দ্বারা পুষ্ট হয়েছে)

(৷৵৹) এ গুণে সুরভি সুরতরু সম নহে রে
মাগিলে সে পায় কোন জন।
না মাগিতে অখিল ভুবন ভরি জনে জনে
যাচিয়া দেয়ল প্রেমধন॥

(সুরভি ও সুরতরুর কাছে প্রার্থনা করতে হয়, গৌরাঙ্গের কাছে প্রার্থনা না করলেও প্রেমরূপ ধন পাওয়া যায়, এই তাঁর গুণাধিক্যের কারণ।)

(।৶৹) খনির সোনা নিত্য মেলে হাট বাজারের দুই ধারে,
রূপের সোনা রোজ আসে না, বেচে না সে পোদ্দারে।

(॥৹) দিবাকর-তেজ ম্লান হয়ে যায় দক্ষিণ দিকে গেলে।
সেই দেশে দেখ রঘুর প্রতাপ জয়ী হ'ল অবহেলে।

('দিশি মন্দায়তে তেজো' ইত্যাদির অনুবাদ। এখান বর্ণিত বিষয়ের দ্বারা সূর্যাপেক্ষা রঘুর গুণাধিক্য ব্যঞ্জিত হয়েছে।)

(॥/৹) প্রমীলা সুন্দরী ত্যজি দেহ দাহস্থলে,
পতির উদ্দেশে সতী, পতিপরায়ণা,
যাবে স্বর্গপুরে আজি! হরকোপানলে,
হে দেবি, কন্দর্প যবে মরিলা পুড়িয়া,
মরিলা কি রতি সতী প্রাণনাথে লয়ে ?

(এখানে রতির চেয়ে প্রমীলার গুণাতিরেক অর্থাৎ ব্যতিরেক অলংকারটি ব্যঞ্জিত হয়েছে ।)

(॥৵৹) কোটি কুসুমশর বরিখয়ে যছু পর
তাহে কি জলদজল লাগি।
প্রেমদহন দহ যাক হৃদয় সহ
তাহে কি বজরক আগি॥

(এখানে জলদজল অপেক্ষা কুসুমশরের শক্তির আধিক্য এবং বজ্রাগ্নি অপেক্ষা প্রেমাগ্নির তাপাধিক্য ব্যঞ্জিত হয়েছে।)

(॥৶৹) চাঁদ নিবে যাক নিবুক জ্যোছনা
তাতে কিবা আসে যায়;
হৃদয়-গগনে তুমি জেগে আছ
অম্লান মহিমায়।

(এখানে চাঁদের থেকে প্রিয়ার গুণাধিক্য ব্যঞ্জিত হয়েছে। হৃদয়ের উপর গগনের অভেদ আরোপ করে ব্যতিরেকটি সিদ্ধ করা হয়েছে, তাই রূপকের সঙ্গে সংকর।)

(৮০) মাটির গর্ভে জন্মে যে সতী
সে দিল পরখ অনলে পশি'—
অনলকুণ্ডে জন্মিল যেবা
তার সতীত্ব কোথায় কষি ?

(এখানে সীতার থেকে দ্রৌপদীর গুণাধিক্য)

(৮৴০) অধর-অমৃত আশে ভুলিলা অমৃত
দেব-দৈত্য ; নাগদল নম্রশিরঃ লাজে,
হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী ; মন্দর আপনি
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচ যুগে ।

(৮৵০) জল বিন্দু মীন জন্তু কবহুঁ না জীয়ে ।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে ॥
ভানু-কমল বলি সেও হেন নহে ।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে ॥
চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা ।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা ॥
কুসুম-মধুপ কহি সেহো নহে তুল ।
না যাইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল ॥
কী ছার চকোর-চান্দ দুহুঁ সম নহে ।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে ॥

(এখানে প্রসিদ্ধ প্রণয়সম্পর্কের উপমানগুলির সঙ্গে উপমেয় রাধাকৃষ্ণ-প্রীতির তুলনায় উৎকর্ষ প্রতিপাদিত হয়েছে ।)

কেবল উপমেয়ের উৎকর্ষই নয়, উপমান থেকে পার্থক্য নির্দেশ করলেও কোনো কোনো আলংকারিকের মতে ব্যতিরেক হবে । দণ্ডী নির্দেশ দিচ্ছেন—

শব্দোপাত্তে প্রতীতে বা সাদৃশ্যে বস্তুনোর্দ্বয়োঃ ।
তত্র যদ্ভেদকথনং ব্যতিরেকঃ স উচ্যতে ॥

অর্থাৎ উপমান-উপমেয়ের পরিস্ফুট বা গূঢ় সাদৃশ্যের মধ্যে যদি কোনো পার্থক্য প্রদর্শিত হয় । তিনি উদাহরণ দিচ্ছেন—

"জলধি এবং আপনি (রাজা) উভয়েই গম্ভীর, এবং কেউই বেলা (মর্যাদা) লঙ্ঘন করেন না। কিন্তু সমুদ্র কৃষ্ণ আর আপনি স্বর্ণকান্তি।"

বাঙলায় এরকম সাদৃশ্যের মধ্যে পার্থক্য-প্রদর্শনের উদাহরণ :

"আমার গুরুর উপবীত নাই,
কণ্ঠে তাহার কনক হার ;
শিরে নাই শিখা, নাই জটা-জুট,
আছে বেণী, আছে অলকভার।"

—এখানে গুরুর সঙ্গে প্রিয়ার অভেদ দেখিয়ে পার্থক্য বা বিশেষ নির্দিষ্ট হচ্ছে।

কেউ কেউ উপমান অপেক্ষা উপমেয়কে নিকৃষ্ট করে বর্ণনের ক্ষেত্রেও ব্যতিরেক ধরেছেন। তাঁদের মতে এ ক্ষেত্রে বিপরীত-ব্যতিরেক। প্রাচীন আলংকারিকদের মধ্যে রুদ্রট এবং রাজানক রুয্যক এ মতের পক্ষপাতী। আমরা কিন্তু এক্ষেত্রে কাব্য-প্রকাশকারের সিদ্ধান্তই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে গ্রহণ করছি। প্রকাশকার মম্মট বলেন এখানেও উপমেয়ের উৎকর্ষ, নিকৃষ্টত্বের দিক থেকে উৎকর্ষ।

'যৌবন বসন্তসম সুখময় বটে
দিনে দিনে উভয়ের পরিণাম ঘটে।
কিন্তু পুনঃ বসন্তের হয় আগমন,
ফিরে না ফিরে না আর ফিরে না যৌবন।'

দণ্ডীর নির্দেশ অনুসারেও এখানে ব্যতিরেক হয়েছে, কারণ, উপমেয় যৌবন এবং উপমান বসন্তের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়ে পুনশ্চ ভেদ দেখানো হয়েছে। রুদ্রটাদির মতে উপমেয় যৌবনকে উপমান বসন্তের চেয়ে নিকৃষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, উপমেয় তো উপমানের চেয়ে অল্পগুণ আছেই, উপমান অধিকগুণ বলেই তো তার সঙ্গে বর্ণনীয়বস্তুর সাদৃশ্য দেখিয়ে চমৎকারিত্ব উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস। এহেন অল্পগুণকে নিকৃষ্ট করে বর্ণনা করে লাভ কী? ফলতঃ

আমাদের মনে হয় এ সব ক্ষেত্রে দণ্ডী-বাক্যের অনুসরণে ব্যতিরেককে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা ভালো, নতুবা অপকর্ষের পক্ষে উপমেয়ের অধিকগুণ স্বীকার করা ঠিক। কাব্যপ্রকাশকার এরকম ক্ষেত্রে বলেছেন—"কেউ কেউ এসব ক্ষেত্রে উপমেয়ের থেকে উপমানের আধিক্যের কথা বলে থাকেন। তা ঠিক নয়, এখানে যৌবনগত অস্থৈর্যের আধিক্যই বিবক্ষিত।"—"অত্র যৌবনগতাস্থৈর্যাধিকং হি বিবক্ষিতম্।"

নিম্নলিখিত অংশে কোন্ দিক থেকে ব্যতিরেক হয়েছে ?—

এতেক সহিনু অবলা ব'লে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে॥

নিশ্চয়ই সহনশীলতার আধিক্য ব'লে উপমেয় অধিকগুণ নয়। নির্মমত্ব বা অনুভবের অক্ষমতার দিক থেকেই রাধা পাষাণ থেকেও পাষাণতরা এবং তা-ই কবির অভিপ্রেত রাধামুখবচন। অথচ বাক্যার্থে উপমেয়ের উৎকর্ষ স্পষ্ট। নিচের অংশেও আমরা বর্ণনীয় 'কাল'এর কৃষকের সঙ্গে তুলনায় দোষের দিক থেকে উপমেয়ের উৎকর্ষ অনুধাবন করে চমৎকারিত্ব অনুভব করছি—

সুকৃষক যেই হয় পরিপক্ক শস্যচয়
ছেদন করে সে সুসময়।
তুই কাল নিদারুণ, নাহি জ্ঞান গুণাগুণ,
কাটিছ তরুণ শস্যচয়।

'অনন্বয়' অলংকারে সমস্ত উপমানকেই প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে, উপমান থেকে উপমেয়ের গুণাতিরেক প্রদর্শিত হচ্ছে না। অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্যরূপকে কদাচিৎ উপমানকে খর্ব করা হলেও সেখানে ব্যতিরেক-ভাব প্রবল নয়, রূপকত্বই প্রবল, এই বিষয়গুলি বুঝতে হবে।

প্রতিবস্তূপমা

* লক্ষণ :—উপমান এবং উপমেয় ভিন্নবাক্যগত হয়ে **একই সাধারণ ধর্মের দ্বারা** যুক্ত হলে বা একই সাধারণ ধর্মের প্রতীতি ঘটালে প্রতিবস্তূপমা হয়।

প্রতিবস্তু শব্দের অর্থ প্রতিবাক্যার্থ † যাতে সাধারণ ধর্ম অভিন্ন হয়। প্রতিবস্তূপমা সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে—

(১) উপমায় একবাক্যান্তর্গত দুই পদার্থের সাম্য। প্রতিবস্তূপমায় দুই বাক্যার্থের সাম্য।

(২) উপমায় যথা, যেমন, মত, সদৃশ প্রভৃতি তুলনাবাচক শব্দের প্রয়োগে উপমাটি পরিস্ফুটভাবে বাচ্য হয় (লুপ্তোপমায় ঔপম্যবাচক শব্দ বাইরে না থাকলেও বাচ্যত্বের হানি ঘটে না), প্রতিবস্তূপমায় সেটি কিঞ্চিৎ প্রণিধানগম্য হয়।

(৩) দুটি বাক্যার্থের সাধারণ ধর্ম এক হলেও বৈচিত্র্যের জন্য তা পৃথগ্‌ভাষায় নির্দিষ্ট থাকে।

* আলংকারিদের কয়েকটি লক্ষণবাক্য দেওয়া হচ্ছে—

(১) 'বস্তু কিঞ্চিদুপন্যস্য ন্যসনাৎ তৎসধর্মণঃ।
সাম্যপ্রতীতিরস্তীতি প্রতিবস্তূপমা (যথা) ॥' —কাব্যাদর্শ

প্রতিপাদ্য কোনো বিষয়ের গঠন করে তার সমানধর্মা বিষয়ের বিন্যাসে যদি সাম্যপ্রতীতি হয় তাহলে প্রতিবস্তূপমা হয়।

(২) 'সামান্যস্যদ্বিরেকস্য যত্র বাক্যদ্বয়ে স্থিতিঃ।' অর্থাৎ এক সমানধর্মের বাক্যদ্বয়ে দুবার স্থিতি। —কাব্যপ্রকাশ

(৩) প্রতিবস্তূপমা সা স্যাদ্‌ বাক্যয়োর্গম্যসাম্যয়োঃ।
একোঽপি ধর্মঃ সামান্যো যত্র নির্দিশ্যতে পৃথক্‌ ॥
—সাহিত্য দর্পণ

প্রণিধানগম্যসাম্যযুক্ত দুটি বাক্যের এক সমানধর্ম যে-অলংকারে পৃথক্‌ নির্দিষ্ট হয়।

† প্রতিবস্তু প্রতিবাক্যার্থমুপমা সাধারণধর্মোঽস্যামিতি ব্যুৎপত্তেঃ
—অপ পযদীক্ষিত।

প্রতিবস্তূপমা (দুই বাক্যার্থের) **সাধারণ ধর্মের উপর নির্ভরশীল** উপমা। দৃষ্টান্ত এবং নিদর্শনা বাক্যার্থ-সাম্যের অলংকার, কিন্তু সাধারণ ধর্মের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল নয়। প্রতিবস্তূপমার সঙ্গে এদের পার্থক্য পরে নির্দিষ্ট হচ্ছে।

উদাহরণ—প্রতিবস্তূপমা :

(/০) অঙ্কুর তপন-তাপে যদি জারব
কী করব বারিদ মেহে।
ঈ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কী করব সো পিয়া লেহে।

এখানে উপমান এবং উপমেয় নিয়ে ভিন্ন বাক্যার্থ সমাবেশিত হয়েছে। সাধারণধর্ম "তাপে ক্ষয়িত হওয়া" এবং "নিস্ফলতা" (কী করব) র মধ্যে প্রথমটি উপমান-বাক্যে ভিন্ন শব্দে (তপন-তাপে জারব) নির্দিষ্ট হয়েছে মাত্র। উপমান এবং উপমেয়ে আদ্যন্ত পরিস্ফুট বাক্যার্থ-সাম্য বিদ্যমান।

দুঃখের বিষয়, সাধারণধর্মের ও সমস্ত বাক্যার্থের এই একরূপতার দিকটি উপেক্ষিত হয়ে কোথাও এটি দৃষ্টান্ত অলংকারের উদাহরণরূপে স্থাপিত হয়েছে।

(৵০) হে বৈদর্ভী, তুমিই ধন্যা, তুমি অনন্যা বিশ্বমাঝে,
তব গুণাবলী সদা চঞ্চল করে গুণাধিপ নিষধ-রাজে।
এর চেয়ে বল সার্থকতর কোন্ প্রশংসা চন্দ্রিকার,
সমুদ্রকেও উতরোল করে মনোবিহরণ ভঙ্গি যার ?
['ধন্যাসি বৈদর্ভি' ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ]

এখানে চঞ্চল করা এবং উতরোল করা একই সমানধর্ম দুটি বাক্যার্থে সন্নিবিষ্ট হয়ে উভয়ের সাম্য নির্দেশ করছে।

(৶০) বিনা স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা।
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর
ধারাজল বিনা কভু ঘুচে কি তৃষা॥

মাতৃভাষা ছাড়া মানুষের আশা পূর্ণ হয় না। বৃষ্টিধারা ব্যতীত চাতকীর তৃষ্ণা ঘুচে না—এই দুই বাক্যার্থে আশাপূরণ এবং তৃষ্ণার শান্তি বস্তুতঃ একই সাধারণ ধর্ম বিভিন্নভাবে দুই বাক্যার্থের উপমেয়-উপমানত্ব সম্পূর্ণ করেছে।

(।০) জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি
কতদিন রবে?
নীরবিন্দু দূর্বাদলে নিত্য কিরে ঝলঝলে?

'ভাতির বেশি দিন না থাকা' এবং 'নিত্য ঝলঝল না করা' একই সমানধর্ম—যৌবন এবং নীরবিন্দু এই দুই উপমেয় উপমান-সহ বাক্যার্থ দুটিকে সাদৃশ্যে যুক্ত করেছে।

(।৴০) টুটেছে রূপের বাসা, জেগে আছে প্রেম
বেঁচে আছে চামেলি অমল।
মরণে পুড়েছে খাদ, আছে শুধু হেম
যাত্রীর চির সম্বল।

'টুটেছে'-'পুড়েছে' 'জেগে আছে'-'বেঁচে-আছে' প্রভৃতি একই ধর্ম।

(।৵০) চারিদিকে সখীদল যত,
বিরস-বদন, মরি, সুন্দরীর শোকে।
কে না জানে ফুলকুল বিরস-বদনা,
মধুর বিরহে যবে তাপে বনস্থলী?

এখানে সাধারণ ধর্ম একই শব্দে প্রকাশিত হয়েছে।

(।৶০) লঙ্কার বিভব যত কে পারে বর্ণিতে—
দেবলোভ, দৈত্যকুল-মাৎসর্য? কে পারে
গণিতে সাগরে রত্ন, নক্ষত্র আকাশে?

এখানে বর্ণনা করা আর গণনা করা একই সাধারণ ধর্ম ভিন্ন ভাষায় উপস্থাপিত।

(॥০) লইল
লুটিয়া কুটিল কাল, যৌবন-ভাণ্ডারে

আছিল রতন যত, হরিল কাননে
নিদাঘ কুসুম-কান্তি, নিরখি কুসুমে !

এখানে 'লুটিয়া লইল' এবং 'হরিল' একই সমানধর্ম। উপমান-উপমেয়গুলিতেও গুণগত একটি সাদৃশ্য পরিস্ফুট।

প্রচলিত 'কাব্যশ্রী' পুস্তকে প্রতিবস্তূপমার উদাহরণ হিসাবে আহৃত নিম্নলিখিত অংশটিকে 'অলংকার-চন্দ্রিকা'-কার অপ্রস্তুত-প্রশংসা হিসেবে গ্রহণ করতে চান। কিন্তু দেখা যায়, এটি অর্থান্তর-ন্যাসের উদাহরণ। প্রতিবস্তূপমারও নয়, অপ্রস্তুত-প্রশংসারও নয়।

যার যাহা বল
তাই তার অস্ত্র পিতঃ, যুদ্ধের সম্বল।
ব্যাঘ্রসনে নখদন্তে নহেক সমান,
তাই ব'লে ধনুঃশরে বধি তার প্রাণ
কোন্ নর লজ্জা পায় ?

প্রথমে দেখতে হবে এখানে প্রস্তুত এবং অপ্রস্তুতের মধ্যে ঔপম্যভাব প্রবল, না সামান্য-বিশেষ স্থাপনের সমর্থ্য-সমর্থক ভাব। ঔপম্য নেই, দুটি বাক্যার্থের সাধারণধর্ম-সম্বন্ধ বা বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাব নেই। 'যার যাহা বল' ইত্যাদির থেকে নরাদির কার্য পৃথক ভাবেই উপস্থাপিত। 'যার যাহা বল' ইত্যাদি সামান্য-বর্ণন বাক্যটি না থাকলে, শুধু "ব্যাঘ্রসনে" ইত্যাদি থাকলে তবেই বলা যেত অপ্রস্তুত-প্রশংসা। কারণ, দ্বিতীয় অংশে প্রস্তুত দুর্যোধন ও তার স্বীয় কৌশল ব্যঙ্গ্য। কিন্তু এখানে স্পষ্টতঃ বক্তব্য সামান্য-বাক্যটি বিশেষ ব্যাঘ্রাদি দ্বারা সমর্থিত হচ্ছে (ব্যাঘ্রাদি মূল বক্তব্য নয়), অতএব অলংকার অর্থান্তরন্যাস।

ঐ ভাবে উপমাশ্রেণীর অলংকারের সঙ্গে ভিন্ন শ্রেণীর অলংকারের পার্থক্য বুঝে অলংকার নির্ণয় করতে হবে।

প্রতিবস্তূপমার সঙ্গে দৃষ্টান্ত অলংকারের সিদ্ধান্তের গোলযোগ নিরসনকল্পে প্রচলিত কোনো গ্রন্থে বহু বাক্য ব্যয়িত হয়েছে। বস্তুত-পক্ষে ব্যাপারটি এমন কিছু সাংঘাতিক নয়। প্রতিবস্তূপমার সঙ্গে

দৃষ্টান্তের পার্থক্য হ'ল সাধারণ ধর্ম নিয়ে। **অনুমিত-সাদৃশ্য একাধিক বাক্যার্থে একই সাধারণ ধর্ম যোজিত হলে প্রতিবস্তূপমা, আর ভিন্ন সাধারণ ধর্ম যোজিত হলে দৃষ্টান্ত।** একটিতে সাদৃশ্য Real, অন্যটিতে Ideal. একেই বস্তু-প্রতিবস্তু আর বিম্ব-প্রতিবিম্ব সম্বন্ধ ব'লে কোনও টীকাকার সংক্ষেপে নাম দিয়েছেন।

উপমায় সাদৃশ্য পরিস্ফুট, কারণ, বাচক শব্দ থাকে, না থাকলে উপমান-উপমেয় অন্ততঃ এক বাক্যে থাকে। কিন্তু এ সব স্থানেই সাদৃশ্য অপেক্ষাকৃত গম্য অর্থাৎ বাইরে পরিস্ফুট নয় এমন। যেমন, অভিজ্ঞানশকুন্তলের বল্কলবাসা শকুন্তলার সৌন্দর্য বর্ণনা—

"সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী......"

---'শৈবাল-সংযুক্ত হলেও পদ্ম সুন্দরই, চন্দ্রের গাত্রে মলিন চিহ্ন তার শ্রীই বর্ধিত করে, বল্কলপরিহিতা হলেও এই তন্বী বিশেষ চিত্তহারিণী'। এখানে একই মনোজ্ঞতা-রূপ সাধারণ ধর্ম উপমান-উপমেয়-সম্বন্ধে গ্রথিত হয়ে ভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে, তাই প্রতিবস্তূপমা। যদি এখানে বলা হত—

শৈবাল-সংসক্ত পদ্মকে ভ্রমর ত্যাগ করে না, কলঙ্কিত
হ'লেও চন্দ্রের সুধা চকোর সানন্দে পান ক'রে থাকে—

ইত্যাদি, তাহলে শকুন্তলার 'মনোজ্ঞতা' ধর্মের সঙ্গে এই উপমান-বাক্যার্থগুলির সমানধর্মের বৈসাদৃশ্য হ'ত। অথচ যেহেতু উপমান-উপমেয় সম্বন্ধ এই বিসদৃশ সাধারণ ধর্মের দ্বারাও বিন্দুমাত্র বাধিত হচ্ছে না, সেইহেতু গম্যসাম্যের ঔপম্য-প্রতিপাদক দৃষ্টান্ত অলংকার হ'ত।

বলা হয়েছে, প্রতিবস্তূপমায় সাধারণ ধর্ম দুটি বাক্যার্থে ভিন্ন ভাষায় যোজিত থাকে। এর মানে এই নয় যে একই ভাষায় যোজিত হলে অলংকার হবে না। অলংকার ঠিকই হবে, তবে চমৎকারিতা

তেমন থাকবে না। তা ছাড়া একই কথা একাধিকবার বললে 'কথিতপদতা' দোষ হয়। সেইজন্য—

বিদ্বানই জানে বিদ্যার শ্রম।
বন্ধ্যা কি জানে গর্ভ-বেদন?

এখানে 'জানা' এই সাধারণ ধর্মে প্রতিবস্তূপমা হলেও একই শব্দে প্রকাশিত ব'লে তেমন চারুতার জনক হয় নি।

'নিদর্শনা' অলংকারের সঙ্গে এ দুয়ের পার্থক্য বিষয়ে আমরা পরে বলছি।

দৃষ্টান্ত

দৃষ্ট + অন্ত (নিশ্চয়) যে উপমানোপমেয় সম্বন্ধের। অর্থাৎ প্রণিধানের দ্বারা দুটি বাক্যার্থের সাম্য যেখানে উপলব্ধ হয়েছে।

লক্ষণ : উপমানোপমেয়রূপে স্থাপিত দুটি বাক্যার্থের সাধারণধর্ম এক না হলেও যদি চারুত্বময় সাদৃশ্য ফুটে ওঠে তাহলে দৃষ্টান্ত অলংকার হয়।

একে বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাবের সাদৃশ্য বলা হয়েছে। ভাব এই যে, দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব যেমন যথার্থতঃ সেই বস্তু নয়, অথচ সেই বস্তু বলেই উপলব্ধ হয় সেইরকম। উপমানবাক্য ও উপমেয়বাক্য একধর্মান্বিত না হয়েও প্রবল সাদৃশ্যের জন্ম এইভাবে দিতে পারে। এক্ষেত্রে এমনও মনে হয় যে উপমান-বাক্যটি উপমেয়-বাক্যটিকে পরিস্ফুট করছে তুল্য দৃষ্টান্তের দ্বারা।

উপমান-উপমেয়ের মধ্যে এই রকম যথাথ সাদৃশ্যবোধকতা না থাকলেও প্রতিবিম্বিত সাদৃশ্য থাকতে পারে। সমস্ত অলংকারটি এইভাবে বাক্যগঠনের ও বিসদৃশকে সাদৃশ্যের বন্ধনে বাঁধার নির্মাণকৌশলের উপর দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিবস্তূপমায় সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ (real), দৃষ্টান্তে মানসিক (ideal)।

অর্থান্তরন্যাসের সঙ্গে দৃষ্টান্তের গোলযোগ স্থলে দেখতে হবে বাক্যদুটির উপমান-উপমেয় ভাব আছে কিনা। দৃষ্টান্তে সামান্যের

সঙ্গে সামান্যের সম্বন্ধ, বিশেষের সঙ্গে বিশেষের, আর সে সম্বন্ধ সাম্যের। অর্থান্তরন্যাসে সামান্যের দ্বারা বিশেষ এবং বিশেষের দ্বারা সামান্যের সমর্থন সম্বন্ধ, সাম্যের নয়।

উদাহরণ :

(৵০) (ধর্মপথে সদা গতি তব)

এ অধর্ম কার্য, আর্য, কেন কর আজি!
কেন এ মঙ্গল ঘট ভাঙো পদাঘাতে? (পরিবর্তিত)

এখানে অধর্মাচরণ করা এবং মঙ্গলঘট পদাঘাতে ভাঙা তাৎপর্যে একই বস্তু ভিন্নধর্মাকারে প্রকাশিত। অতএব সাদৃশ্য প্রতিবিম্বিত।

(৶০) আমি যারে প্রকাশিনু আমি যারে বাড়াইনু
সেই মোরে তুচ্ছ করি কহে।
মাতঙ্গ পড়িলে দরে পতঙ্গ প্রহার করে—
এ দুঃখ পরাণে নাহি সহে॥

এখানে 'আমি যারে প্রকাশিনু' ইত্যাদির মধ্যে যে অসহায়ত্বের ভাব অপরিস্ফুট তা উপমানবাক্য 'মাতঙ্গ পড়িলে দরে' প্রভৃতির মধ্যে পরিস্ফুট। 'সেই মোরে তুচ্ছ করি কহে' এই উপমেয় 'পতঙ্গ প্রহার করে' এই উপমানে ভিন্ন ধর্মসহ দৃষ্টান্তযুক্ত হয়েছে, অর্থাৎ সে এবং পতঙ্গ ঔপম্যযুক্ত, 'তুচ্ছ করে' এবং 'প্রহার করে' ভিন্ন সমানধর্মের সাম্য যুক্ত।

(৷০) এ পাপ সংসারে
কি সাধে করি রে বাস, কলুষদ্বেষিণী
আমি? কমলিনী ফোটে কি সলিলে
পঙ্কিল? জীমূতাবৃত গগনে কে কবে
হেরে তারা?

উপমেয়ের (লক্ষ্মীর) পাপসংসারে (রক্ষঃপুরে) বাস করা কমলিনীর পঙ্কিল সলিলে ফোটার সঙ্গে এবং মেঘাবৃত আকাশে তারকার দর্শনগম্য হওয়ার সঙ্গে উপমিত হয়েছে। উপমেয় এবং উপমানের

সাদৃশ্য উত্তম হলেও সাধারণ ধর্মের একরূপতা নেই (বাস করা, ফোটা ও অন্যের দ্বারা দৃষ্ট হওয়া)। সাম্য মনে বুঝে নিতে হয়। অতএব, **দৃষ্টান্ত** অলংকার। উপমানবাক্য দুটি, সুতরাং **মালাদৃষ্টান্ত**।

(।০) তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী। হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য ? প্রফুল্ল কমলে
কীটবাস ?

—এখানেও সাধারণ ধর্ম ভিন্ন হয়েও সাদৃশ্য অটুট। উপমানবাক্য দুটি, অতএব, মালাদৃষ্টান্ত।

(।/০) একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুইজনে ;
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেকজন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ, তবে সে কলতান উঠে,
বাতাসে বনশোভা শিহরি কাঁপে, তবে সে মর্মর ফুটে।

—এখানে গায়ক ও শ্রোতা (একজন, আরেকজন) উপমেয়, তট ও ঢেউ, বাতাস ও বন প্রভৃতির মধ্যে উপমানে পরিস্ফুট হয়েছে। আবার, গান হওয়া, কলতান ওঠা এবং মর্মর ফোটা প্রভৃতিতে সাধারণধর্ম বিসদৃশ হয়েও ঔপম্যের বোধ জন্মাচ্ছে, অর্থাৎ বিম্বপ্রতিবিম্ব-ভাবান্বিত হয়েছে। অতএব দৃষ্টান্ত—মালাদৃষ্টান্ত।

(।৵০) অতসী অশোকে গাঁথিতে কি হায় গেঁথেছি অপরাজিতা ?
প্রাণের স্ফটিক পাত্রে ঢেলেছি মিঠার সঙ্গে তিতা ?

(এখানে দৃষ্টান্ত ও অপ্রস্তুতপ্রশংসার সংকর)

(।৶০) বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।
ধূপ দগ্ধ হয়ে গেছে, গন্ধ বাষ্প তার
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারিধার।

'যেমন ধূপ দগ্ধ হয়ে গেলে তার সূক্ষ্ম অংশ গন্ধ চারদিকে ব্যাপ্ত হয়ে

পড়ে, তেমনি দেহ বিলীন হবার পর তুমি সূক্ষ্ম সৌন্দর্যরূপে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছ' এই ঔপম্য বিভিন্ন অংশে প্রতি অবয়বের প্রণিধানগম্য সাম্যের দ্বারা উপাত্ত হয়েছে।

(৷৹) কার সাধ্য রোধে
তোমায়, নরেন্দ্র তুমি ? কে পারে ফিরাতে
প্রবাহে ? বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে ?

(এখানে রোধে, ফিরাতে, বাঁধে এই ভিন্ন সমানধর্মে ঔপম্য)

আরো কয়েকটি দৃষ্টান্তের উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে —

(৷/৹) কিন্তু বৃথা সে ক্রন্দন ! হুতাশন তেজে
গলে লৌহ, বারিধারা দমে কি তাহারে ?
অশ্রুবিন্দু মানে কি লো কঠিন যে হিয়া !

(৷৵৹) সভয় হইল আজি ভয়শূন্য হিয়া।
প্রচণ্ড উত্তাপে পিণ্ড, হায়রে, গলিল !
গ্রাসিল মিহিরে রাহু, সহসা আঁধারি
তেজঃপুঞ্জ ! অম্বুনাথে নিদাঘ শুষিল !
পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে !

(মালাদৃষ্টান্ত)

(৷৶৹) জনম মম মহাঋষিকুলে,
তবু চণ্ডালিনী আমি ? ফলিল কি তবে
পরিমলাকর ফুলে, হায়, হলাহল ?
কোকিলের নীড়ে কি রে রাখিলি গোপনে
কাক-শিশু ? কর্মনাশা—পাপপ্রবাহিণী !
কেমনে পড়িল বহি জাহ্নবীর জলে ?

(মালাদৃষ্টান্ত)

নিদর্শনা

নিদর্শন (দৃষ্টান্তকরণ) এতে আছে এই অর্থে।

লক্ষণ : দু'টি পদার্থ বা বাক্যার্থের মধ্যে (ঔপম্য) **সম্পর্ক না**

থাকলেও যদি একত্র গ্রথিত হয়ে উপমা-প্রতিপত্তিকর হয় তাহলে নিদর্শনা অলংকার হয়।

'না থাকলেও' এ কথা বলার অর্থ এই যে থাকলে তো হবেই। বাক্যার্থ দু'টির মধ্যে অন্বয় আছে অথবা নেই, তা নির্ভর করে কবির বর্ণনার উপর।

দৃষ্টান্তের মত এখানেও প্রায় সর্বত্র সাধারণধর্মের অসাদৃশ্য, পার্থক্য এই যে, নিদর্শনায় প্রায়ই সাধারণ ধর্মের উল্লেখ থাকে না এবং বাক্যার্থ দুটি পরস্পর-সাপেক্ষ হয়। নিদর্শনায় প্রায়শই দুটি বাকার্থ এক বাক্যে সন্নিবেশিত থাকে। না থাকলে অন্ততঃ তাদের এক কর্তায় অন্বিত ও এক সমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা সম্পর্কে গ্রথিত করা যায়। তা ছাড়া নিদর্শনায় সাম্যপ্রতীতি বাক্যার্থের সমাপ্তিতে নিয়ে যায়, আর দৃষ্টান্তে বাক্যার্থবোধ সাম্যপ্রতীতিতে নিয়ে যায়।

উদাহরণ : (সংস্কৃত থেকে)—

(/০) কোথায় পূজিত সূর্যবংশ, কোথায় বা আমি বিমূঢ়মতি।
ভেলায় সাগর পার হওয়া এ যে, বাসনার কী বিচিত্র গতি!

(অনুবাদ)

এখানে সূর্যবংশ বর্ণনা এবং ভেলায় সাগর পার হওয়া এ দুয়ের কোনও সাদৃশ্য নির্দিষ্ট না হলেও একত্র গ্রথিত হয়ে সাদৃশ্যবোধের জনক হয়েছে। বাক্য দৃশ্যতঃ দুটি হলেও ভাবে একটি।

(৵০) তব পাদ-নখ রঞ্জনে যেবা রাঙায় শিল্পীবর।
নিশ্চিত শ্বেতচন্দনলেপে উজলে সে হিমকর॥ (অনুবাদ)

এখানে অলক্তকে পাদনখ রঞ্জিত করা এবং চন্দনানুলেপনে চন্দ্রকে উজ্জ্বল করার মধ্যে সম্বন্ধ না থাকলেও কবির বর্ণনায় একত্রিত হওয়ায় ঔপম্য সম্বন্ধ কল্পিত হয়েছে।

(৶০) শোভার আধার এই বালিকারে
কঠিন তপে যে নিয়োগে ঋষি।
নিশ্চয় নীলপদ্মপত্রে শমীশাখা কাটে সে বনবাসী॥ (অনুবাদ)

উপরে নির্দিষ্ট দুটি বাক্যার্থের সাম্যজনক অন্বয় নেই. তবু কবির বর্ণনাক্রমে একত্র গ্রথিত হতেই বিম্বপ্রতিবিম্বগত সাম্যে পর্যবসিত হয়েছে, তাই নিদর্শনা।

বাঙ্‌লা উদাহরণ :

(৶০) রূপনাশ কৈলে প্রিয়ে রন্ধনের শালে।
চিন্তামণি নাশ কৈলে কাচের বদলে ॥

এটিকে কেউ প্রতিবস্তূপমার উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করলে আমার আপত্তি নেই। আর সহজে তাই মনে হবে। কিন্তু কবি-অভিপ্রায় অনুধাবন ক'রে আমি একে নিদর্শনায় নিতে চাই।

'রূপনাশ ক'রে চিন্তামণি নাশ করেছ' কবি-অভিপ্রেত এই গঠন। এখানে বস্তুসম্বন্ধ সম্ভব হয়েছে, কারণ, 'নাশ করা' এই সমানধর্মের উল্লেখ রয়েছে। কর্তা উভয় বাক্যার্থে এক। দুটি বাক্যার্থ—একত্রগ্রথিত, পরস্পর সাপেক্ষ।

(৵০) প্রসাদ বলে, মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে,
সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি, বুঝে নে মন ঠারে ঠোরে।

এখানে বস্তুসম্বন্ধ সম্ভব হয়েছে, কারণ, মাতৃভাবে যাঁর তত্ত্ব করা যায় তাকে বুঝিয়ে বলা, চাতরে হাঁড়িভাঙা একই কথা, এ সম্ভব হতে (ঘটতে) পারে।*

(৶৹০) যে বিধি করিল চাঁদে রাহুর আহার।
সেই বুঝি ঘটাইল সন্ন্যাসী তোমার ॥

বিদ্যার প্রতি সুন্দরের রহস্যময় কটাক্ষ। বররূপে সন্ন্যাসী জোটানো এবং রাহুর আহার করানোতে অন্বয় স্থাপিত না থাকলেও ঔপম্য স্থাপিত হয়েছে।

* দুঃখের কথা, সাহিত্যদর্পণকারের 'সম্ভবন্ বস্তুসম্বন্ধঃ অসম্ভবন্ বাপি কুত্রচিৎ' ইত্যাদির 'অসম্ভবন্' শব্দটীকে কোনও কোনও বাঙ্‌লা অলংকার-গ্রন্থে 'impossible' এই অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে! আসলে অর্থ হবে 'সম্ভব না হলেও'।

(।০) আসিতে এখানে কে বারণ করিলে।
অবলা বধের ভয় সে নাহি ভাবিলে॥

'আসিতে বারণ করা' এবং 'অবলা বধ করা' অসংবদ্ধ হলেও কবির বর্ণনায় বস্তুসম্বন্ধে যুক্ত হয়েছে।

(।/০) ছেঁড়াচুলে বকুলফুলে খোঁপা বেঁধেছ—
প্রেম কি ঝালিয়ে তুলেছ!

ঐরকমভাবে খোঁপা বাঁধা আর প্রেম ঝালিয়ে তোলা বস্তুগত অসম্বন্ধে পৃথক্, এখানে সম্বন্ধযুক্ত।

(।৵০) অভাজনে অন্ন দিয়ে বিদ্যা দিয়ে আর
অদৃষ্টেরে ব্যর্থ তুমি করলে বারংবার।

অদৃষ্টকে ব্যর্থ করার সঙ্গে অভাজনকে অন্ন, বিদ্যা প্রভৃতি দান করার সম্বন্ধ কবি-কর্তৃক কল্পিত ও যোজিত। সাধারণভাবে সম্ভব নয়।

(।৶০) কেটে ফেল চোরে, ছেড়ে দেহ মোরে
ধর্মের বাঁধহ সেতু।

(॥০) মজিনু বিফল তপে, অবরেণ্যে বরি,
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন।

অবরেণ্যকে বরণ করার বিফলতা এবং শৈবালে কেলি করার দুঃখ বস্তুতঃ অনন্বিত, কবি-বর্ণনায় অন্বিত হয়ে বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবের উপমার প্রতিপত্তিকর হয়েছে। বাক্য দুটিকে একত্র গ্রথিত করে দেখলেই কবি-নির্মিতির বিচার ঠিক হয়। তবে দুই বাক্য ধ'রে নিয়ে **দৃষ্টান্ত** বললে আমাদের আপত্তি নেই।

(॥/০) কিম্বা কণ্টকিত, হায়! যে-বিধি করিল
গোলাপ কমল,
সে-বিধি পাষাণমনে দহিতে সুকবিগণে
কবিত্ব-অমৃতে দিলা দারিদ্র্য-অনল।

গোলাপকে কণ্টকিত করা (উপমান) এবং কবিত্ব-অমৃতে দারিদ্র্যাগ্নি নিক্ষেপ করার মধ্যে কোনো সম্বন্ধই নেই, অথচ কবি সম্বন্ধ

এনেছেন, 'যে' এবং 'সে' কর্তাদ্বয়কে নিয়ে নিত্যসম্বন্ধে আবদ্ধ বাক্যও গঠন করেছেন। অতএব নিদর্শনা, শেষ চরণে রূপকও।

(॥৵০) তোমার আসন হ'তে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে
সেথায় শক্তিরে তব নির্বাসন দিলে অবহেলে।

আসন থেকে নিম্নবর্ণের লোককে ঠেলে দেওয়া আর শক্তিকে নির্বাসন দেওয়া একই ব্যাপাররূপে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। বস্তুসম্বন্ধ না থাকলেও বর্ণনায় তুল্যার্থদ্যোতক হয়েছে।

স্মরণ বা স্মরণোপমা

লক্ষণ : সাদৃশ্যহেতু উপমান থেকে উপমেয় স্মরণে এলে তার বর্ণনায় স্মরণালংকার হয়।

উদাহরণ :—

(৴০) হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে,
সজল কাজল-আঁখি পড়িল মনে।

জলভরা কাজল-আঁখি শ্যামল মেঘের সদৃশ বলেই তার স্মরণে বৈচিত্র্য। স্মরণালংকারের ব্যঞ্জনা হ'ল উপমা।

(৵০) হলুদ বাঁটিতে গোরী বসিল যতনে।
হলুদবরণ গোরাচাঁদ পড়ে গেল মনে॥

(৶০) কালো জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।

(।০) তোরে হেরি মনে পড়ে বঙ্গকামিনীরে। ('দোপাটি')

সাধারণভাবে কার্যকারণ-সম্বন্ধে কোনো বস্তুর স্মরণ হলে স্মরণালংকার হবে না। এই হেতু "সারসন স্মরি, হায় রে সে সরু কটি!" অথবা, 'মনে পড়ে ঘরটি আলো, মায়ের হাসিমুখ" ইত্যাদি, অথবা "ছোট ঘরখানি মনে কি পড়ে, মনে কি পড়ে, সুরঙ্গমা, মনে কি পড়ে" প্রভৃতি স্থলে স্মরণালংকার নেই। বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন—বৈসাদৃশ্য হলেও 'স্মরণ' হবে, যেমন দুঃখের ঘটনা থেকে সুখস্মৃতি। যেমন "সুদূর গোঠের শ্যামবার্তা কি স্মরিছে রে বার্তাকু" প্রভৃতি। কিন্তু আমাদের

মতে উপমাব্যঞ্জকতায় ক্ষেত্রে স্মরণালংকারকে আবদ্ধ রাখাই সমীচীন।

রূপক

লক্ষণ : প্রবল সাদৃশ্য দ্যোতনার জন্য উপমেয়ের উপর উপমানের অভেদ আরোপ করলে রূপকালংকার হয়।

উপমায় শুধু সাদৃশ্যের চমৎকারিত্ব। সেখানে উপমান-উপমেয়ের বৈসাদৃশ্যের দিকটি মাত্র গোপন করে রাখা হয়। রূপকে বোঝানো হয় যে বৈসাদৃশ্য একেবারে নেই, সাদৃশ্য এত প্রবল যে উভয়কে অভেদ ভাবে দেখাই ঠিক। কিন্তু এটুকুও মনে রাখতে হবে যে 'রূপকে' উপমেয় বা বিষয়কে নিষেধ করা হয় না। উপমেয় সেখানে আছে, উপমানের সঙ্গে অভেদভাবে আছে। 'অতিশয়োক্তি' অলংকারে উপমেয়ের সমান প্রাধান্য বা উল্লেখ হয় না বললেই চলে। আর — অপহ্নুতিতে উপমেয়কে নিষিদ্ধ করা হয়।

কবিদের বর্ণনার ও কল্পনার প্রভেদ-বলে রূপকের কয়েকটি বিভাগ হয়ে পড়েছে (১) নিরঙ্গ (২) সাঙ্গ (৩) পরম্পরিত।

(১) নিরঙ্গরূপক

শুধু মূল উপমেয়ে উপমানের অভেদ আরোপ। বহু উপমানের আরোপ হলে **মালারূপক** হবে।

(৵০) এমন মানব-জমিন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলতো সোনা।

এখানে মানবের উপর জমিনের অভেদ আরোপ। আবাদ প্রভৃতি বাক্যে আরও পরিস্ফুট।

(৵০) প্রিয়বাণী সই যৌবন-রূপ।
পতিমনমৃগ-পতন-কূপ॥

দুই চরণে দুটি অভেদ। আবার প্রথম চরণের যৌবন-রূপের সঙ্গে দ্বিতীয় চরণের পতন-কূপের মূল অভেদ।

(৶০) হৃদি-পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে!

(।০) দেখিবারে আঁখি-পাখি ধায়।

(।৴০) বিষয়ে আসক্ত হয়ে বিষের কূপে উলবো না গো।
সুখদুঃখ ভেবে সমান মনের আগুন তুলবো না গো॥
আশাবায়ু-গ্রস্ত হয়ে মনের কপাট খুলবো না গো।
মায়া-পাশে বদ্ধ হয়ে প্রেমের গাছে ঝুলবো না গো॥

(।৵০) প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল ন ভেল যুগল পলাশা।

(।৶০) কুল-মরিযাদ-কপাট উদ্‌ঘাটলুঁ তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিযাদ-সিন্ধু সঞে পঙারলুঁ তাহে কি তটিনী অগাধা॥

কুলমর্যাদার সঙ্গে কপাটের ও নিজমর্যাদার সঙ্গে সমুদ্রের অভেদ আরোপ। সঞে = একই সঙ্গে।

(॥০) কুহুকুহু-কুহরিত অলিপুঞ্জ-মুখরিত
বধূর যৌবন-কুঞ্জ মরি কি শ্যামল!

যৌবনের উপর কুঞ্জের অভেদ আরোপ, কয়েকটি বিশেষণের দ্বারা আরও সার্থকভাবে সুপরিস্ফুট।

(॥৴০) পিরিতি আগুন জ্বালি সকলি পোড়াঞাছি
জাতি কুল শীল অভিমান।

(॥৵০) সংহত করো, সংহত করো, অয়ি,
যৌবন-বাণ তীক্ষ্ণ ভয়ংকর।

(॥৶০) চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি—
কোথায় ঘোড়সওয়ার?

(৸০) করুণা-কিরণে বিকচ নয়ান।

(৸৴০) রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥

নিরঙ্গ মালারূপক ঃ

(৴০) শীতের ওড়না পিয়া গিরিষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥

বিভিন্ন উপমানের সঙ্গে উপমেয় 'প্রিয়' অভেদারোপ সম্বন্ধে গ্রথিত হয়েছে।

(৵৹) মরুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি,
রক্ষোবধূ ; সুশীতল ছায়ারূপ ধরি,
তপন-তাপিতা আমি, জুড়ালে আমারে।
মূর্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দয় দেশে,
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম ; ভুজঙ্গিনীরূপী
এ কাল-কনকলঙ্কা-শিরে শিরোমণি !

এখানে একটি উপমেয় (সরমায়) বহু উপমানের অভেদ আরোপ করা হয়েছে।

(৶৹) — তুমি অন্তরব্যাপিনী।
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়বৃন্ত শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে,
চারিদিকে চির যামিনী !

(।৹) কোন্ পাদপদ্মে ছিলি অলক্তের রাগ
নন্দনের শুভচিহ্ন সুরক্ত স্মরণ !
কোন্ কিঙ্করীর ওষ্ঠে তাম্বূলের রাগ
কোন্ অপ্সরার বুকে রক্তিম বরণ ?

এখানে রক্ত-গোলাপের উপর অলক্তের রাগ প্রভৃতির অভেদ আরোপ।

(।১৹) মদন-নৃপতির শ্বেতচ্ছত্র কিবা
পূর্ব দিগ্‌বধূর চন্দনের কৌটা।
আকাশ-কাসরে রাজিত সরসিজ
কর্পূররসসার ঐ চন্দ্রবিম্ব ! (সংস্কৃত থেকে)

এখানে চন্দ্রবিম্ব উপমেয়, শ্বেতচ্ছত্রাদি উপমান।

(।৶৹) এ যে সরস্বতীর শয্যা, ইন্দ্রের রণভূমি, মদনের সুখকুঞ্জ, লক্ষ্মীর সিংহাসন !

(২) সাঙ্গরূপক

বিভিন্ন অঙ্গসহ অঙ্গী উপমেয়ে তদুচিত অঙ্গ সহ অঙ্গী উপমানের অভেদ আরোপ করলে সাঙ্গরূপক হয়।

উদাহরণ :

(৵০) জ্যোৎস্নার বিভূতি অঙ্গে, অস্থিরূপা কণ্ঠে তারাবলী,
দ্বীপ হ'তে দ্বীপান্তরে ক্ষিপ্রপদে স্বচ্ছন্দ-গমনা,
চন্দ্রের কপাল-পাত্রে মসীচ্ছলে মায়াঞ্জন লয়ে
অন্তর্ধান-বিলাসিনী ঐ আসে রাত্রি-কপালিনী !
—("জ্যোৎস্নাভস্ম" ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ)

রাত্রির উপর কাপালিকী নারীর মূল অভেদ আরোপটি সম্পূর্ণ ও অতিশয় চারুতাবহ হয়েছে অঙ্গ জ্যোৎস্নার উপর ভস্মের, তারার উপর অস্থিমালা প্রভৃতির অভেদারোপে।

(৶০) শরদিন্দু পুত্র ; বধূ শারদ-কৌমুদী ;
তারাকিরীটিনী নিশি (সদৃশী) আপনি
রাক্ষস-কুল-ঈশ্বরী ! অশ্রুবারিধারা
শিশির ; কপোল-পর্ণে পড়িয়া শোভিল !

পুত্র (মেঘনাদ), পুত্রবধূ (প্রমীলা) এবং মাতার (মন্দোদরী) মিলনের দৃশ্যটি শরৎ-রাত্রির সৌন্দর্যের সঙ্গে অভেদারোপে বর্ণিত হয়েছে। 'মন্দোদরী'কে তারা-কিরীটিনী-নিশি-সদৃশী বলাতে রূপক বাধিত হয়ে একাংশে উপমা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু অন্য অবয়বগুলির পরিস্ফুট অভেদারোপে এই অংশটিকেও রূপক বলেই গ্রহণ করতে আগ্রহ জন্মে। মনে হয়, কবি সাঙ্গরূপকই করতে চেয়েছিলেন, উপমা নয়। ঐ অংশে রূপক বাধিত হলেও বর্ণনার চমৎকারিত্বের জন্য এবং কবির অভিপ্রায় অনুধাবন ক'রে আমরা 'সদৃশী' শব্দটিকে উপেক্ষা করেছি এবং সাঙ্গরূপকের শ্রেণীতেই অলংকারটিকে ফেলেছি।

(৶৹) পড়িয়া ভব-সাগরে ডুবে মা তনুর তরী।
মায়া-ঝড় মোহ-তুফান ক্রমে বাড়ে, মা শঙ্করি ॥
একে মন-মাঝি আনাড়ি তাতে ছ-জন গোঁয়ার দাঁড়ি
কু-বাতাসে দিয়ে পাড়ি হাবুডুবু খেয়ে মরি।

ভেঙে গেল ভক্তির হাল, ছিঁড়ে গেল শ্রদ্ধার পাল,
তরী হ'ল বানচাল, বল কি করি।

একদিকে উপমেয় ভব, তনু, মায়া, মোহ, মন আর অন্যদিকে উপমান সাগর, তরী, ঝড়, তুফান, মাঝি প্রভৃতি অভেদে আরোপিত। (এ ছাড়া ভবকে সাগরের সঙ্গে অভেদে আরোপ করার জন্য তনুকে তরীর সঙ্গে অভেদে আরোপ করার প্রয়োজন হয়েছে ব'লে পরম্পরিত-রূপক ঐ মূল সাঙ্গরূপকের অভ্যন্তরে রয়েছে)। এখানে উপমেয়ের অঙ্গ হ'ল ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রভৃতি। অভেদে আরোপিত উপমান হ'ল হাল, পাল প্রভৃতি। সমস্ত মিলে সংসারযাত্রার উপর সমুদ্রযাত্রার অভেদারোপে সাঙ্গরূপক।

(।০) হৃদি-বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি।
ওহে ভক্ত-প্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধাসতী।
মুক্তি-কামনা আমারি হবে বৃন্দে গোপনারী,
দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী॥ ইত্যাদি

এখানে হৃদয়ের সঙ্গে বৃন্দাবনের অভেদারোপ, হৃদয়ের অন্যান্য অঙ্গের সঙ্গে বৃন্দাবনের বিভিন্ন অঙ্গের অভেদারোপের দ্বারা উপচিত হয়ে সুন্দর সাঙ্গরূপকের গঠনে সাহায্য করেছে।

(।/০) এই জন্ম-মালিকার মৃত্যু সূচী, ডোর ভালবাসা—
প্রকৃতি যোগায় ফুল, নারী গাঁথে করিয়া চয়ন—
পুরুষ পরিয়া গলে চেয়ে থাকে মুখে তার অতৃপ্ত নয়ন!

সংসার-জীবনের সঙ্গে মালা-গাঁথা ব্যাপারটিকে অভেদে দেখা হয়েছে। অঙ্গ জন্ম, মৃত্যু, ভালবাসা, নিসর্গ, নারী, পুরুষ যথাক্রমে মালিকা, সূচী, ডোর, ফুল-যোগানী, মালাকারী এবং মালাপরিধানকারীর সঙ্গে আরোপিত অভেদ সম্বন্ধে অবস্থিত।

(।৶০) যৌবনেরে যৌবরাজ্য
দেওয়া তোমার নিত্যকার্য,
পাণ্ডা তোমার শ্যামল পত্র, নিশান তৃণ-মঞ্জরী।

'নীলপরী'র উপর প্রতীয়মান 'রাজ্ঞী'র অভেদ আরোপ করা হয়েছে। যৌবনের উপর যুবরাজের (এটি পরিস্ফুট শব্দোপাত্ত হয়নি, বলা যেতে পারে 'একদেশবিবর্তী' হয়েছে), শ্যামল পত্রের উপর পান্নার এবং তৃণ-মঞ্জরীর উপর নিশানের অভেদারোপ হ'ল উপমেয়-অঙ্গের উপর উপমান-অঙ্গের অভেদারোপ।

অলংকারশাস্ত্রে সাঙ্গরূপকের ক্ষেত্রে (এবং অন্যত্রও) 'সমস্তবস্তু-বিষয়' এবং 'একদেশবিবর্তী' এই দুই ভেদ কথিত হয়েছে। অঙ্গের অভেদগুলি সব যদি শব্দোপাত্ত অর্থাৎ পরিস্ফুট হয় তাহ'লে রূপকটি 'সমস্তবস্তুবিষয়' আর অভেদবাচী শব্দসম্বন্ধে প্রকাশিত হয়নি এমন কোথাও থাকলে 'একদেশবিবর্তী' এই আখ্যা লাভ করে। বাঙ্‌লার ক্ষেত্রে দেখানো যায় যে উপরে উদ্ধৃত অংশ দুটিতে 'একদেশবিবর্তী' সাঙ্গরূপক হয়েছে (।/০-অংশে 'প্রকৃতি যোগায় ফুল' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। নিম্নে আর একটি 'একদেশবিবর্তী' সাঙ্গরূপকের সুন্দর উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে—

(।৶০) বাহ্য-সম্পদের পূজা কর। এ পূজার তাম্রশ্মশ্রুধারী ইংরেজ ঋষিগণ পুরোহিত, এডাম্ স্মিথ্ পুরাণ এবং মিলতন্ত্র হইতে এ পূজার মন্ত্র পড়িতে হয়; এ উৎসবে ইংরেজি সংবাদপত্রসকল ঢাক-ঢোল, বাঙ্গালা সংবাদপত্র কাঁসিদার; শিক্ষা এবং উৎসাহ ইহাতে নৈবেদ্য, এবং হৃদয় ইহাতে ছাগবলি। এ পূজার ফল ইহলোকে এবং পরলোকে অনন্ত নরক।

(॥০) কৈছে চরণে কর-পল্লব ঠেললি
মীললি মান-ভুজঙ্গে।
কবলে কবলে জিউ জরি যব যাওব
তবহুঁ দেখবি ইহ রঙ্গে॥
(মা গো!) কী ইহ জিদ্দ অপার
কো অছু ধীর বীর মহাবল
পাওরি উতারব পার॥

উপমেয় মান করার উপর সর্পদষ্ট হওয়ার অভেদ আরোপ করা

হয়েছে। পাতা সরাতে সর্পদংশন ঘটতে পারে। এখানে কৃষ্ণের কর-রূপ পল্লব ঠেলে মানরূপ-সর্পদংশনের সম্মুখীন হতে হয়েছে। মান এবং সর্পদংশনের কার্যেও উভয়ের অভেদ—"কবলে কবলে জিউ জরি যব যাওব।" পরবর্তী ব্যাপার মন্ত্রৌষধির গুণে মন্ত্রবিৎ (মহাবল) কর্তৃক পায়ে বিষ নামানো ('পাঙরি উতারব পার')। এটি সর্পদংশনের আনুষঙ্গিক কাজ, ব্যঞ্জনায় মানের বিষ দূর করার কথা রয়েছে (পার=পারদ)। সুতরাং সব মিলে একদেশবিবর্তী সাঙ্গরূপক।

(॥/০) শোকের ঝড় বহিল সভাতে ;
সুরসুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল ; মুক্ত কেশ মেঘমালা ; ঘন-
নিশ্বাস প্রলয়বায়ু ; অশ্রুবারিধারা
আসার ; জীমুতমন্দ্র হাহাকার রব।

এটি 'সমস্তবস্তুবিষয়' রূপকের চমৎকার উদাহরণ।

(॥৵০) সৌন্দর্য-পাথারে—
যে-বেদনাবায়ুভরে ছুটে মনোতরী
সে বাতাসে কতবার মনে শঙ্কা করি,
ছিন্ন হয়ে গেল বুঝি হৃদয়ের পাল,
অভয়-আশ্বাসভরা নয়ন বিশাল
হেরিয়া ভরসা পাই, বিশ্বাস বিপুল
জাগে মনে—আছে এক মহা উপকূল
এই সৌন্দর্যের তটে, বাসনার তীরে
মোদের দোঁহার গৃহ ॥

কবিচিত্তের সৌন্দর্যাভিসার বর্ণিত হয়েছে। যাত্রী কবি গম্য। সৌন্দর্যের সঙ্গে বেদনা বিজড়িত। সমুদ্রযাত্রায় নিমজ্জনের ভয়। তীরের আশ্বাসে আনন্দ। এ সমস্ত চিত্রই এতে প্রতিফলিত হয়েছে। রূপকটি একদেশবিবর্তী।

(॥৶০) নন্দের নন্দন চাঁদ পাতিয়ে রূপের ফাঁদ
ব্যাধ ছিল কদম্বের তলে ॥

দিয়া হাস্য-সুধা-চার   অঙ্গছটা আঠা তার
আঁখি-পাখী তাহাতে পড়িল।
মন-মৃগী সেই কালে   পড়িল রূপের জালে
বাঁশী-ফাঁসি গলায় লাগিল॥

কৃষ্ণ ব্যাধ-রূপে বর্ণিত হওয়াতে ব্যাধের শিকার প্রণালী অঙ্গরূপে বর্ণিত হয়েছে। পাখি-শিকার এবং মৃগ-শিকার দুটিই বিবৃত হয়েছে। রূপকটি সমস্তবস্তুবিষয়, অর্থাৎ সর্বত্রই ভাষায় উপাত্ত, গম্য নয়।

অনুরূপ-ভাবে—

(৮০)   শ্যাম শুকপাখী   সুন্দর নিরখি
ধরিল নয়ন ফাঁদে।
হৃদয় পিঞ্জরে   রাখিল তাহারে
মনহি শিকলে বেঁধে॥

এখানে অঙ্গী রাধিকার সঙ্গে ব্যাধের অভেদারোপ-সম্বন্ধ গম্য।

(৮/০)   কালের রাখাল তুমি, সন্ধ্যায় তোমার শিঙা বাজে,
দিনধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠগৃহ মাঝে
উৎকণ্ঠিত বেগে।
নির্জন-প্রান্তর-তলে আলেয়ার আলো জ্বলে,
বিদ্যুৎবহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে॥

নটরাজ উপমেয়, রাখাল উপমান। সৃষ্টির আনন্দরূপের সংহার এবং অনুরূপ দিগন্ত প্রভৃতির চিত্র অঙ্গহিসাবে অভেদে বর্ণিত হয়েছে।

(৩) পরম্পরিত রূপক

একটি উপমেয়ে উপমানের অভেদ আরোপ কারণ হয়ে অন্য আর একটি বা একাধিক উপমেয়ে এক বা একাধিক উপমানের অভেদ আরোপের জন্ম দিলে পরম্পরিত রূপক হয়।

এই রূপক সাঙ্গ থেকে পৃথক্, কারণ উপমেয় বা উপমানের অঙ্গী-অঙ্গ সম্বন্ধ এখানে প্রবল নয়, কারণ-কার্য সম্বন্ধ প্রবল। একাধিক

পরম্পরিত থাকলে মালা-পরম্পরিত বলতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে উপমান-উপমেয়ে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ দেখা গেলেও বিচারে যদি কার্যকারণ ভাব প্রবল হয়, তাহলে তাকে পরম্পরিত রূপকই বলতে হবে।

(৵০) হৃদয়-কাননে কতশত আশা-লতা
শুখায়ে মরিল।

এখানে 'আশা' উপমেয়ের উপর 'লতা' উপমানের অভেদ আরোপের জন্যই 'হৃদয়' উপমেয়ে 'কানন' উপমানের অভেদ আরোপ করতে হয়েছে।

(৶০) জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি
কতদিন রবে?

জীবনের উপর উদ্যানের অভেদারোপ যৌবনের উপর কুসুমের অভেদারোপের কারণ হয়েছে।

(৶৹) ভেবে দেখ মনে,শূর, কালসর্প তেজে
তবাগ্রজ, বিষদন্ত তার মহাবলী
ইন্দ্রজিৎ।

'অগ্রজ' (রাবণ)-এর উপর কালসর্পের আরোপ 'ইন্দ্রজিতে' বিষদন্ত আরোপের কারণ।

(।০) প্রবাসে দৈবের বশে জীবতারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে —ইত্যাদি

(।৵০) জাগাও তোমার রূপের শিখা মরে মরুক পতঙ্গ।

—এখানে পরবর্তী রূপকে কামুক উপমেয়টি প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

(।৶০) বিষাদ-মেঘের কোলে সুখের চপলা দোলে

(।৶৹) জন্ম-নদীর জলবুদ্‌বুদ্ মৃত্যুর মোহানায়।

(॥০) তুমি রবি, তব তাপে শুকাইয়া যায়
করুণা নীহার-বিন্দু।

(৷৴০) যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেম-তরু রোপলি
শ্যামজলদরস আশে।
সো অব নয়ন নীর দেই সীচহ
কহতহি গোবিন্দদাসে॥

(৷৵০) প্রতাপ-তপনে কীর্তি-পদ্ম বিকাশিয়া
রাখিলেন রাজলক্ষ্মী অচলা করিয়া।

রাজ্যের উপর 'লক্ষ্মীর' অভেদারোপের জন্য কীর্তির উপর পদ্মের এবং প্রতাপের উপর তপনের অভেদারোপ করতে হয়েছে।

(৷৶০) বাঙ্‌লার রবি জয়দেবকবি কান্তকোমল পদে
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন-কোকনদে।

জয়দেবের উপর 'রবি' উপমানের আরোপ সংস্কৃতের উপর কাঞ্চন-কোকনদের আরোপের কারণ।

(৸০) কাঁহা তোমার কৃষ্ণরস কাব্যসুধা-সিন্ধু।
তার মধ্যে মিথ্যা কেনে স্তুতিক্ষারবিন্দু॥
রায় কহে রূপের বাক্য অমৃতের পূর।
তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পূর॥

এখানে 'কৃষ্ণপ্রেম' সুধাসিন্ধুর সঙ্গে অভেদে আরোপিত। এইহেতু গৌরাঙ্গস্তুতি ক্ষারবিন্দুর সঙ্গে অভেদে আরোপিত হয়েছে। গৌরাঙ্গের উক্তি। অনুরূপভাবে 'রায়ের' উক্তিতেও পরম্পরিত রূপক ঘটেছে।

(৸৴০) কিন্তু দেব নরে
পরাভবি কীর্তিবৃক্ষ রোপিনু জগতে
বৃথা! নিদারুণ বিধি, এতদিনে এবে
বামতম মম প্রতি; তেঁই শুখাইল
জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে!

এখানে কীর্তিকে বৃক্ষের সঙ্গে অভেদে আরোপ করাতে মেঘনাদের সঙ্গে জলপূর্ণ আলবালের অভেদারোপ ঘটাতে হয়েছে।

শ্লিষ্ট পরম্পরিত—

(৴০) **মুনিগণ-মানস-হংস।**

(৵০) **ছলনা-কুআশায় আবৃত, আশার পরিসর-শূন্য সংসার-সাগরের ভয়ানক শব্দ শোনা যেতে লাগল।**

(৪) অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্য রূপক

লক্ষণ : উপমেয়ে উপমানের অভেদারোপস্থলে উপমানকে যদি কোনও বিশেষ গুণে ভূষিত করা হয় তাহলে অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্য রূপক হয়।

উপমানকে বিশেষ গুণে ভূষিত করতে গিয়ে কখনো কখনো উপমেয় থেকে উপমান অর্থতঃ অল্পগুণ বা অধিকগুণ হয়ে পড়তে পারে। এরকম স্থলে দেখতে হবে কবির বর্ণনায় অভেদারোপের ভাবটি প্রবল, অথবা উপমেয়ের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করাই তাঁর অভিপ্রায়। প্রথম ক্ষেত্রে রূপক, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যতিরেক, যেমন ধরা যাক নিম্নলিখিত অংশটি :

গৌরাঙ্গ চাঁদের ছাঁদে ও চাঁদ কলঙ্কী রে
এমন করিতে নারে আলো।
অকলঙ্ক পূর্ণ চাঁদ উদয় নদীয়াপুরে
মনের আঁধার দূরে গেল॥

এক্ষেত্রে 'অকলঙ্ক পূর্ণ চাঁদ' এই অংশে অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্য রূপক হয়েছে। কিন্তু সব মিলিয়ে কবি-অভিপ্রায়ের অনুধাবনে অলংকার ব্যতিরেক। চন্দ্রের থেকে গৌরচন্দ্রের উৎকর্ষ বোঝানোই কবির অভিপ্রায়। রূপকের সহায়তায় ব্যতিরেক সিদ্ধ। ব্যতিরেক ও অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্যের সংকরও বলা যেতে পারে।

উদাহরণ :

(৴০) **অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু।**

(৵০) **অঙ্গনে উদয় আমার উমা অকলঙ্ক শশী।**

(৶০) তুমি অচপল দামিনী।

(।০) অস্বাদিত মধু, অনাঘ্রাতা যূথী।

(।/০) থির-বিজুরি বরণ গোরী নাহিতে দেখিনু ঘাটে।

পরিণাম

লক্ষণ : অভেদে আরোপিত হয়নি, অভেদে পরিণত হচ্ছে এরকম বর্ণনায় পরিণাম অলংকার হয়।

রূপকে প্রস্তুত এবং আরোপ্যমাণ অপ্রস্তুতের প্রবল সাদৃশ্যবশতঃ একাত্মতা, এখানে একজাতীয় কার্যসাধনের দ্বারা একরূপতা। উভয়ের মধ্যে হওয়া, করা, দেওয়া প্রভৃতি ক্রিয়ার যোগ থাকে। বুঝে নিলে অভেদপ্রতিপত্তি হয়।

উদাহরণ ঃ

(/০) মৃদুহাস্যেতে তুমি মোরে, সখি, দিয়েছ যে উপহার,
বিদায়ে করেছ কৃপণ করুণা—চিরস্মৃতি সে আমার।
(সংস্কৃতের অনুবাদ)

(৵০) ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই শচীসুত হৈল সেই
বলরাম হৈল নিতাই।

(৶০) সুন্দরী ভেলী মাধাই।

(।০) আমার পাপড়ি মরমে মরিয়া
ফুটিল জীর্ণ কেশররূপে।

(।/০) আমি যে হয়েছি তব হাতের বিষাণ

(।৵০) কামিনী-পাপড়ি হেন হয় প্রস্তর
হয় শিলা ফুলময় তাজ।

(।৶০) তীর্থ হ'ল বন্দীশালা, শিকল অলংকার।

(॥০) গৃহের বনিতা ছিলে, টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়।

উল্লেখ

লক্ষণ : প্রকৃতকে নানাভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে মাত্র, এমন স্থলে অর্থাৎ অভেদারোপকে ছাড়িয়ে যেখানে চমৎকারজনক বিচিত্র পরিচিতি কাজ করে সেখানে উল্লেখ অলংকার হয়।

উদাহরণ :

(৴০) এস চণ্ডীদাস-গীতি, শ্রীচৈতন্য-প্রীতি,
রঘুনাথ-জ্ঞানদীপ্তি, জয়দেব-ধ্বনি,
প্রতাপ-কেদার-বাঞ্ছা, গণেশ-সুকৃতি,
মুকুন্দ-প্রসাদ-মধু-বঙ্কিম-জননী !

(বঙ্গভূমিকে নানাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।)

(৵০) হে কৃষ্ণ ! হে গোপিকারমণ ! হে ভুবনৈকবন্ধো !

(৶০) বাঙ্‌লা থেকে দেখতে এলাম মরুভূমির গোলাপ ফুল,
ইরান-দেশের শকুন্তলা ! কই সে তোমার রূপ অতুল ?

(।০) মগে বলে ফরাতারা (frater) গড্‌ বলে ফিরিঙ্গি যারা
খোদা ব'লে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজি ॥

সন্দেহ

লক্ষণ : কবির বর্ণনকৌশলে যদি প্রকৃত এবং অপ্রকৃত (উপমেয় ও উপমান) উভয় পক্ষেই চমৎকারজনক সন্দেহ আরোপিত হয় তাহ'লে সন্দেহালংকার হয়।

প্রবল সাদৃশ্যের জন্য উপমান অথবা উপমেয় কোন্‌টি ঠিক এ যেন কবি বুঝে উঠতে পারছেন না এবং ঐ সন্দেহ পাঠকচিত্তেও সঞ্চারিত করতে প্রয়াস করছেন। সন্দেহে উপমা অলংকারটি অর্থাৎ সাদৃশ্য ব্যঞ্জিত থাকে।

উদাহরণ :

(৴০) সে কি মধুকর-গুঞ্জন-হত মঞ্জরী বনবল্লীর ?
খর-বীক্ষণ-হসন-হসিতা যূথী-কাঞ্চন-মল্লীর ?

বাণী স্তবচনী নহে কি ?
করতালি-ঠাসা সভা ও জলসা সংস্কৃতি তার বহে কি ?

(এখানে উপমানগুলির প্রতি 'কি' এই প্রশ্ন উপমান এবং উপমেয়ের কোন্‌টি সত্য সেবিষয়ে সন্দেহ উপস্থাপিত করেছে। 'মধুকর-গুঞ্জন-হত' 'যূথী-কাঞ্চন-মল্লী' ইত্যাদিতে অপ্রস্তুত-প্রশংসা হয়েছে।)

(৵০) এ কি তন্বী, অথবা স্রোতস্বিনী ?
এ চিকুর, না বেতসচ্ছায়া ?
এ ভ্রূভঙ্গ, না তরঙ্গ ?
এ স্রস্তাঞ্চল, না তটভূমি ?

(৶০) বায়ুকম্পিত পদ্মপলাশ-চপল আয়ত দৃষ্টি।
উমা কি পেয়েছে হরিণী-সকাশে অথবা হরিণী ঋণী উমাপাশে,
দ্বিধায় দোদুল চিত্তের একি সন্দেহ অনাসৃষ্টি !
(সংস্কৃত থেকে)

(।০) মনে হ'ল মেঘ, মনে হ'ল পাখি, মনে হ'ল কিশলয়,
ভালো ক'রে যেই দেখিবারে যাই মনে হ'ল কিছু নয়।
দুই ধারে একি প্রাসাদের সারি, অথবা তরুর মূল ?
অথবা এ শুধু আকাশ জুড়িয়া আমারি মনের ভুল।

প্রথম দুই চরণে সন্দেহটি নিশ্চয়গর্ভ হয়েছে।

নিশ্চয়

লক্ষণ : উপমান এবং উপমেয় উভয়পক্ষের সন্দেহ নিরস্ত হয়ে যদি উপমেয়ে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে নিশ্চয়ালংকার হয়। অন্যভাষায়—অপ্রকৃতকে নিষিদ্ধ করে প্রকৃতকে স্থাপন করার নাম নিশ্চয়। এ অলংকার অপহ্নুতির বিপরীত।

উদাহরণ :

(/০) নিশাচর নয়, বর্ষার মেঘ.
শরাসন নয়, ইন্দ্রধনু।

বারিধারা, নয় শর খরবেগ,
বিদ্যুৎ এ, নয় প্রিয়ার তনু।

(সংস্কৃত থেকে)

এখানে যেন প্রথম সন্দেহ হয়েছিল যে এ রাক্ষস, প্রিয়াকে বলপূর্বক অপহরণ করে নিতে এসেছে, অথবা এ বর্ষার মেঘ? পরে সন্দেহের নিরসন ঘটলে, প্রকৃত বস্তু বর্ষার মেঘাদিতে নায়ক স্থির হচ্ছেন।

অনুরূপ সংস্কৃতের :

(৵০) যাকে ভুলে ভেবেছ জটা, তা জটা নয়, কেশের ঘটা।
গরল তো নয় কণ্ঠদেশে, এ নীল মৃগমদ উজ্জ্বল।
শিরে শশিলেখা নয়, এ কুসুম-রেখা!
অঙ্গে বিভূতি কিবা দেখ, এই তৈলবিহীন বিরহী দেহের খড়ি,
ভুলে খরশর মেরো না মদন, দোহাই তোমার,
আমি তো তোমার পূর্বশত্রু নই।

(৶০) কি আর কহিব, দেব! কাঁপিছে এ পুরী
রক্ষোবীর পদভরে, নহে ভূকম্পনে!
কালাগ্নি-সম্ভবা বিভা নহে যা দেখিছ
গগনে বৈদেহীনাথ; স্বর্ণবর্ণ আভা
অস্ত্রাদির তেজঃসহ মিশি উজলিছে
দশ দিশ! রোধিছে যে কোলাহল, বলি,
শ্রবণকুহর এবে, নহে সিন্ধুধ্বনি;
গরজে রাক্ষসচমূ মাতি বীরমদে।

(প্রকৃত ও অপ্রকৃতে সন্দেহস্থলে) ভূকম্পন, প্রলয়াগ্নি, জলকল্লোল প্রভৃতি অপ্রকৃতকে নিষেধ করে রাক্ষসগণের সমরপ্রস্তুতিরূপ প্রকৃতকে স্থাপন করা হয়েছে।

'অলংকার-চন্দ্রিকা' গ্রন্থে নিম্নলিখিত বর্ণনাটি নিশ্চয়ের উদাহরণ বলে গৃহীত হয়েছে :

এ নহে মুখর বনমর্মর-গুঞ্জিত,
এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে।
এ নহে বনানী কুন্দকুসুম-রঞ্জিত,
ফেনহিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে।

এখানে দু' জায়গায় একটিকে নিষেধ ক'রে আর একটি বস্তুকে স্থাপন করা হয়েছে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যের বীজ কোথায়, উপমান-উপমেয় সম্পর্ক কিসে হ'ল? বরং এই দুই বস্তু পরস্পরবিরুদ্ধ। বিষমালংকার হতে পারে, অপ্রস্তুত-প্রশংসার মিশ্রণও থাকতে পারে, নিশ্চয় হয় না, অপহ্নুতিও নয়।

অপহ্নুতি

লক্ষণ: প্রকৃতকে নিষেধ ক'রে বা গোপন ক'রে অপ্রকৃতকে স্থাপন করলে অপহ্নুতি হয়।

এটি নিশ্চয়ালংকারের বিপরীত। প্রায়শঃ 'না' শব্দের ব্যবহারের দ্বারা নিষেধ করা হয় এবং ছল, ব্যাজ প্রভৃতি শব্দে গোপন করা হয়।

(অপহ্নুতির সঙ্গে উৎপ্রেক্ষা অলংকারের গোলযোগের স্থলে দেখতে হবে উপমেয় নিষিদ্ধ হয়েছে কিনা।)

উদাহরণ:

(৵০) স্ফুট-অঙ্কিত মসীরেখাবলী নহে কলঙ্ক, ঘুমায় সুখে—
রমণী রজনী, দেখ লো সজনি! তুহিন-শীতল চাঁদের বুকে।
("অবাপ্য প্রাগল্ভ্যং" ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ)

এখানে প্রকৃত 'কলঙ্ক'কে নিষেধ করে অপ্রকৃত 'রমণী রজনী'কে স্থাপন করা হয়েছে। উপমান অংশে সমাসোক্তি অলংকারও হয়েছে।

(৵৹) ওকি গগনে সই কর নিরূপণ।
যদি বল হিমকর, এ যে অতি খরতর
তপনের তেজে যেন দহিছে জীবন।
(বিরহিণী বলতে চান এ চন্দ্র নয়, এ সূর্য।)

(৶০) এ নহে তপন-আভা, নহে শশধর-বিভা
হিমমাঝে বুঝি গৌরীর গৌর-আভা ভাসে রে।

বস্তুতঃ প্রভাতে একদিকে চন্দ্র, একদিকে অরুণাভা, একে নিষেধ

ক'রে এখানে অপ্রকৃত গৌরীর আভাকে স্থাপন করা হয়েছে। 'বুঝি' শব্দ থাকলেও উপমেয় নিষিদ্ধ হওয়ায় উৎপ্রেক্ষা হবে না।

এ কাব্যাংশটির ভুল অর্থ করলে 'নিশ্চয়' অলংকার মনে হওয়া অসম্ভব নয়।

(।০) অশ্রু নয়, অভ্র সুকঠিন !

(।/০) হিমগিরি-নির্ঝরে তোমার জীবন গড়ে
মিথ্যা মা মিথ্যা এ কাহিনী ;
যুগে যুগে নরনারী অফুরান আঁখিবারি
পুষ্ট করেছে তব বাহিনী।

গঙ্গার জন্ম সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যকে নিষিদ্ধ করে কল্পিত অপ্রকৃতকে স্থাপন করা হয়েছে।

(।৵০) হাটে হাটে আমি ঘুরে যে বেড়াই—
সে নহে করিতে হাট ;
হাটের বক্ষে দেখে যাই আমি
কত যে কাঁদিছে মাঠ।

(।৶০) নীর বিন্দু যত
দেখিতে কুসুম-দলে, হে সুধাংশুনিধি,
অভাগীর অশ্রুবিন্দু কহিনু তোমারে।

—এখানে প্রকৃত নীরবিন্দুকে নিষেধের ব্যাপারটি গম্য।

(॥০) আশীর্বাদ ছলে মনে নমিতাম আমি।

(॥/০) মোহন হাসির ছলে কোনো সীমন্তিনী
পুষ্প বরিষণ করে বাঙালি-উপরে !

(॥৵০) গৌরীর বদন-শোভা লখিতে না পারি কিবা,
দিনে চন্দ্র নাহি দেয় দেখা।
ম্লান চন্দ্র এই শোকে না বিচারি সর্বলোকে
মিথ্যা বলে কলঙ্কের রেখা ॥

(চন্দ্রের কলঙ্কই প্রকৃত, একে নিষেধ করে 'গৌরীর বদনশোভা-দর্শনজাত ম্লানিমা' এই অপ্রকৃতকে স্থান দেওয়া হয়েছে।)

(॥৶৹) মাধবীলতাটির মতো এই যে কোমল জীবনপাশ ছিঁড়িয়া গেল এই কি তাহার আদরের শৈলবালা। হঠাৎ নিশ্বাস টানিয়া দেখিল। না। সে তাহার বন্ধনরজ্জু।

(এখানে বস্তুতঃ অপহ্নুতি ও বিষমের সংকর হয়েছে।)

কারও কারও মতে উপমান-উপমেয় সম্বন্ধ ব্যতিরেকেও অপহ্নুতি হবে। এক অর্থ গোপন করে অন্য অর্থ প্রকাশ করলেও অপহ্নুতি হবে। তবে এর বিশেষ চমৎকারিত্ব আছে বলে আমরা মনে করি না। যেমন—

কম্প সহ দেহে তাপ দেখি, একি জ্বর নাকি ?
—না, না, স্মর, সখি।

অথবা, 'বর্ষায় রাস্তায় পা রাখা দায়।'
'প্রিয় চায় মেঘছায় এলায়িত কায় ?'
'না, না, বলি পিচ্ছল পথে চলা যায় ?'

(সংস্কৃত থেকে)

অথবা, প্রকাশিতে নয়, করিতে গোপন প্রাণের গভীর ব্যথা,
ওগো মহাকবি রচিয়াছ বুঝি এই মহা উপকথা ?
তথাপি, বন্ধু, নিঠুর সত্য নিখুঁত পড়েনি ঢাকা,
ফুলে ফুলে বুঝি তোমারি দীর্ণ হৃদয়-রক্ত মাখা! (মহাকবি = স্রষ্টা)

(এখানে অবশ্য ঐ অপহ্নুতি ও উৎপ্রেক্ষার সংকর হয়েছে।)

উৎপ্রেক্ষা

লক্ষণ : উৎপ্রেক্ষা শব্দের অর্থ উৎকট জ্ঞান, মিথ্যা, কল্পনা। উপমেয়কে নিষেধ বা বর্জন না ক'রে যেখানে কবি-প্রতিভাবলে আহৃত উপমানের পক্ষে সত্যতা-সংশয় গড়ে তোলা হয় সেখানে উৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়।

এতে কবির এমন বর্ণনকৌশল থাকে যে, উপমেয় বা প্রকৃত উপস্থিত থাকলেও কাল্পনিককেই সত্য বলে বোধ হয়। কবি তাঁর প্রতিভাবলে কাল্পনিক বা মিথ্যাকে এমনভাবে স্থাপন করেন যাকে সত্য বলে মনে ক'রে চমৎকার বোধ করতে পাঠকের এতটুকু

বিলম্ব হয় না। উৎপ্রেক্ষা বিশেষভাবে কবিকল্পনার উপর নির্ভরশীল। ভ্রান্তিমান্‌ থেকে এর পার্থক্য এই যে ভ্রান্তিমানে ভ্রমবশতঃ মিথ্যাকে সত্য বলে মনে হয়, এখানে ভ্রম ছাড়াই হয়। বাঙ্‌লায় উপমা রূপকের পরেই সমাসোক্তি এবং উৎপ্রেক্ষা অলংকারের আধিপত্য।

এই অলংকারের লক্ষণ নির্ণয়ে আলংকারিকেরা 'সম্ভাবন' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যেমন মম্মট বলছেন—'সম্ভাবনমথোৎ-প্রেক্ষা প্রকৃতস্য সমেন যৎ', টীকাকারেরা এর ব্যাখ্যায় বলছেন, 'উৎকট-এককোটিক সংশয়' উপমানের সঙ্গে উপমেয়ের, অর্থাৎ উপমান-পক্ষে প্রবল সংশয়। উৎপ্রেক্ষার সৌন্দর্য নির্ভর করে উপমানের নির্মাণ ও স্থাপনার অভিনবত্বের উপর।

কোনো বাঙ্‌লা অলংকারগ্রন্থে সন্দেহের সঙ্গে উৎপ্রেক্ষাকে মিলিয়ে পার্থক্য দেখানো হয়েছে, এইভাবে যে—সন্দেহে সংশয় দ্বিকোটিক, উৎপ্রেক্ষায় এককোটিক। কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়। সন্দেহের সংশয় এবং উৎপ্রেক্ষার সংশয় এক জাতের নয়। কবি-কল্পনার আধিপত্য উৎপ্রেক্ষায় যেমন, তেমন সন্দেহের ক্ষেত্রে নয়। উৎপ্রেক্ষায় উপমানপক্ষের চারুতাময় আকর্ষণক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল। এর পরের ধাপই হ'ল উপমান কর্তৃক উপমেয়ের অতিক্ষীণতাসাধন বা গ্রাস অর্থাৎ অতিশয়োক্তি।

এই উৎপ্রেক্ষা কখনো-কখনো যেন, বোধ হয়, মনে হয়, বুঝি প্রভৃতি শব্দের দ্বারা বাচকতা লাভ করে। তখন উৎপ্রেক্ষা হয় **'বাচ্য'**, আর ঐ সব শব্দ না থাকলে উৎপ্রেক্ষা হবে গম্য। বা **'প্রতীয়মানা'**। কিন্তু বাচ্য আর প্রতীয়মানা এমন একটা গুরুতর পার্থক্যের বিষয় নয়। কবির নববস্তু নির্মাণের ক্ষমতাই লক্ষণীয়।

উদাহরণ :

(৵০) অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিল দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্‌ প্রয়োজন॥
এত জানি রাহু কৈল চন্দ্রের গ্রহণ।

চন্দ্রের গ্রহণ তার আবর্তন-পথে স্বাভাবিক নিয়মে হয়। অর্থাৎ ছায়া বা রাহু চন্দ্রকে স্বাভাবিক নিয়মে আচ্ছন্ন গ্রাস করে, সেটাই প্রকৃত বা বাস্তব। এখানে কবির কল্পনায় তা ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। অকলঙ্ক গৌরচন্দ্রের আবির্ভাবে সকলঙ্ক চন্দ্রের আর প্রয়োজন নেই, এই ভেবে রাহু তাকে গ্রাস করলে। এইটিই মিথ্যা, কল্পিত বা সৃষ্ট উপমান। বর্ণনায় কবি (কৃষ্ণদাস কবিরাজ) ঐ মিথ্যাপক্ষকেই সত্য ব'লে মনে করতে বাধ্য করছেন। এখানে উৎপ্রেক্ষা প্রতীয়মান।

(৵০) কান পেতে শোন্ দেখি গগন-অরণ্যে কি
গর্জে শাবক-হারা বাঘিনী ?
ও কোন্ বেদিনী মেয়ে অমন কাঁদুনি গেয়ে
খেলাইছে বিদ্যুৎ-নাগিনী !

মেঘের মুহুর্মুহু গর্জনকে বর্ণনাকৌশলে কবি শাবকহারা বাঘিনীর গর্জনে সংশয়িত করেছেন। আর বিদ্যুৎ-বিকাশকে বেদিনী মেয়ের সাপ-খেলানোতে। গগনের সঙ্গে অরণ্যের অভেদ এবং বিদ্যুতের সঙ্গে নাগিনীর একাত্মতা ঐ কল্পনাকে পুষ্ট করেছে। 'গর্জে' ঐ শব্দটি মেঘ ও ব্যাঘ্র উভয়পক্ষেই কাজ করছে। কোনো শব্দে বাচ্যতা লাভ করে নি। অতএব এখানে প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা, রূপক-গর্ভা। বাক্যগুলি প্রশ্নাত্মক না হ'লে কল্পিত সংশয় থাকত না এবং অলংকারটি হ'ত অতিশয়োক্তি।

(৶০) নভ নীল বেদনায় !

বাস্তবে নভঃ স্বতই নীল, বেদনায় নয়। তবু কবি কল্পনায় একে বেদনা-নীল ক'রে তুলেছেন।

(।০) গগনে গগনে জীবনে জীবনে জ্বলিতেছে যত জ্বালা,
গাঁথা হয় কোন্ দিগ্‌বিজয়ীর নিষ্ঠুর জয়মালা ?

প্রথম চরণে গগনের সঙ্গে জীবনের একীকরণে দীপক অলংকারও হয়েছে। 'জ্বলিতেছে যত জ্বালা' (অগ্নি) এই বর্ণনায় অতিশয়োক্তিও পরিস্ফুট। অথচ এইটিই উপমেয়। কবি বলছেন, এ আর কিছুই নয়, দিগ্বিজয়ীর জয়মাল্য গাঁথা। এই কল্পনাকে কবি প্রাধান্য

দিতে চান এবং আমাদের উৎকট সংশয়সহ ধারণা করিয়ে দিতে চান যে এ নিষ্ঠুর দেবতার মানুষের উপর জয়। প্রতীয়মানা উৎপ্রেক্ষা।

(।/০) অঞ্জন লেই তনু রঞ্জল নব ঘন
দামিনী দ্যুতি হরি নেল।
লেই যৌবন-ছিরি নব-অঙ্কুর করি
মধুবন ঘনবন ভেল॥

নবঘন এমনিতেই কালো; কবি বলেছেন, নায়িকার অঞ্জন নিয়ে মেঘ ঘননীল হয়েছে। তেমনি দামিনী দেহকান্তি নিয়ে দ্যুতিসম্পন্না হয়েছে, ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে আগমনী সংগীতে—

(।৵০) যোগাচারী হেরে হরে, সকলেতে যোগ ক'রে
শিবের বৈভব লয়ে গেছে স্থানে স্থানে।
শশী গগনমণ্ডলে, সুরধুনী ধরাতলে,
ফণিগণ গেছে পাতালে, অনল নিবিড়-বনে॥

যোগমগ্নাবস্থায় শিবের চন্দ্র, গঙ্গা প্রভৃতি বহিরৈশ্বর্য প্রকাশিত হয় না। একেই গুপ্তকবি কল্পনাবলে অন্যকর্তৃক ঐ সব লুঠ ক'রে নেওয়া ব'লে প্রতীত করতে চান। এখানেও প্রতীয়মানা।

(।৶০) শৌখিন চড়কপার্বণ শেষ হ'ল ব'লেই যেন সজনে-খাড়া দুঃখে ফেটে গেলেন।

উৎপ্রেক্ষা 'যেন' শব্দে বাচ্যা।

(৷৹) ধোপাপুকুরের দলেরা আসর নিয়ে খেঁউড় ধরলেন, গোঁড়াদের 'সাবাস!' 'বাহবা!' 'শোভান্তরী!' 'জিতারও!' দিতে দিতে গলা চিরে গেল; এরই তামাসা দেখতে যেন সূর্যদেব তাড়াতাড়ি উদয় হলেন। বাঙালিরা আজও এমন কুৎসিত আমোদে মত্ত হন ব'লেই যেন ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে লজ্জিত হলেন! কুমুদিনী মাথা হেঁট কল্লেন! পাখীরা ছি! ছি! ক'রে চেঁচিয়ে উঠলো! পদ্মিনী পাঁকের মধ্যে থেকে হাসতে লাগলেন।

(উৎপ্রেক্ষা-সহকারে খেউড়ান্ত প্রভাতের চমৎকার বর্ণনা।)

(৷৵০) এক একজন ফলারমুখো বামুনকে ক্রিয়াবাড়ীতে ঢুকতে দেখলে হঠাৎ বোধ হয় যেন গুরুমশাই পাঠশালা ভুলে চলেছেন।

('বোধ হয়' শব্দে বাচ্য।)

(৷৶০) তেজস্বী শের, ঘৃণ্য কুতুব পাশাপাশি ঘুমায় আজ,
রাঢ়ের মাটি রাঙিয়ে দ্বিগুণ জাগছে জাহাঙ্গীরের লাজ!

(রাঢ়ের রাঙামাটি যেন জাহাঙ্গীরের লজ্জা। উপমানপক্ষে সংশয় পরিস্ফুট।)

(৷৷০) রেখে গেনু দেব আঁখির পিয়াসা
আরতির দীপে তুলি',
হিয়ার ভকতি রেখে গেল দাস
পাদ্য সলিলে গুলি।

(এখানে উৎপ্রেক্ষা এবং অতিশয়োক্তির সন্দেহ-সংকর ঘটেছে।)

(৸০) ঝমর ঝমাৎ ঝম বাজে ওই মল।
উঠিছে পড়িছে ফিরে, নামিছে উঠিছে কিরে
রূপ-হর্ম্যে সঞ্চারিণী রাগিণী তরল?
ভ্রমর কি গুঞ্জরিছে, কোকিল কি ঝংকারিছে,
নিশুতির শান্তিগৃহে খুলিয়া অর্গল!

(মলের ধ্বনি সঞ্চরমাণা তরলরাগিণীর সঙ্গে, ভ্রমরের গুঞ্জন ও কোকিলের ঝংকারের সঙ্গে সম্ভাবিত হয়েছে।)

(৸৵০) মনে হয়, সিন্ধু তুমি নীলের লেখন!
নিশা দিল চন্দ্রবিন্দু, তীর দিল দাঁড়ি,
ভানু দিল বর্ণমালা, বিসর্গ পবন,
বন দিল মকরন্দ মরম উঘাড়ি।

(সমুদ্রকে মসীলেখনরূপে কল্পনা করা হয়েছে। 'মনে হয়' শব্দে বাচ্য।)

(৸৶০) সাবধানী তিরস্কার মঙ্গল শাসন
স্নেহরোষে ইঙ্গিতে কি জানাল গগন?

(৸৶০) বস্ত্র লুকায়ে রাঙা মেঘ হাসে পশ্চিমে আনমনা—
রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধ'রে রঙীন বারাঙ্গনা !

(সূর্যাস্তের মেঘের বর্ণনা। কবি-প্রতিভা-বলে অপ্রকৃত 'দণ্ডায়মানা বারাঙ্গনা' প্রকৃতরূপে প্রতিভাত হচ্ছে।)

(১৲) দিনান্তে যবে ব্যর্থ সে রবি অস্ত-শিখর 'পরে
ছেঁড়া-মেঘে পাতি মৃত্যু-শয়ন রক্তবমন করে,
উঠে ত্রিভুবন ভরিয়া তখন বৃথা গায়ত্রী গান—

(এখানে সমাসোক্তি এবং উৎপ্রেক্ষার সংকর।)

(১৴০) ত্রিযুগের ব্যথা তিনভাগ জলে পূর্ণ করিল ধরা।
বাকি একভাগ ধর্মের নামে অশ্রুতে আজ ভরা !

(ত্রিভুবন ব্যথায় পূর্ণ এই ব্যঞ্জনা ! পৃথিবী সৃষ্টিতেই তিনভাগ জলে পূর্ণ, ত্রিযুগের ব্যথায় নয়, আর বর্তমানে চারভাগই জল যথার্থতঃ হয় নি। অথচ কবিকল্পনায় ঐ মিথ্যাই সত্যরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।)

(১৵০) ঘুমায় তোমাতে প্রেম-পূর্ণিমা-চাঁদ
এমন উজল তুমি তাই,
চাঁদের অমিয়া পেয়ে এই আহ্লাদ
কোনখানে কিছু গ্লানি নাই।

(তাজমহলের উজ্জ্বলতার কাল্পনিক কারণ উপস্থাপিত হয়েছে এবং ঐটিই সত্য বলে প্রতিভাত হচ্ছে।)

(১৶০) তার আল্‌তা-পরা পায়ের লোভে কৃষ্ণচূড়া ঝরায় দল।

(বস্তুতঃ কৃষ্ণচূড়ার পাপড়ি ঝরে ফুলের শুষ্কতা এবং ফলাগমের প্রস্তুতির জন্যে। ঐ বাস্তবতাকে প্রায় সমাচ্ছন্ন করে কাল্পনিকতাকে দাঁড় করানো হয়েছে। অতিশয়োক্তি হয়নি, কারণ, উপমেয় বর্ণিত হয়েছে 'ঝরায় দল' ইত্যাদিতে।)

(১৷০) তথাপি, বন্ধু, নিঠুর সত্য নিখুঁত পড়েনি ঢাকা,
ফুলে ফুলে বুঝি তোমারি দীর্ণ হৃদয়-রক্ত মাখা।

(যা সত্য নয় তাকেই 'অধ্যবসায়ে'র দ্বারা সত্য করা হচ্ছে।)

(১।৵০) সুধার আধার চাঁদের শোকেই তোমার কি এই পাগল ধরণ ?
মথন দিনের গভীর ব্যথায় মরণ-সমান আঁধার বরণ ?

(উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের বর্ণনা হচ্ছে। উৎপ্রেক্ষা প্রতীয়মান।)

(১।৶০) ঝলিতেছে জল তরল অনল,
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল,
দিগ্‌বধূ যেন ছলছল-আঁখি অশ্রুজলে।

(সমুদ্রে সন্ধ্যার বর্ণনা। 'যেন' শব্দে বাচ্যতা।)

(১।৶৹) যারে পাওয়া যায় কোটি বরষেও কি তার মূল্য আছে ?
তাই মহেশের অচল বক্ষে মহামায়া ঐ নাচে !
গলে দোলে হের মুণ্ডের মালা,
লোল রসনায় পিপাসার জ্বালা,
পিষ্টের তিমিরে মৃত দিক্‌বালা দশদিক্ ব্যাপিয়াছে—
মথিয়া চিত্ত, মহা অনিত্য নিত্যের বুকে নাচে !

(মহেশের অচল বক্ষে মহামায়ার অবস্থিতির প্রকৃত কারণকে পিছনে রেখে পার্থিব প্রণয়কে সামনে তুলে ধরা হয়েছে। 'পিপাসার জ্বালা' প্রভৃতি উপমান মূল উপমানটিকে পুষ্ট করেছে। প্রথম দুই চরণে অর্থান্তরন্যাস এবং শেষ চরণে বিরোধের মিশ্রণে সংসৃষ্টি ঘটেছে।)

(১॥০) রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুতলে, যেন তরু তাপি মনস্তাপে
খুলিয়াছে ফেলি সাজ।
(উৎপ্রেক্ষা পরিস্ফুটভাবে বাচ্য।)

(১॥/০) এত বলি সিক্তপক্ষ দুটি চক্ষু দিয়া
সমস্ত লাঞ্ছনা যেন লইল মুছিয়া
বিদেশীর অঙ্গ হতে।

(১॥৵০) রক্ত ললাটিকা
এ যে তোর সৌভাগ্যের বজ্রানলশিখা।

'অলংকার-চন্দ্রিকা' এবং 'কাব্যশ্রী' দুটি বাঙ্‌লা অলংকার পুস্তকেই নিম্নলিখিত উদাহরণটিকে 'উৎপ্রেক্ষা' বলা হয়েছে—

সীতাহারা আমি যেন মণিহারা ফণী।

বস্তুতঃ এটি উপমা। কবিকল্পিত সংশয়ের স্থানে এতে প্রত্যবয়ব সাদৃশ্য পরিস্ফুট। গোলমালের সৃষ্টি করেছে বোধ হয় ঐ 'যেন' শব্দটি। কিন্তু বাঙ্‌লায় 'যেন' তুল্যার্থেও প্রযুক্ত, এর উদাহরণ বিস্তর। "অধর কিসলয়-রাঙিমা আঁকা, যুগল বাহু যেন কোমল শাখা" এখানে উপমা তো? অনুরূপ নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তে—

(১) না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ।
সীতার হরণে যেন মারীচ কুরঙ্গ॥

(২) নষ্ট নষ্ট নষ্ট সঙ্গে হয়েছে মিলন।
রাবণের দোষে যেন সিন্ধুর বন্ধন॥

(৩) এমনি সমস্ত বিশ্ব প্রলয়ে সৃজনে
জ্বলিছে নিভিছে যেন খদ্যোতের জ্যোতি—

সুতরাং উৎপ্রেক্ষার স্থির নির্দিষ্ট বাচক শব্দ 'যেন' নয়। সংস্কৃতে "মন্যে, শঙ্কে, ধ্রুবং, প্রায়ম্" ইত্যাদি শব্দে বাচ্য উৎপ্রেক্ষা সম্ভব হলে সেখানেও দেখতে হয় উপমান-নির্মিতির কৌশলে যথার্থ উৎপ্রেক্ষা হয়েছে কিনা। 'ইব' শব্দ উপমার বাচক। কিন্তু স্থানবিশেষে তা-ই উৎপ্রেক্ষা-প্রতিপাদক হতে পেরেছে, যেমন 'লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি'। 'ইব' শব্দের ব্যবহারের প্রসঙ্গে উপমা ও উৎপ্রেক্ষার প্রভেদ কোনো টীকাকার নিম্নলিখিত ভাবে দেখাচ্ছেন—

যদায়মুপমানাংশো লোকতঃ সিদ্ধিমৃচ্ছতি।
তদোপমৈব যেনেবশব্দঃ সাধর্ম্যবাচকঃ॥
যদা পুনরয়ং লোকাদসিদ্ধঃ কবিকল্পিতঃ।
তদোৎপ্রেক্ষৈব যেনেবশব্দঃ সম্ভাবনাপরঃ॥

উপমায় উপমানটি লোকে স্বীকৃত এবং প্রসিদ্ধ, উৎপ্রেক্ষায় তা কবি-কল্পনার দ্বারা গঠিত, নবীনতায় চমৎকারজনক। 'যাদের রক্তে উড়ছে

আকাশে মিলের ধোঁয়া' এটিতে যে চমৎকার উৎপ্রেক্ষা হয়েছে তার উপমানটি "রক্তের দ্বারা ধোঁওয়া ওড়ার সম্ভাব্যতা" লোকে সিদ্ধ নয়, তত্ত্বতও তা নয়। কারণ, ধোঁয়া ওড়ে আগুনের জন্য, আগুনের সঙ্গে ধোঁয়ার অবিনাভাব সম্বন্ধ। এখানে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কল্পনায় রক্তের সঙ্গে সেই সম্পর্ক তাদাত্ম্যে স্থাপিত হয়েছে। 'মুখ যেন চাঁদ' এক্ষেত্রে উৎপ্রেক্ষা না হতেও পারে, কিন্তু 'শয্যা যেন অগ্নিশয্যা' এক্ষেত্রে হবে। এইভাবে উৎপ্রেক্ষা অলংকারে 'অধ্যবসায়' বা নব কাল্পনিকতার দিকটি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। কোনো বাচক শব্দের সঙ্গে কোনো অলংকারের যতই নিকট সম্পর্ক থাক, ঐ শব্দ ধরে অলংকার নির্ণয় চলে না। কারণ, কবির সংখ্যা অগণিত বলে কাব্যে বাণীর ব্যবহারবৈচিত্র্য অপরিমিত।

অনুরূপ ভাবে নিম্নলিখিত অংশে সাদৃশ্য-বাচক 'যেমন' শব্দ রয়েছে, কিন্তু অলংকারটি হবে উৎপ্রেক্ষা—

দিনের শেষে শেষ আলোটি পড়েছে ওই পারে
জলের কিনারায়,
পথে চলতে বধূ যেমন নয়ন রাঙা ক'রে
বাপের ঘরে চায়॥

অতিশয়োক্তি

লক্ষণ ঃ কবিকল্পনায় বিষয় অর্থাৎ উপমেয়কে অত্যন্ত তিরস্কৃত করে যদি বিষয়ী অর্থাৎ উপমানকেই প্রতিষ্ঠিত করা হয় তাহলে **অতিশয়োক্তি** হয়।

অতিশয়োক্তি শব্দের সাধারণ অর্থ আতিশয্যপূর্ণ, লোকসীমার অতিরিক্ত বর্ণনা। উপমা থেকে আরম্ভ করে সব অলংকারের মধ্যেই এই অতিরিক্ততা আছে। "কোঽলংকারোঽনয়া বিনা"—এ ছাড়া অলংকার হয় না। ভূমিকায় আমরা সর্বালংকারসাধারণ বস্তু ব'লে অতিশয়োক্তির বিশেষভাবে উল্লেখ করেছি। এখানে তারই বিশিষ্ট অলংকৃতিরূপের কথা বলা হচ্ছে। উৎপ্রেক্ষায় আমরা দেখেছি

উপমান-পক্ষে সত্যতা-প্রতীতি প্রবল, তবু উপমেয় বর্ণনার বাইরে নয়। উপমেয়ের বর্ণনা করে উপমান-পক্ষে প্রতীতির যে আধিক্য জাগানো হচ্ছে এতেই উৎপ্রেক্ষা অলংকারটি মূর্তিলাভ করছে। অতিশয়োক্তিতে উপমানের নিশ্চিত স্থাপন, সেখানে তার প্রতিপক্ষ একেবারেই নেই বললে চলে। একে বলা হয়েছে 'বিষয়ীর সিদ্ধ অধ্যবসায়'। উৎপ্রেক্ষায় এই অধ্যবসায় অর্থাৎ উপমান-নির্মাণ সাধ্য মাত্র অর্থাৎ অতিনিশ্চিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। অতিশয়োক্তিতে তা সিদ্ধ। অন্যভাবে বলা হয় যে অতিশয়োক্তিতে বিষয়ী বিষয়কে গ্রাস করে ফেলে। 'গ্রাস করা' শব্দে উপমেয়ের অবিদ্যমানতাই যে সর্বত্র বুঝতে হবে এমন নয়। উপমেয় দুর্বলভাবে অবস্থান করেও অতিশয়োক্তির সৃষ্টি করতে পারে।

রূপকের সঙ্গে অতিশয়োক্তির পার্থক্য এই যে, রূপকে অতি-সাম্যের জন্য উপমেয়ে উপমানের অভেদ আরোপ। সেখানে উপমেয়ই প্রধানভাবে বর্ণনীয়। অতিশয়োক্তিতে কবিকল্পনায় উপমানকেই মুখ্যবর্ণনীয় ও দৃষ্টিগোচর করে তোলা হয়েছে। অতিশয়োক্তিতে আরোপিত অভেদের প্রশ্ন নেই, উপমানেরই সর্বস্বতা, একাধিপত্য। ইংরেজি Hyperbole-এর সঙ্গে অতিশয়োক্তির একটা সাধারণ মিল আছে মাত্র, বিশেষে নেই। Hyperbole যে-কোনো বিষয়কে যে-কোনোভাবে বেশি করে বাড়িয়ে বললেই হয়। অতিশয়োক্তিতে বিশেষ চমৎকারিতা থাকা চাই।

উপমেয়ের উল্লেখ আছে এবং একেবারেই নেই, এই হিসেবে অতিশয়োক্তির দুরকম বিভাগ করা যায়। তা ছাড়া আলংকারিকদের মতে নিম্নলিখিত বর্ণনবৈচিত্র্যগুলি অতিশয়োক্তির মধ্যে গৃহীত হবে। (১) ভেদে অভেদ এবং তার বিপরীত অর্থাৎ অভেদে ভেদ। দুটি বস্তু পরস্পর ভিন্ন হলেও কল্পনায় তাদের অভিন্নতা সাধন, আর অভিন্ন হলেও কল্পনায় তাদের ভিন্নতা সাধন। (২) অসম্বন্ধে সম্বন্ধ এবং সম্বন্ধে অসম্বন্ধ, অর্থাৎ বাস্তবে সম্বন্ধ হয় না, কিন্তু কবিকল্পনায়

ঘটানো হয় অথবা বাস্তবে সম্বন্ধ থাকলেও কবিকল্পনায় সম্বন্ধ নেই এমন বিন্যাস করা হয়, আর (৩) কারণ ও কার্যের যে পূর্ব-পর সম্বন্ধ থাকে তার বিপর্যয় সাধন। অর্থাৎ আগে কার্য, পরে কারণের উদ্ভব বিন্যাস।

উদাহরণস্থলে এগুলির স্বরূপ দেখানো হচ্ছে ঃ

(৴০) কী কথা শুনি অদ্‌ভূত—
এতদিনে কি পড়িল ধরা অশনি-ভরা বিদ্যুৎ!

—অশনি-ভরা বিদ্যুৎ উপমানের সঙ্গে গ্রস্ত উপমেয় বীর পলাতকের ভেদে অভেদ সম্পর্ক। কোন কোন আলংকারিক একে **রূপকাতিশয়োক্তি** বলতে চান। ইংরেজি মতে এসব Suppressed Metaphor.

(৵০) বন-সুশোভন শাল ভূপতিত আজি!
চূর্ণ তুঙ্গতম শৃঙ্গ গিরিবর-শিরে!
গগন-রতন শশী চিররাহুগ্রাসে!

—গ্রস্ত উপমেয় মেঘনাদের সঙ্গে 'শাল' প্রভৃতি উপমানের ভেদে অভেদ সম্পর্ক।

(৶০) মুকুতা-মণ্ডিত বুকে নয়ন বর্ষিল উজ্জ্বলতর মুকুতা!

—অশ্রুবিন্দুর সঙ্গে মুক্তার ভেদে অভেদ সম্পর্ক।

(।০) তবু দেখো সেই কটাক্ষ
আঁখির কোণে দিচ্ছে সাক্ষ্য
যেমনটি ঠিক দেখা যেত কালিদাসের চোখে।

—সেই কটাক্ষ এবং এই কটাক্ষে প্রভেদের মধ্যেও অভেদ কল্পনা।

(।৴০) জলপদ্মগুলি হাসে পাদপদ্ম ঘিরে

—রূপক-সংকর। অসম্বন্ধে সম্বন্ধরূপা অতিশয়োক্তি।

(।৵০) শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা,
শোননি কি জননীর অন্তরের কথা?

মুখের বাক্য এবং অন্তরের কথা অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও ভিন্নরূপে স্থাপিত। মুখের বাক্যকে অধঃকৃত করে অন্তরের কথারূপ অপ্রস্তুতকেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

(।৶০) শেষবার এই লিখে যাই
তুমি চলে গেছ।
বাকি আর যত কিছু
হিজিবিজি আঁকাজোকা ব্লটিঙের পরে।

—বাকি লেখাও লেখা। কিন্তু তা ভিন্নরূপে গৃহীত। অভেদে ভেদ।

(৷৷০) দৃষ্টি তার ফিরে এল, কোথা সে নয়ন।
চুম্বন এসেছে তার কোথা সে অধর ॥

এখানে দৃষ্টি এবং নয়নের, চুম্বন এবং অধরের অভিন্নতা সত্ত্বেও ভেদ দেখানো হয়েছে।

(৷৷/০) শয়নের খাটটা মৃতদেহবহনেরও যোগ্য নয়, যাহার সাতকুলে কেহ নাই এমন একটা অনাথ চামচিকে শাবকও এই জীর্ণ প্রাচীরে বাস করিতে চাহে না, এবং গৃহসজ্জা দেখিলে ব্রহ্মচারী পরমহংসের চক্ষেও জল আসে।

—স্পষ্টতই গৃহের দৈন্য বাড়িয়ে বলা হয়েছে। খাটটায় মৃতদেহ বহনের সম্বন্ধে, জীর্ণপ্রাচীরে চামচিকে শাবকের বাসপক্ষে সম্বন্ধে, এবং ব্রহ্মচারী পরমহংসের অনুমোদন-সম্বন্ধে অসম্বন্ধ কল্পিত হয়েছে।

(৷৷৴০) বালা শৈশব তারুণ ভেট।
লখই না পারিয়ে জেঠ-কনেঠ ॥

এখানে লক্ষ্য করা গেলেও লক্ষ্য করা যায় না এইরূপ সম্বন্ধে অসম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে।

(৷৷৶০) কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়লুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেলি।

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখলু
তভো হিয় জুড়ন না গেলি ॥

অতিশয়োক্তি সহকারে কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ নির্দিষ্ট হচ্ছে। কেলির স্বরূপ ঐরূপ বহু মধুযামিনী কাটানোর পর বোঝা স্বাভাবিক ছিল. লক্ষ লক্ষ যুগ হৃদয়ের উপর হৃদয়কে স্থাপন করায় হৃদয়ের আর্তি প্রশমিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা হয় নি। এজন্য সম্বন্ধে অসম্বন্ধ-রূপ অতিশয়োক্তি। 'বিষমে'র সঙ্গে সন্দেহ-সংকর।

(৮০) তোমার নাহি শীতবসন্ত জরা কি যৌবন,
সর্বঋতু সর্বকালে তোমার সিংহাসন।
নিভেনাক প্রদীপ তব পুষ্প তোমার নিত্যনব
অচলা শ্রী তোমায় ঘেরি চিরবিরাজ করে।

শীত বসন্ত জরা যৌবন প্রভৃতির সম্বন্ধ থাকাই স্বাভাবিক, এখানে অসম্বন্ধ কল্পিত।

(৮/০) তির তরী উল্কা বায়ু শীঘ্রগামী যেবা।
বেগ শিখিবারে বেগে সঙ্গে যাবে কেবা ॥

এখানে তির, তরী, উল্কা প্রভৃতি স্বতই অত্যন্ত বেগবান্। তবু এদের বেগ শিক্ষা অসম্বন্ধে সম্বন্ধ।

(৮৵০) বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায়।

—বাতাসে ফাঁদ পাতার অসম্বন্ধে সম্বন্ধ কল্পিত।

(৮।০) স্পর্শে তোমার জুঁই বকুলের শিলায় শিলায় ফুটল ফুল।

—শিলায় ফুল ফোটার অসম্বন্ধে সম্বন্ধ।

(৯\) যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনুজ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরিচমক-মতি হোতি ॥

যেখানে যেখানে দেহজ্যোতি সেখানে সেখানেই বিদ্যুৎ প্রকাশের বাস্তব অসম্বন্ধে সম্বন্ধ কল্পনা।

(১৵০) যাদুকর চন্দ্রকর তালের বাকলে
হেথা হোথা তুলিয়াছে রূপার ফলক ;
মাধবীলতার ফাঁকে বকুলের তলে
কে তরুণী মুঠি ভরি ধরে চন্দ্রালোক !

প্রথমাংশে চন্দ্রকিরণের রূপার ফলক তোলার অসম্বন্ধে, এবং দ্বিতীয়াংশে চন্দ্রালোককে মুঠি ভরে তোলার অসম্বন্ধে সম্বন্ধ কল্পিত হয়েছে।

(১৶০) বসিয়া দিবস রাতি অনিমিখ আঁখি।
কোটি কল্প যদি নিরবধি দেখি॥
তবু তিরপিত নহে দুইটি নয়ান।
জাগিতে তোমারে দেখি স্বপন সমান॥

* * *

যতনে আনই যদি ছাঁকিয়া বিজলি।
অমিয়ার সাথে যদি গড়াই পুতলি॥
রসের সায়রে যদি করাই সিনান।
তবু ত না হয় তোমার নিছনি সমান॥

এখানে অসম্বন্ধে সম্বন্ধ কল্পিত।

(১৷০) সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।

—শ্লেষগর্ভ। সাগরে অগ্নি থাকার অসম্বন্ধে সম্বন্ধ স্থাপিত।

(১।০) দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া।
ভয়ে বিধি তার মুখে থু'লা লুকাইয়া॥

বিধিকর্তৃক বিম্বামুখে সুধা লুকিয়ে রাখার অসম্বন্ধে সম্বন্ধ বর্ণিত।

(১।৵০) লক্ষ্মী সরস্বতী যদি একঠাঁই হয়।
দেবরাজ লেখে যদি নাগরাজ কয়॥
লিখিতে কহিতে তবু পারে কি না পারে।

—অসম্বন্ধে সম্বন্ধ এবং সম্বন্ধে অসম্বন্ধ দুই-ই।

(১।৵০) শুনেছি মৈথিলী-নাথ আদেশিলে, জলে
ভাসে শিলা, নিবে অগ্নি, আসার বরষে !

—আদেশে ঐরূপ হওয়ায় অসম্বন্ধে সম্বন্ধ স্থাপিত।

(১।৶০) সেই গান শুনি
কুসুমিত তরুতলে তরুণ তরুণী
তুলিল অশোক।

—অসম্বন্ধে সম্বন্ধ।

(১॥০) দুর্গম তুষারগিরি অসীম নিঃশব্দ নীলিমায়
অশ্রুত যে গান গায়
আমার অন্তরে বারংবার
পাঠায়েছে নিমন্ত্রণ তার।

অসম্বন্ধে সম্বন্ধ। দুর্গম তুষারগিরি কর্তৃক নিমন্ত্রণ প্রেরণে সমাসোক্তির সংকর ঘটেছে।

(১॥/০) তোমার খেলায় রাং রূপো হয়, গোবরে শালুক ফোটে।

—অসম্বন্ধে সম্বন্ধ।

(১॥৵০) হৃদয় তোমার আঁখির পাতায় থেকে থেকে পড়ে ঠিকরি।

—অসম্বন্ধে সম্বন্ধ। ভেদে অভেদও বলা যায়।

(১॥৶০) যে মালা গেঁথেছি আজি তোমারে সঁপিতে উপহার
তারি দলে দলে
নামহারা নায়িকার পুরাতন আকাঙ্ক্ষা-কাহিনী
আঁকা অশ্রুজলে।
সযত্নসেচনসিক্ত নবোন্মুক্ত এই গোলাপের
রক্ত পত্রপুটে
কম্পিত কুণ্ঠিত কত অগণ্য চুম্বন-ইতিহাস
রহিয়াছে ফুটে।

—দুটি ক্ষেত্রে অসম্বন্ধে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে।

(১৮০) যে ফুল রচেনি পূজার অর্ঘ্য, রাখেনি ও রাঙা চরণে ;
সে ফুল ফোটার আসে সমাচার জনহীন ভাঙা ভবনে।

ফুল কর্তৃক পূজার অর্ঘ্য রচনা প্রভৃতির সম্বন্ধে অসম্বন্ধ কল্পিত।

(১৮/০) শ্লথ অঙ্গ হতে
তপ্তনিদ্রালসখানি স্নিগ্ধ বায়ুস্রোতে
করি দিয়া বিসর্জন।

শ্লথ অঙ্গ ও নিদ্রালসের অভেদ সম্বন্ধ এখানে ভেদ সম্বন্ধে স্থাপিত।

(১৮৵০) আমি যারে ভালোবাসি সে যদি ভালোবাসিত।
কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে, কেতকী কণ্টকহীনে
ফুল ফুটিত চন্দনে ইক্ষুতে ফল ফলিত॥

কিংশুকের ঘ্রাণযুক্ত হওয়া প্রভৃতি অপ্রকৃতের অসম্বন্ধে সম্বন্ধ বর্ণিত।

(১৮৶০) তুমি আছ তাই আছে কাল-দেশ

—কার্য-কারণের পৌর্বাপর্য-বিপর্যয়রূপ অতিশয়োক্তি।

(২৲) আমারই চেতনার রঙে পান্না হ'ল সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।

—কার্য-কারণের পৌর্বাপর্য-বিপর্যয়রূপ অতিশয়োক্তি।

(২/০) আগে পুংবৎ, স্ত্রীলিঙ্গ পরে, লোকে এই নীতি লভি।
তোমার বেলায় হ'ল বিপরীত, বাণী হ'ল বাণ-কবি॥

—পৌর্বাপর্য-বিপর্যয়সহ বাণীই বাণ হয়েছেন এই অতিশয়োক্তির দ্বারা বাণভট্টের মহিমা খ্যাপন।

(২৵০) ভ্রমর ছুটিলে কলিকা ফুটিল, হায়, একি কলিকাল !

—কার্যকারণের বিপর্যয়রূপ অতিশয়োক্তি, অপ্রস্তুত-প্রশংসা-সংকর।

সমাসোক্তি

লক্ষণ : বর্ণনীয় বিষয়ে (প্রস্তুতে) অন্য বিষয়ের (অপ্রস্তুতের) ব্যবহার সমারোপ করলে সমাসোক্তি অলংকার হয়।

অলংকারটিতে **অপ্রস্তুত ব্যঙ্গ্য অবস্থায় থাকে**। অপ্রস্তুতটি বাচ্য হলেই অলংকারটি ভিন্ন হয়ে যায়। অলংকারটি ইংরেজি Personification বা Pathetic Fallacy থেকে পৃথক্। কারণ, বর্ণনীয় চেতন অথবা অচেতন, মানুষ অথবা ইতর প্রাণী যাই হোক না কেন, তার উপর অন্য যে-কোনো বস্তুর ব্যবহার আরোপ করে বর্ণনা করলেই এ অলংকার হবে। অবশ্য যদি বর্ণনায় চমৎকারিত্ব থাকে। অপরপক্ষে Personificationএ কেবল অচেতন বা ভাব-মূলক বস্তুর উপর মানবিক ব্যবহার আরোপিত হয়। এরই বিশিষ্ট প্রয়োগে, নিসর্গবস্তুর মানবিক সহানুভব প্রকাশে Pathetic Fallacy হয়—এটি Ruskin-এর অভিমত। সমাসোক্তি এ দুয়ের থেকে আরও ব্যাপক এবং এ দুয়ের বিপরীত ভাবের বর্ণনেও সমভাবে প্রযুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ সমাসোক্তির ব্যবহারের উত্তম কবি। দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতায় Personification এবং সমাসোক্তির মৌলিক দৃষ্টান্তসমূহ তাঁর কবিব্যক্তিত্বের স্বরূপের প্রকাশক হয়েছে।

মনে রাখতে হবে যে, রূপকে সমস্ত উপমানটি অভেদে আরোপিত হয়, এখানে উপমানের কার্য বা প্রকৃতি আরোপিত হয়। উপমানটি ব্যঞ্জনাশক্তির বলে ধরা যায়।

উদাহরণ :

(/০) যাহার উদয়ে কান্তি তোমার ক্লান্তিমলিন, হে হিমবহ,
দূরে যাক তার প্রত্যুপকার, তুমি কর তার করগ্রহ ?
দুর্বল ব'লে এই আচরণ ? ক্ষোভ কেন নাই, হে নির্লজ্জ !
উচ্চ আকাশে তবু উজ্জ্বল আলোহাসি এত ! লাগে অসহ্য।
('যেনাস্তভ্যুদিতেন' ইত্যাদি থেকে)

—বিরহিণী কর্তৃক চন্দ্রের ভর্ৎসন। চন্দ্রের উপর নির্লজ্জ নির্বোধ পুরুষের ব্যবহার সমারোপ করা হয়েছে। বিশেষণে এবং কার্যের বর্ণনায় এটি প্রতীত হচ্ছে।

(৵০) অনুরাগময়ী সন্ধ্যা কুমারী, দিবসও তাহার সমুখে রয়।
দৈবের গতি দেখ বিচিত্র, তবুও এদের মিলন নয়।
('অনুরাগবতী সন্ধ্যা'—ইত্যাদি)

—সন্ধ্যা ও দিবসের উপর নায়ক নায়িকার ব্যবহার আরোপ উপমানবাচক শব্দের ও কার্যের দ্বারা করা হয়েছে।

(৶০) পুষ্করিণীর ধারে, তালবনে অন্ধকার গা ঢাকা দিয়া মুখে মুড়ি দিয়া বসিয়া আছে।

--অন্ধকারের উপর বৃদ্ধের ব্যবহার সমারোপিত।

(৷০) আমাদের মতো প্রতিভাহীন লোক ঘরে বসিয়া নানারূপ কল্পনা করে, অবশেষে কার্যক্ষেত্রে নামিয়া ঘাড়ে লাঙল বহিয়া পশ্চাৎ হইতে লেজমলা খাইয়া নতশিরে সহিষ্ণুভাবে প্রাত্যহিক মাটি ভাঙার কাজ করিয়া সন্ধ্যাবেলায় এক-পেট জাবনা খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে; লম্ফেঝম্ফে আর উৎসাহ থাকে না।

—বর্ণনীয় 'প্রতিভাহীন লোক' এর উপর বলদের ব্যবহার আরোপ করা হয়েছে।

(৷৴০) ছায়া বাড়াইয়া যত পথ-তরু দাঁড়াইয়া সারে সার,
তারি মাঝে হায়, বকুলও বিলায় লাজুক গন্ধ তার!

—পথতরুর উপর সেবক ভৃত্যের এবং বকুলের উপর সেবকা নারীর ব্যবহার আরোপ করা হয়েছে।

(৷৵০) ফিন্‌ফিনে জ্যালজেলে অতি মিহি রঙীন ঢাকাই
অঙ্গে তব অর্ধ-বিবসনা!
কে গো তুমি? হাবে ভাবে এ কি দৃপ্ত যৌবন-বড়াই!
মদিরায় ঘূর্ণিত-নয়না!

—কুড়চি ফুলের উপর প্রগলভা নায়িকার ব্যবহার সমারোপ।

(৷৶০) ভস্ম হইল চৈত্রমাস। হয়ে অনাথিনী,
মুছিল সিন্দুরবিন্দু বাসন্তী যামিনী!

চৈত্রমাসের উপর মদনের এবং বাসন্তী রাত্রির উপর রতির ব্যবহার সমারোপিত।

(॥॰) পত্রের নিয়েছ বর্ণ, ফল হ'তে গন্ধ,
আকৃতি ফুলের কাছে করিয়াছ ধার ;
সর্বধর্মসমন্বয় লোভে হয়ে অন্ধ,
স্বধর্ম হারিয়ে হ'লে সবজাতি-বা'র।

—কাঁঠালি চাঁপার উপর নিজত্বহীন পুরুষের ব্যবহার সমারোপ।

(॥/॰) ধীরে এনু বাহিরিয়া, উষার আতপ্ত কর ধরি ;
মূর্ছে দেহ, মোহে মন,—মুহুর্মুহুঃ করি অনুভব !
সূর্যের বিভূতি তব লাবণ্যে দিতেছে তনু ভরি ;
দিনদেবে নমস্কার ! আমি চম্পা, সূর্যেরি সৌরভ !

—চম্পার উপর পূর্বরাগবতী নায়িকার ব্যবহার সমারোপ।

(॥৶॰) অয়ি সুখময়ি উষে ! কে তোমারে নিরমিল ?
বালার্ক-সিন্দূর-ফোঁটা কে তোমার ভালে দিল ?

(॥৵॰) নয়নে তব, হে রাক্ষসপুরি,
অশ্রুবিন্দু ; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি,
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট,
আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরি,
তোমার !

—লঙ্কার উপর শোকবিবশা রাজ্ঞীর ব্যবহার সমারোপ।

(৸॰। আসিছে রজনী,
নাহি যার মুখে কথা বায়ুরূপ স্বরে ;
নাহি যার কেশপাশে তারারূপ মণি
চিররুদ্ধ দ্বার যার নাহি মুক্ত করে
উষা, তপনের দূতী, অরুণ-রমণী !

রজনীর উপর শোককর্ষিতা নারীর ব্যবহার আরোপ। রূপক-গর্ভ সমাসোক্তি।

(৸/॰) নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোনার আঁচলখসা
হাতে দীপশিখা।

—সন্ধ্যার উপর বিশেষণযোগে বধূর ব্যবহার আরোপ।

(৮৶০) তপন উদয়ে হবে মহিমার ক্ষয়,
তবু প্রভাতের চাঁদ শান্তমুখে কয়—
অপেক্ষা করিয়া আছি অস্তসিন্ধুতীরে,
প্রণাম করিয়া যাব উদিত রবিরে ॥

—মহৎকে প্রাপ্য গৌরব দান করতে পারে এমন বিনয়ী মানুষের ব্যবহার চন্দ্রে আরোপিত।

(৮৷৵০) হেমন্তের প্রভাতশিশিরে
ছল ছল করে গ্রাম চূর্ণী-নদীতীরে।

—গ্রামের উপর রোদনমুখী বধূর ব্যবহার আরোপ।

(৯) অয়ি ইতিবৃত্তকথা, ক্ষান্ত করো মুখর ভাষণ
(৯/০) শক্তিহীনা মরি লাজে, এ ভূষণ কি আমায় সাজে

—কবির নিজের উপর নারীর ব্যবহার আরোপ।

(৯৶০) আমার দিনের যাত্রাশেষে কার অতিথি হলেম এসে ?
হায়রে বিজন দীর্ঘ রাত্রি, হায়রে ক্লান্ত কায়া ॥

—কবির নিজের উপর যাত্রীর ব্যবহার আরোপ।

(৯৷৵০) নিদ্রাবিহীন শশী
আকাশ-পারাবারের খেয়া একলা চালায় বসি।

—চন্দ্রের উপর মাঝির ব্যবহার আরোপ।

(৯।০) একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়-গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নব পল্লব উদ্‌গত হোত।

—ইত্যাদি

—লেখকের নিজের উপর বৃক্ষলতার ব্যবহার সমারোপ।

ভ্রান্তিমান্

লক্ষণ : প্রবল সাদৃশ্যবশতঃ প্রকৃত বস্তুতে অন্য বস্তুর (উপমেয়ে উপমানের ভ্রম) ঘটলে ভ্রান্তিমান্ অলংকার হয়।

ভ্রান্তিবশতঃ এমন ঘটছে এই ভাবটি পরিস্ফুট হতে হবে। ভ্রান্তি 'অতস্মিংস্তদ্‌বুদ্ধিঃ'। রজ্জুতে সর্পভ্রমে কাব্যিক চমৎকারিত্ব নেই বলে অলংকার মধ্যে গণ্য হবে না। কিন্তু ঐ ব্যাপারটিই কাব্যকৌশলে ভ্রান্তিমান্ হতে পারে। এর ব্যঞ্জিত বিষয় হ'ল প্রবল সাদৃশ্য।

উদাহরণ :

(৴০) দেখ সখে, উৎপলাক্ষী সরোবরে নিজ অক্ষি-
প্রতিবিম্ব করি দরশন।
জলে কুবলয়-ভ্রমে বার বার পরিশ্রমে
ধরিবারে করয়ে যতন ॥

(সংস্কৃতের অনুবাদ, লালমোহন বিদ্যানিধির গ্রন্থ থেকে)—নিজের চোখের ছায়া কুবলয়ভ্রান্তি ঘটিয়েছে।

(৶০) বাহিরি বেগে, শোভিল আকাশে
দেবযান, সচকিতে জগৎ জাগিলা,
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয়-অচলে
উদিলা! ডাকিল ফিঙা, আর পাখি যত
পূরিল নিকুঞ্জ-কুঞ্জ প্রভাতী সংগীতে!
বাসরে কুসুম-শয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা
কুলবধূ গৃহকার্য উঠিলা সাধিতে!

—দেবযানের আভা দৃষ্টে অরুণোদয়-ভ্রান্তি।

(৷০) স্বপনে শুনিয়া শিশু সে মধুর ধ্বনি,
হাসিল মায়ের কোলে মুদিত নয়ন!
নিদ্রাহীন বিরহিণী চমকি উঠিলা,
ভাবি প্রিয়-পদশব্দ শুনিল ললনা,
দুয়ারে! কোকিলকুল নীরবিল বনে।
উঠিলেন যোগিব্রজ; ভাবি ইষ্টদেব,
বর মাগ, বলি আসি দরশন দিলা!

(।০) বনে ঘনশ্যাম রামে দেখি শিখিকুল।
বারিধর হবে ভাবি নাচিয়া আকুল॥

(সংস্কৃত থেকে)

তুল্যযোগিতা

লক্ষণ : প্রস্তুত অথবা অপ্রস্তুত একই ধর্মের (গুণ বা ক্রিয়ার) দ্বারা গ্রথিত হয়ে উপমা-প্রতিপত্তিকর হলে **তুল্যযোগিতা** হয়।

উদাহরণ :

(৴০) সানে বান্ধা হিয়া মোর পাষাণে বান্ধা প্রাণ

—এখানে হিয়া এবং প্রাণ দুই প্রস্তুত এক ধর্মের দ্বারা যুক্ত।

(৵০) জন জামাই ভাগনা তিন নয় আপনা।

—তিন প্রস্তুত এক অনাত্মীয়তা ধর্মে যুক্ত।

(৶০) তিন তরী উল্কা বায়ু শীঘ্রগামী যেবা।
বেগ শিখিবারে বেগে সঙ্গে যাবে কেবা॥

—প্রথমাংশে অপ্রস্তুতগুলির একধর্মসম্বন্ধ। অতিশয়োক্তি-সংকর।

(।০) দেহ ভেঙে দিল জোলো দুধ আর এই জোলো বৈশাখ।

—দুই প্রস্তুত এক ধর্মান্বিত।

(।৴০) চম্পক শোণকুসুম কনকাচল জিতল গৌরতনু লাবণি রে।

—তিনটি অপ্রস্তুতের একধর্মসম্বন্ধ। ব্যতিরেক-সংকর।

প্রস্তুত এবং অপ্রস্তুতের তুল্য গুণ ক্রিয়া যোগে **তুল্যযোগোপমা** প্রাচীনদের সম্মত ছিল, যেমন—

নীলকণ্ঠ করেছেন পৃথ্বীরে নির্বিষ;
আর তুমি? তুমি তারে করেছ নির্মল।

নব্য আলংকারিকদের মতে শুধু প্রস্তুত অথবা শুধু কাল্পনিককে সমধর্মে যুক্ত করতে হবে।

দীপক

লক্ষণ : প্রস্তুত এবং অপ্রস্তুত উভয়কেই এক পদ বা ধর্মের দ্বারা যুক্ত করলে দীপক হয়।

একটি পদ একটি বাক্যে বা প্রস্তুতে যুক্ত থেকে অন্য বাক্যের বা অপ্রস্তুতেরও উপকারক হয়। যেমন, প্রাসাদে সংলগ্ন দীপ পথকেও আলোকিত করে।

উদাহরণ :

(/০) সাপিনী বাঘিনী সতা পোষ নাহি মানে।

'সতা' প্রস্তুত এবং সাপিনী, বাঘিনী অপ্রস্তুত একত্র গ্রথিত হয়েছে।

(৵০) ঠাণ্ডাজল, হিম এবং হাস্য-পরিহাস তাঁহার একেবারেই সহ্য হয় না।

(৶০) দখিনা বাতাস বৃক্ষের জীর্ণপত্র উড়াইয়া লইয়া যায় ও কামিনীদের মানভঙ্গ করে।

(।০) ভদ্রলোকের বাড়ীর জানালার ভিতর দিয়া কেবল পতঙ্গ এবং উন্মাদ যুবকদের হৃদয়ের পথ ছিল মাত্র।

(।/০) ঊর্ধ্বশ্বাসে রথ-অশ্ব চলিয়াছে ধেয়ে
ক্ষুধা আর সারথির কষাঘাত খেয়ে।

(।৵০) নিমেষে নিমেষে যেথা ঝ'রে পড়ে যায়
দিবাতাপে শুষ্ক ফুল, দগ্ধ উল্কা তারা,
জীর্ণ কীর্তি, শ্রান্ত সুখ, দুঃখ দাহহারা।

একটি কারকে বহু ক্রিয়া অন্বিত হলেও দীপক অলংকার হবে। যেমন—

(।৶০) প্রতিবর্ষা দিয়ে গেছে নবীন জীবন
তোমার কাব্যের 'পরে, করি বরিষণ
নববৃষ্টিবারিধারা, করিয়া বিস্তার
নবঘনস্নিগ্ধ ছায়া, করিয়া সঞ্চার
নব নব প্রতিধ্বনি জলদমন্দ্রের।

(॥০) হিল্লোলিয়া মর্মরিয়া
কম্পিয়া স্খলিয়া বিকিরিয়া বিচ্ছুরিয়া
শিহরিয়া সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে

মালাদীপক

এক ধর্মের দ্বারা বহু ধর্মীর পরপর সম্বন্ধ হলেও দীপক হবে। তবে কেউ কেউ একে মালাদীপক নামে নূতন অলংকার ব'লে পরিগণনা করেছেন। যেমন—

(৵০) বিষয়-শূন্য নরবর, বারিশূন্য সরোবর, বস্ত্রশূন্য বেশ।
দেবীশূন্য মণ্ডপ, কৃষ্ণশূন্য পাণ্ডব, গঙ্গাশূন্য দেশ॥

(৶০) দেবতা ভুলিতে পারে সে পাপ আমার।
আমি কি ভুলিতে পারি সে দৃষ্টি তাহার?

(৶৵০) অতিশয় দর্পে লঙ্কায় হত হয় দশাস্য।
অতিশয় হাস্য হ'লে রোদন অবশ্য॥
অতিশয় সন্তানে সগর-বংশ শূন্য।
অতিশয় গৌরবে গরুড়ের দর্প চূর্ণ॥

(।০) তীরে উত্তরিল তরী, তারা উত্তরিলা।

(সাদৃশ্যেতর বিষয়ে অলংকার)

(ক) বিরোধমূল

বিরোধ বা বিরোধাভাস

লক্ষণ : এক বা একাধিক বাক্যার্থে বস্তুতঃ বিরোধ না থাকলেও যদি বাহ্যতঃ বিরোধ দেখানো হয় তাহলে যে চমৎকারিত্বের উদয় হয় তা বিরোধালংকারের বিষয়। এটি ইংরেজি Epigram-এর তুল্য অলংকার—an apparent contradiction in language with some important meaning underneath.

অর্থে বিরোধের পর্যবসান থাকতে হবে, নতুবা দুই বিরুদ্ধ বস্তুর সমাবেশে তা বিষমালংকার হয়ে পড়বে।

উদাহরণ ঃ

(৴০) কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই।

—না-মরা ব্যাপারটি ম'রে প্রমাণ করা যায় কী করে এই বিরোধ। আবার, মরল অথচ মরল না এই ভাষাগত বিরোধ। এর পর্যবসান হ'ল কাদম্বিনীর পূর্বেই মৃত হওয়ার গুজবে।

(৵০) অচক্ষু সর্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান
অপদ সর্বত্র গতাগতি।

এখানে অর্থতঃ পর্যবসান এই যে ঈশ্বর বিভু ব'লে তাঁতে এরকম সম্ভব। অথবা, তাঁর প্রাকৃত নয়ন কর্ণাদি না থাকলেও অপ্রাকৃত নয়ন কর্ণাদি আছে।

(৶০) কহিবার যোগ্য নয় তথাপি বাউলে কয়
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায়।

সাধারণ দৃষ্টিতে বিরোধ, কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুতত্ব পরিগ্রহ করলে পর্যবসান।

(।০) নয়ন-সম্মুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই

—নয়নের=সর্বেন্দ্রিয়ের=মর্মের এই অর্থে বিরোধের পর্যবসান।

(।৴০) যত ব্যথা পাই—তত গান গাই, গাঁথি যে সুরের মালা,
ওগো সুন্দর! নয়নে আমার নীল কাজলের জ্বালা।

—সমাধান এই যে নিবিড় বেদনার অনুভূতি থেকেই মহৎ কাব্যের জন্ম। একই কথা—Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. (Epigram)

(।৵০) প্রাপ্তি হ'তে বুঝিয়াছি পাব যা তা মিছে,
পাব না যা তাই সত্য, ছুটি তারই পিছে।

(।৶০) সবে গুণ যত দোষ মিথ্যা ক'য়ে সারে।

(॥০) বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা।......
নীর না ছুঁইবি সিনান করিবি
ভাবিনী ভাবের দেহা।
(তোরা) না হইবি সতী না হবি অসতী
থাকিবি লোকের মাঝে।

—সহজিয়াদের ধর্মে ইন্দ্রিয়াসক্তি ত্যাগ করে অন্তরে নিষ্কাম প্রেমের অনুসরণ করা হয়—এই অর্থে পর্যবসান।

(॥৴০) শিখিপুচ্ছ গুঞ্জাবেড়া মনোহর যার চূড়া
সে মস্তক কেশশূন্য দেখি।
যার বাঁকা চাহনিতে মোহে রাধিকার চিতে
এবে প্রেমে ছলছল আঁখি॥
সদা গোপী সঙ্গে রহে নানা রঙ্গে কথা কহে
এবে নারী নাম না শুনয়ে।
ভুজযুগে বংশী ধরি আকর্ষয়ে ব্রজনারী
সেই ভুজে দণ্ড কেন লএ॥

—বিরোধের সমাধান রাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার ক'রে কৃষ্ণের গৌররূপে অবতার গ্রহণের তাৎপর্যে।

(৸৵০) আপনার যারা আছে চারিভিতে
পারিনি তাদের আপন করিতে
তারা নিশিদিন জাগাইছে চিতে বিরহ-বেদনা সঘনে।

পর্যবসান এই যে, কবি বিশ্বের তাবৎ বস্তুকে আপনার করে নিতে চান।

(৸৶০) মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া

(৶০) আমি স্থির জানিতাম, সংসারের কোন কাজেই যে হতভাগ্যের বুদ্ধি খোলে না, সে নিশ্চয়ই ভালো বই লিখিবে।

(৶/০) মরণের কালি হেথা পায় না আমল,
শ্মশান, ভীষণ তবু নয়।

—পর্যবসান এই যে সৌন্দর্যের লীলাভূমি তাজমহল সম্বন্ধে একথা বলা হয়েছে।

(৶৵০) নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

(৶৶০) গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।

বিভাবনা

লক্ষণ : কারণ ব্যতিরেকে কার্যোৎপত্তি ঘটার চমৎকারিতায় **বিভাবনা** অলংকার হয়।

উদাহরণ :

(/০) গোলাপ ফোটে না, তবু গোলাপের বাস
ঘিরে এরে চিরনিশিদিন।

(এখানে বিভাবনার সঙ্গে বিরোধের সন্দেহ-সংকর ঘটছে।)

(৵০) পান বিনে ঠোঁট রাঙা

(এটি 'বিনোক্তি'র উদাহরণ রূপেও গৃহীত হওয়ার যোগ্য।)

(৶০) শাশুড়ী ননদী নাহি নাহি তোর সতা।
কার সনে কলি করি চক্ষু কৈলি রাতা॥

(।০) কাজলবিহীন সরল নয়নে মেঘের ছায়া,
আসব কোথায়, মনোমাঝে নব কী মত্ততা।
পুষ্পশরের পুষ্পবিহীন শাণিত বাণ,
প্রসাধনহীন কিশোরীর তনু কী শোভা ধরে।

(সংস্কৃত থেকে)

(।৴০) নাই রাজা পুরূরবা
তবু ধরা মনোলোভা।

বিশেষোক্তি

লক্ষণঃ (প্রসিদ্ধ) কারণ থাকলেও যদি তদনুরূপ কার্যের উৎপত্তি না ঘটে তাহলে **বিশেষোক্তি** হয়।

এটি বিভাবনার বিপরীত। অপর বিশেষ কোনো কারণ আছে এইটি অর্থতঃ অনুমান করা যায়। অনেক সময় বিরুদ্ধ কার্য দিয়েও অনুরূপ কার্যাভাব সূচনা করা হয়।

উদাহরণঃ

(৴০) সহস্র শত্রুর নিকট যে অবিচলিত, দুইটি চকিত হরিণনেত্রের নিকট সে পরাভূত।

তাঁর বীরত্ব থাকা সত্ত্বেও তদনুরূপ কার্য হচ্ছে না। 'পরাভূত' শব্দের অর্থ 'অবিচলিত নয়'।

(৵০) কত মধু-যামিনী রভসে গোঁয়ায়লুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখলুঁ
তভো হিয় জুড়ন না গেল॥

'মধু যামিনী মিলিতাবস্থায় যাপন' এবং 'হৃদয়ে হৃদয় রক্ষা' হ'ল কারণ, কেলির স্বরূপ উপলব্ধ না হওয়া এবং হৃদয়ের শীতলতার অপ্রাপ্তি হ'ল কার্য। কারণ-অনুযায়ী কার্য হ'ল না। বিরোধ-সংকর।

(৶০) যদি করি বিষপান তথাপি না যায় প্রাণ
অনলে সলিলে মৃত্যু নাই।
সাপে বাঘে যদি খায় মরণ না হবে তায়
(চিরজীবী করিল গোসাঁই) ॥

এখানে বিষপান, অগ্নিদাহ, জলনিমজ্জন প্রভৃতি মৃত্যুর কারণ থাকা সত্ত্বেও মৃত্যু ঘটছে না ॥ অতএব বিশেষোক্তি। ইংরেজি মতে Inuendo.

'কাব্যশ্রী' গ্রন্থের লেখক অকারণে এটিকে বিশেষোক্তি থেকে বাদ দিতে চান। 'চিরজীবী করিল' ইত্যাদিতে কারণান্তর ব্যক্ত হয়েছে মাত্র, এবং বলা যেতে পারে কাব্যলিঙ্গ হয়েছে। এইদিক থেকে অলংকারটি কাব্যলিঙ্গের সঙ্গে সংকর হয়ে পড়ে। কিন্তু, বিশেষোক্তি হচ্ছে না একথা ঠিক নয়।

(।০) সুন্দরী সে প্রকৃতিরে জানি আমি—মিথ্যা সনাতনী!
সত্যেরে চাহি না তবু, সুন্দরের করি আরাধনা।

—প্রকৃতির সৌন্দর্যকে মিথ্যা জানা সত্ত্বেও তারই আরাধনা করায় অনুরূপ কার্যাভাব।

(।⁄০) নদীর ওকূল কালো হয়ে আসে শ্রাবণ-সন্ধ্যাবেলা,
তখনো বন্ধু, ছিপটি তোমার সম্মুখে থাকে ফেলা।

—সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেও মাছধরার প্রয়াসের বিরাম নেই। কারণান্তর বিভাব্য।

(।৵০) রসের খোলা খাপরা-রাঙা ভাপরা লাগে গায়;
কেউ কি তবু সরবে? বরং এগিয়ে যেতেই চায়।

(।৶০) ফুলশরধারী একা সমরে প্রবল।
তনু হীন হ'ল তার, নাহি গেল বল॥

—তনুহীনত্ব কারণ হলেও বলহীনত্ব রূপ কার্যের অভাব ঘটেছে।

(॥০) কৌমার মোর হরে নিল যেই, সে-ই বর, সেই চৈত্ররাত্তি;
তেমনি ফুল্ল মালতী-গন্ধ, কদম্ব-বায়ু বহিছে মাতি;

আমিও তো সেই !—তবু সেদিনের সে-স্মরতলীলা কিসের তরে
রেবাতটে সেই বেতসীর মূলে আজিও চিত্ত আকুল করে !

—পতি নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও উৎকণ্ঠার উদয়।

(॥৵০) ওহে ত্রিভুবনপতি, বুঝি না তোমার মতি,
কিছুই অভাব তব নাহি ;
হৃদয়ে হৃদয়ে তবু ভিক্ষা মাগি ফির প্রভু
সবার সর্বস্বধন চাহি।

—ভিক্ষা না করার যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষা করার উদ্ভব হচ্ছে। কারণান্তর অনুমেয়।

বিষম

লক্ষণ : **কারণ** থেকে **কার্যকে** ভিন্নগুণ দেখিয়ে, প্রারব্ধ কর্মের বিপরীত ফলসূচনা ক'রে, দুই পরস্পর পৃথক্ বা বিরুদ্ধ বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে বিসদৃশ ঘটনা বর্ণনের যে চমৎকারিতা সেগুলি বিষমালংকারের বিষয়।

বিরোধ অলংকারের সঙ্গে এর পার্থক্য এখানে যে, বিরোধের মত এতে আপাত-বিরোধ এবং অর্থতঃ পর্যবসানের চমৎকারিতা দেখানো হয় না। এখানে যথার্থতঃ দুই বিসদৃশ বা বিরুদ্ধ বস্তুর সম্বন্ধ-স্থাপন করা হয় কবিকল্পনা-বলে। ন্যায়ের মতে কারণের গুণ কার্যে সংক্রমিত হয়, এখানে তার বিপরীত।

উদাহরণ :

(৴০) জলেতে নিভায় জ্বালা সর্বলোক কয়।
এ জল দেখিয়া জ্বালা দশগুণ হয়॥

—সরোবরের সৌন্দর্যের কামোদ্দীপকতা বর্ণিত হচ্ছে। কারণ-গুণ থেকে কার্যের গুণ বিপরীত।

(৵০) তাঁর কৃষ্ণ তরবারি অকলঙ্ক শুভ্র যশ সমুৎপন্ন করছে।

—এখানেও কারণ-কার্যের গুণবিরোধ।

(৶৹) মনে নর কাল-ফণী-নশ্বর-দংশনে ;—
কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে দুলিছে যে ফণী
মণিময়, হেরি তারে কামবিষে জ্বলে
পরাণ !

—ফণীর দংশনের কার্যটি ভয়ংকরতা-সমুৎপাদক। এই কারণের বিরুদ্ধতা দেখানো হয়েছে পরবর্তী কার্যে—কাম-সমুৎপাদকতায়।

(।৹) কাল-রূপা দিগম্বরী হৃদিপদ্ম করে আলো রে।

(।⁄৹) সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ সুখায়ব
কো দূর করব পিয়াসা !

কারণে পিপাসার পরমা নিবৃত্তি, কার্যে কণ্ঠের শুষ্কতা (পিপাসার অ-নিবৃত্তি)।

(।৵৹) গ্রাসিয়া নগর গ্রাম হাসিতেছ দশ দিক্ ভরি

(।৶৹) ভ্রম বারিবারে করিনু শ্রম।
শ্রম বৃথা হইল ঘটিল ভ্রম ॥

—এখানে প্রারব্ধ কর্মের বিপরীত সূচনার চমৎকৃতি।

(॥৹) কোথায় বাসর ঘর ! আমার সেই বিবাহের বেশ কোথায় ! নিজের ভিতর হইতে খটখট শব্দে জাগিয়া দেখিলাম, আমাকে লইয়া তিনটি বালক অস্থিবিদ্যা শিখিতেছে।

—উদ্দিষ্ট অভিপ্রায়ের বিফলতা এবং বিরুদ্ধ ঘটনার সমাবেশ।

(॥⁄৹) সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল ॥

—অভিপ্রেত ফলোদয়ের বিপরীত ফলোৎপত্তি রূপ বিরুদ্ধ বিষয়ের সংস্থাপনের চারুতা।

(॥৵৹) দহ বুলি ঝাঁপ দিলোঁ। সে মোর সুখাইল
মোঞ নারী বড় আভাগিনী ॥

(॥৵৹) অধরা বধূর অধরের ভুলে তেলাকুচা তুলে চুমি গো।

—ভ্রান্তিমানের সঙ্গে সংকর।

(৸৹) এই সধবা রমণী যখন অসহ্য হৃদয়ভার লইয়া তাহার নূতন বৈধব্য-শয্যার উপরে আসিয়া পড়িল তখন গলির অপর প্রান্তে একজন শৌখিন যুবা বেহাগ রাগিণীতে মালিনীর গান গাহিতেছিল।

—দুই পরস্পরবিরুদ্ধ বস্তুর সম্বন্ধ প্রদর্শনরূপ বিষম।

(৸৴৹) মেঘে মেঘে বাজে গুরুক্রন্দন—বনে বনে শিখী নাচে ;
বুক ফেটে তার ঝরে আঁখিজল—তৃষিত চাতক বাঁচে।
জ্বালিয়া জ্যোৎস্না-মরীচিকা বুকে মরুচন্দ্র সে জাগে,
পিয়াসী চকোর, তাপিত পাপিয়া তারি পাশে সুধা মাগে।

—এখানে এক পক্ষে আনন্দ অপর পক্ষে দুঃখ এই দুই বিরুদ্ধ বস্তুকে একত্র সম্বন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়েছে।

(৸৶৹) কোথা উর্বশী, কোথা সুধাশশী,—হায় রে দুঃস্বপন,
মরণঞ্জয় মরণ পিয়ে রে আকণ্ঠ আমরণ !

(৸৵৹) কোথা ব্রজবালা, কোথা বনমালা, কোথা বনমালী হরি,
কোথা হা হন্ত চিরবসন্ত, আমি বসন্তে মরি।

(১৲) বাহিরে তখনো ঝরিছে বর্ষা, থেকে থেকে ডাকে দেয়া,
ভিতরে আমার শয়ন-শিয়রে গন্ধ ছড়ায় কেয়া !

(১৴৹) শহরে বরষা ঝরে,
মেঘদূত ঘরে ঘরে,
গাঁয়ে মাঠে কাঠ ফাটে এ বড় ধাঁধা।

(১৶৹) সূক্ষ্ম সোনার সুতায় বোনা নাই সে গদি তোমার হায় !
আজকে তোমার বুকে পাথর, মাথায় পাথর, পাথর পায়।

(১৵৹) এক কর্ণ বলে আমি কৃষ্ণনাম শুনিব।
আরেক কর্ণ বলে আমি বধির হয়ে রব॥

(১।৹) পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়া মুখ হেরইতে তত সুখ ভেল॥

—উপরের কয়েকটি উদাহরণে সর্বত্র বিরুদ্ধ বস্তুর সম্বন্ধ-বন্ধনের বিষম।

(১।/০) সাধিয়া সকাম শাস্ত্র আজিকে নিষ্কাম,
নটরাজে মগ্ন মন ছাড়িয়া নাটিকা,
'ছন্দোবদ্ধ গ্রন্থগীত' সকলি বিরাম,
ললাট-নয়নে হেরি দেবী ললাটিকা।

—কারণ কার্যের বিরুদ্ধতা এবং বিরুদ্ধ অবস্থার সমাবেশ-বৈচিত্র্য।

(১।৵০) আমরা তো জানি স্বরাজ আনিতে
পোড়া বার্তাকু এনেছি খাস।

—অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ কার্যোৎপত্তি।

অসংগতি

লক্ষণ: কারণকে একস্থানে এবং কার্যকে ভিন্নস্থানে বর্ণনা করায় যে চারুত্ব তা অসংগতি অলংকারের বিষয়।

উদাহরণ:

(/০) সো মুখ চন্দ নয়নে নাহি হেরলুঁ
নয়ন-দহন ভেল চন্দ।
সোই মধুর বোল শ্রবণে না শুনলুঁ
মধুকর ধ্বনি ভেল দন্দ ॥[1]

—কারণ কৃষ্ণে, কার্য চন্দ্রে এবং মধুকরে।

(৵০) পূর্বাকাশে গান গাহে সে, পশ্চিমে তার প্রতিধ্বনি।

(৶০) তাদের গাছে গায় যে দোয়েল পাখি
তাহার গানে নাচে আমার বুক।

(খ) ব্যঞ্জনামূল ও ন্যায়মূল

অপ্রস্তুত-প্রশংসা

(প্রশংসা শব্দের অর্থ বর্ণনা)

লক্ষণ : অপ্রস্তুত অর্থাৎ উপমান বা অনভিপ্রেত বস্তুর বর্ণন থেকে যদি প্রস্তুত অর্থাৎ অভিপ্রেত বস্তুটি ব্যঞ্জনাক্রমে প্রতীত হয় তাহলে অপ্রস্তুত-প্রশংসা হয়।

অপ্রস্তুত-প্রশংসায় অপ্রস্তুত এবং প্রস্তুত বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, দুটিই সমানধর্মযুক্ত অর্থাৎ সাদৃশ্যযুক্ত হতে পারে, কার্য-কারণ বা সামান্য-বিশেষ ভাবাপন্ন হতে পারে। এই অলংকারটি যেখানে সাদৃশ্য-মূলক অথবা সামান্য-সামান্য বা বিশেষ-বিশেষ ভাবাপন্ন সেখানে ঠিক সমাসোক্তির বিপরীত। কারণ, সমাসোক্তিতে প্রস্তুত থেকে অপ্রস্তুত ব্যঞ্জনাগম্য, অপ্রস্তুত-প্রশংসায় অপ্রস্তুত থেকে প্রস্তুত ব্যঞ্জনাগম্য।

উদাহরণ :

(/০) অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে॥

—এখানে বিশেষ বা উপমান কাক ও কোকিলের দ্বারা উপমেয় জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের পথিক ব্যঞ্জিত হচ্ছে। রূপক অপ্রস্তুত-প্রশংসাটিকে পুষ্ট করছে। এছাড়া দুই বিরুদ্ধ চরিত্রের বর্ণনাতে বিষমালংকারেরও সংকর ঘটেছে।

(৵০) যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হারাল ধারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।

—এখানেও অপ্রস্তুত বিশেষ ফুল ও নদী থেকে প্রস্তুত বিশেষ উদীয়মান তরুণ ধ্বনিত হচ্ছে।

(৶০) কে দেয় বিলাতি লিলি-নলিনীতে উপমা ?
দেশে যে কুমুদ আছে আসুক তাহারি কাছে
তখন দেখিব বুঝে কার কত গরিমা।

—'বিলাতি লিলি-নলিনী' থেকে ইংরেজ রমণী ও 'কুমুদ' থেকে 'বঙ্গনারী' প্রস্তুত প্রতীয়মান হচ্ছে।

(৷০) মাতঙ্গ পড়িলে দলে পতঙ্গেতে কি না বলে
কমলের বনে গেলে কাঁটা ফোটে পায়।
(তা ব'লে কি ফাঁকে ফাঁকে পা বাড়ানো যায় ?)

—এখানে 'মাতঙ্গ' বলতে প্রেমিক নায়ক এবং পতঙ্গ বলতে ক্ষুদ্রচেতা, 'কমলের বন' বলতে 'প্রেমসম্ভোগ' এবং কাঁটা অর্থে 'দুঃখ' ব্যঞ্জিত হয়েছে। শেষ চরণে অপ্রস্তুত-প্রশংসা এবং কাব্য-লিঙ্গের সংকর ঘটেছে।

(৷৴০) নীর লোভে মৃগী পিয়াসে ধাইতে
ব্যাধ শর দিল বুকে।
জলের শফরী আহার করিতে
বঁড়শী বিঁধিল মুখে!
নব ঘন হেরি পিয়াসে চাতকী
চঞ্চু পসারল আশে।
বারিক বারণ করল পবন
কুলিশ মিলল শেষে॥

—এখানে বিভিন্ন অপ্রস্তুত এবং তার ধর্ম থেকে প্রস্তুত নায়িকা এবং তার বিড়ম্বনা ব্যঙ্গ্য।

(৷৵০) গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল।
ভাঙিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল॥

—এখানে ভাঙাগড়ার সামান্য অপ্রস্তুতের বিন্যাস নায়িকার বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের বিশেষ অবস্থাকে ব্যঞ্জিত করছে।

(।৶০) যে উপন্যাস লেখে তাহার কোথাও বাধা নেই ; দ্বারীরাও দ্বার রোধ করে না, অসূর্যম্পশ্যা রমণীরাও আপত্তি প্রকাশ করে না।

—এখানে অপ্রস্তুত সামান্য বিষয় থেকে প্রস্তুত লেখক এবং তাঁর বিশেষ গল্পকথা ব্যঞ্জিত হচ্ছে।

(॥০) লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায়।
পশু পক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায় ॥

—এখানে অপ্রস্তুত সামান্য থেকে প্রস্তুত বিশেষ (বর্ণনীয় ব্যক্তি) প্রতীত।

(॥৴০) চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পারো গোবি সাহারার বুকে ?

—মেঘ ধার দেওয়া যেতে পারে না, আর গোবি সাহারার বুকই বা কী বস্তু ? সুতরাং অপ্রস্তুতের সাদৃশ্যে প্রস্তুত অভাবহীন মানুষ এবং প্রস্তুত রিক্ত মানুষ প্রতীয়মান।

(॥৵০) জ্যৈষ্ঠ দুপুরে শ্রেষ্ঠ শহরে পথ চলি আর ভাবি, –
কত না বকুল দিল তার ফুল মিটাতে নরের দাবি।

এখানে 'কত না বকুল' ব্যঙ্গ্যার্থে নৈসর্গিক সুন্দর বস্তুকে ইঙ্গিত করছে।

(॥৶০) (ছাড় আই বলা জানি সকল।)
গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল ॥
বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ ॥

অপকৃতা নারীর আক্ষেপ (মালিনীর)। অপ্রস্তুত সামান্য থেকে প্রস্তুত নিজাবস্থা ব্যঞ্জিত।

(৸০) আজি এ কলির দিনে সবি অভিনব !
অন্নপূর্ণা আছে বসি ভিক্ষাপাত্র ধরি,
রিক্তহস্তে, শূন্যগাত্রে, বিহীন-বিভব ;
সর্ব অঙ্গ হতে তারি সর্বভূষা হরি,
চিরভিক্ষু দিগম্বর সেজেছে সম্রাট !

—ব্যঞ্জনামূলক। 'অন্নপূর্ণা' থেকে নারী বা ভার্যা এবং 'দিগম্বর' থেকে পুরুষ বা স্বামী ব্যঞ্জনায় আসছে। প্রস্তাবিত ব্যাপারটি হ'ল কোনও স্বামী তার স্ত্রীর সর্বস্ব আদায় ক'রে তাকে রিক্ত ক'রে অন্যত্র বিলাসবৈভবে দিন কাটাচ্ছে।

(৮√০) চন্দনতরুর বনে বাঁধিল যে বাণীর বসতি,
দুর্লভ চন্দনকাষ্ঠে কুঁড়ে-বাঁধা শিখেছে সম্প্রতি
অকিঞ্চন কবিজন গৌড়ে বঙ্গে আশীর্বাদে যাঁর—

প্রস্তাবিত বিষয় হ'ল রবীন্দ্রানুজ বঙ্গকবিগণ তাঁর অতুলনীয় ভাষানির্মিতি থেকে আদর্শ নিয়ে কোনপ্রকারে কাব্য (কুটির) গড়ে তুলছেন। অপ্রস্তুত 'চন্দনকাষ্ঠে কুঁড়ে বাঁধা শেখা' প্রভৃতির প্রতিপাদ্য তা-ই। তাছাড়া 'চন্দন তরুর বনে' 'চন্দন তরুর কাষ্ঠে' ইত্যাদি অপ্রস্তুতের পার্থক্যের দ্বারা প্রস্তুত অন্যান্য কবিদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের উৎকর্ষও প্রতিপন্ন হয়েছে।

(৮৵০) দানে বারি নদীরূপা বিমলা কিঙ্করী;
যোগায় অমৃতফল পরম আদরে
দীর্ঘশিরঃ তরুদল, দাসরূপ ধরি;
পরিমলে ফুলকুল দশ দিশ ভরে;
দিবসে শীতল-শ্বাসী ছায়া বনেশ্বরী,
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা ক্লান্তি দূর করে।

—এখানে কার্যসমূহ থেকে হিমালয়ের তথা বিদ্যাসাগরের মাহাত্ম্য রূপ কারণ কথিত।

(৮৶০) বধূর মধুর খনি মুখ-শতদল।
সলিলে ভাসিয়া যায় চক্ষু ছলছল॥

—ঐরূপ কার্য থেকে গঞ্জনারূপ কারণ প্রতীত।

(৯) বহুদিন হ'ল কোন্ ফাল্গুনে ছিনু ষবে তব ভরসায়।
এলে তুমি ঘন বরষায়॥

—কার্য থেকে কারণ—বসন্ত অপেক্ষা বর্ষার আকর্ষণ-ক্ষমতা প্রতীত।

(১৴০) এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি।
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

—সামান্য কথন থেকে বিশেষ নিজকথা ব্যঙ্গ্য। অর্থান্তরন্যাসের সঙ্গে সংকর।

(১৵০) জানিয়ো কন্যা, আলেখ্য নাহি রয়
সরোবর বুকে নিত্য অনশ্বর,
দর্পণ-'পরে বহু ছায়া সঞ্চরে—
অভিমান নাহি সাজে দর্পণ-'পর।

— অপ্রস্তুত সরোবর, দর্পণ প্রভৃতি দ্বারা নায়কের হৃদয় ব্যঙ্গ্য।

(১৶০) ধরণী জন্মিল হেথা কী পুণ্য করিয়া।
মোর বন্ধু যায় যাতে নাচিয়া নাচিয়া॥
নূপুর হৈয়াছে সোনা কী পুণ্য করিয়া।
বন্ধুর চরণে যায় বাজিয়া বাজিয়া॥

—'আমি সে পুণ্য করিনি' এরকম বৈধর্ম্যের দ্বারা শ্রীমতী নিজকে নিন্দা করছেন। সামান্য থেকে বিশেষ প্রতীত।

(১৷০) রাত শেষ হ'য়ে সূর্য উঠবে কবে?

—প্রস্তুত 'সামান্য' দুঃখময় সমাজব্যবস্থা কেটে গিয়ে নূতন জীবন কবে আসবে এই ব্যঞ্জনা।

(১৷৴০) নাহি রান্ধে নাহি বাড়ে নাহি দেয় ফু।
পরের রান্ধন খায়্যা চাঁদপানা মু॥

—এখানে রাঁধা-বাড়া প্রভৃতি বিশেষ অপ্রস্তুত অবলম্বনে 'সামান্য' যাবতীয় সাংসারিক কর্ম থেকে বর্ণনীয় সপত্নীর মুক্তি প্রতীত।

ব্যাজস্তুতি

লক্ষণ : স্তুতিচ্ছলে নিন্দা অথবা নিন্দাচ্ছলে স্তুতি যদি বিশেষ চমৎকারজনক হয় তাহ'লে ব্যাজস্তুতি হয়।

উদাহরণ :

(১০) বন্ধু! তোমরা দিলে নাক দাম,
রাজ সরকার রেখেছেন মান!
যাহা কিছু লিখি অমূল্য ব'লে অ-মূল্যে নেন!······

—স্তুতিচ্ছলে নিন্দা। নজরুল-উক্তি। ইংরেজি মতে এখানে Irony. উপাত্ত বিষয়ের বিপরীত ব্যঞ্জিত হলে Irony হয়।

(৶০) লোক-লজ্জা পরিহরি, ব্রজাঙ্গনার বসন হরি,
বৃক্ষেতে উঠেছ হরি! এমন কি আর কেউ পারে॥
ক্রোধ যেমন তব চিত্তে, এত ক্রোধ কে পারে করতে,
স্ত্রীহত্যে, গোহত্যে গোকুলে হয়ে গেল!
লোভী যেমন তুমি কৃষ্ণ! এমন নাই কেউ অপকৃষ্ট,
রাখালের উচ্ছিষ্ট খাও মিষ্ট হ'লেই হ'ল॥

—নিন্দাচ্ছলে স্তুতি। ইংরেজি মতে গুপ্ত অর্থ সংকেতের জন্য Inuendo.

(৵০) ভাঙ্ খেয়ে শিব সদাই মত্ত, কেবল তুষ্ট বিল্বদলে।

—নিন্দাচ্ছলে স্তুতি।

(।০) অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন॥
কু-কথায় পঞ্চমুখ, কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥

—শ্লেষ-নির্ভর নিন্দাচ্ছলে স্তুতি।

চন্দ্রিকা-কার কর্তৃক উদাহৃত—

'কী সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে প্রচেতঃ'—

এই অংশে সমুদ্রের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করা হয়েছে, এখানে ব্যাজস্তুতি অলংকারের চিহ্ন নেই, ইংরেজি মতে Irony হতে পারে।

অর্থান্তরন্যাস

লক্ষণ : সামান্যের দ্বারা বিশেষ অথবা বিশেষের দ্বারা সামান্যের চমৎকারজনক সমর্থন থাকলে অর্থান্তরন্যাস হয়।

সামান্য-বিশেষভাবের সঙ্গে কখনো কখনো কার্য-কারণ সম্বন্ধও বিজড়িত থাকে। কিন্তু সেজন্য কার্য-কারণ-সমর্থকতাকে পৃথক ক'রে গ্রহণ করার তাৎপর্য দেখি না। সমর্থন কখনো বৈধর্ম্যের দ্বারাও হয়ে থাকে। দৃষ্টান্তের সঙ্গে এর পার্থক্যটি অনুধাবন করার বিষয়। দৃষ্টান্ত সাদৃশ্যমূলক, উপমাশ্রেণীর অলংকার। এটি সমর্থনমূলক।

উদাহরণ :

(৴০) পরি দুপণের কাচা ভানিত আমার ভাচা
সেই বেটা হবে দেশমুখ ?
নফরের হাতে খাণ্ডা বহুড়ীর হাতে ভাণ্ডা
পরিণামে দেই অতি দুখ ॥

সামান্য নফরের ইত্যাদি দ্বারা প্রথম দুই চরণে প্রস্তাবিত হীন ব্যক্তির দেশমুখ (নেতা) না-হওয়া এই বিশেষ সমর্থিত।

(৵০) কলঙ্কেতে ভয় কোরো না বিধুমুখি!
মাতঙ্গ পড়িলে দলে পতঙ্গেতে কী না বলে,
কমলের বনে গেলে কাঁটা ফোটে পায়।
তা ব'লে কি ফাঁকে ফাঁকে পা বাড়ানো যায় ?

সামান্য মাতঙ্গাদির দলে পড়া, কমলের বনে যাওয়া প্রভৃতির দ্বারা বিশেষ নায়িকার 'কলঙ্ক-ভয় ত্যাগ করা' সমর্থিত। কারণের দ্বারা কার্যের সমর্থনরূপেও এটি গৃহীত হতে পারে। শেষ পঙ্‌ক্তিতে বক্রোক্তি।

(৶০) ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম। দুই বনস্পতি
মধ্যে রাখে ব্যবধান ; লক্ষ লক্ষ তৃণ
একত্র মিলিয়া থাকে বক্ষে বক্ষে লীন।

ঈর্ষ্যা ইত্যাদি সামান্য বক্তব্য বনস্পতি ইত্যাদি বিশেষ বক্তব্যের দ্বারা সমর্থিত।

(।•) হায়, বিধি বাম মম প্রতি।
কে কবে শুনেছে পুত্র ভাসে শিলা জলে,
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বাঁচে?

'বিধি বাম' ইত্যাদি বিশেষ 'জলে শিলা ভাসা' এবং 'মরি পুনঃ বাঁচা' এই সামান্যের দ্বারা সমর্থিত। কেবল শেষ দু'চরণের সামান্য অংশ দ্বারা রামের সমুদ্রবন্ধনাদিকে লক্ষ্য করলে অলংকার অর্থান্তরন্যাস হবে না, হবে অপ্রস্তুতপ্রশংসা।

(।/•) জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে?
চিরস্থির কবে নীর হায় রে জীবন-নদে?

'জন্মিলে মরিতে হবে' এই সামান্য 'চিরস্থির কবে নীর' ইত্যাদি বিশেষের দ্বারা সমর্থিত। রূপক-গর্ভ।

(।৵•) একা যাব বর্ধমান করিয়া যতন।
যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন॥

সামান্যের দ্বারা বর্ধমান যাত্রারূপ বিশেষ সমর্থিত। সামান্য এখানে কারণরূপে এবং বিশেষ 'একা যাব' কার্যরূপে অবস্থিত।

(।৶•) আমি যদি কথা কই একে হবে আর।
পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার॥

সামান্য-বিশেষ এবং কার্য-কারণ ভাব সমর্থনে একত্র গ্রথিত। বিশেষ সামান্যের দ্বারা সমর্থিত।

(॥•) পুরোধা আমার কেবা হইব ব্রাহ্মণ।
নীচ উত্তম হয় পাইলে কি বা ধন॥

বিশেষ সামান্যের দ্বারা সমর্থিত।

(॥/•) সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্ অবিবেকঃ পরমাপদাং পদম্।

বিশেষ সামান্যের দ্বারা এবং কার্য কারণের দ্বারা সমর্থিত।

(॥৵•) হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্বরতা কেন না শিখিবে?
গতি যার নীচ সহ নীচ সে দুর্মতি।

দ্বিতীয়াংশের সামান্যের দ্বারা প্রথমাংশের বিশেষ সমর্থিত।

(॥৶০) চিরসুখীজন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত-বেদন বুঝিতে পারে।
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে॥

'চিরসুখীজন' ইত্যাদি সামান্য 'কি যাতনা বিষে' ইত্যাদি বিশেষের দ্বারা সমর্থিত।

(৸০) যার যাহা বল
তাই তার অস্ত্র পিতঃ যুদ্ধের সম্বল।
ব্যাঘ্র সনে নখদন্তে নহেক সমান,
তাই বলি' ধনুঃশরে বধি তার প্রাণ
কোন্ নর লজ্জা পায়?

এখানে 'যার যাহা বল' ইত্যাদিতে সামান্য এবং ঐ সামান্য 'ব্যাঘ্রসনে' ইত্যাদি বিশেষের দ্বারা সমথিত হয়েছে।

শুধু 'যার যাহা বল' ইত্যাদি বাক্যটিকে অথবা শুধু পরবর্তী বাক্যটিকে নিলে অপ্রস্তুতপ্রশংসা হয়, কিন্তু দুটি বাক্যের সংযোগে অবশ্যই একে অর্থান্তরন্যাস ব'লে গ্রহণ করতে হবে। আবার সব মিলিয়ে যখন দুর্যোধনের নিজকার্য ব্যঙ্গ্য তখন অপ্রস্তুতপ্রশংসা হবে।

স্বভাবোক্তি

লক্ষণ: চারুত্বাতিশয়যুক্ত স্বভাবের প্রায় যথাযথ বর্ণনকে স্বভাবোক্তি বলে।

মনে রাখতে হবে, স্বভাবোক্তি চারুত্ব বা বক্রোক্তি ছাড়া নয়। যেমন তেমন স্বভাবোক্তি অলংকার ব'লে গণ্য হবে না। এ বিষয়টি প্রথম পর্বে সাধারণ সাহিত্য-তত্ত্ব আলোচনার সময় ব্যাখ্যাত হয়েছে।

উদাহরণ:

(৴০) চিকুর ফুরিছে বসন উড়িছে
পুলক যৌবন ভার।

বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
দুলিছে হিয়ার হার ॥

প্রিয়-সমাগম-প্রত্যাশিতা নায়িকার বর্ণনা। বাস্তব চারুতা।

(৵৹) সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল
সংবরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসাঞা পরে ॥

কয়েকটি নির্বাচিত কার্যের দ্বারা পূর্বরাগপ্রাপ্তা নায়িকার বর্ণনা।

(৶৹) মাল চেনাচেনি দর জানাজানি,
কানাকড়ি নিয়ে কত টানাটানি ;

—হাটের বর্ণন। বাস্তব হলেও নির্বাচিত চিত্রে মনোজ্ঞ।

(I৹) আমাবস্থার রাত্তির—অন্ধকারে ঘুরঘুট্টি—গুড়গুড় ক'রে মেঘ ডাকচে—থেকে থেকে বিদ্যুৎ নলপাচ্ছে—গাছের পাতাটি নড়চে না—মাটি থেকে যেন আগুনের তাপ বেরুচ্ছে—পথিকেরা এক একবার আকাশ পানে চাচ্চেন, আর হন হন করে চলচেন। কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করচে—দোকানীরে ঝাঁপতাড়া বন্ধ ক'রে ঘরে থাকার উজ্জুগ কচ্চে—গুড়ুম ক'রে নটার তোপ পড়ে গেল।

(I৴৹) নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা,
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে সাগর-বিহঙ্গেরা।
নারিকেলের শাখে শাখে ঝোড়ো হাওয়া কেবল ডাকে
ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে বইছে নগনদী —

(I৵৹) সন্ধ্যাতারা উঠে অস্ত গেল,
চিতা নিবে এল নদীর ধারে,
কৃষ্ণপক্ষের হলুদবর্ণ চাঁদ
দেখা দিল বনের একটি পারে।

কাব্যলিঙ্গ

লক্ষণ: বাক্যার্থে অথবা বস্তুতে যদি কোনো হেতু থাকে অথচ হেতুবাচক শব্দে তা উল্লিখিত না হয়, তাহলে কাব্যলিঙ্গ হয়।

হেতুটি বাচক শব্দে নির্দিষ্ট হ'লে চমৎকারিত্ব থাকবে না, সুতরাং অলংকারও হবে না।

উদাহরণ:

(৴০) হে নিরুপমা,
চপলতা আজ যদি কিছু ঘটে করিয়ো ক্ষমা।
এল আষাঢ়ের প্রথম দিবস,
বনরাজি আজি ব্যাকুল বিবশ,
বকুলবীথিকা মুকুলে মত্ত কানন-'পরে।
নব-কদম্ব মদির গন্ধে আকুল করে॥

—এখানে চপলতা ক্ষমা করার হেতু পরবর্তী বাক্যগুলিতে বিবৃত।

(৵০) ভালে যার সুধাকর গলায় গরল।
কপালে অনল আর শিরে গঙ্গাজল॥
সম যার সুধাবিষ হুতাশন-জল।
অন্যের যে অমঙ্গল তার সে মঙ্গল॥

—শেষ বাক্যের হেতু পূর্ব বাক্য তিনটিতে বলা হয়েছে। শিব-প্রসঙ্গ।

(৶০) আগে নাহি বুঝনু রূপ দেখি মজিনু
হৃদি কৈনু চরণ যুগল।
যমুনা সলিলে সই অব তনু ডারব
আন সখি ভখিব গরল॥

—দ্বিতীয়ার্ধের কার্যের হেতু প্রথমার্ধে।

(।০) এস, তোমা চিনিয়াছি শৈশব-সঙ্গিনি;
কূলে কূলে জলখেলা তোমাতে আমাতে,

ফুল-তোলা তারা-গোনা বাসন্তী নিশাতে,
ছাদেতে চাঁদিনী রাতে শৈশব-কাহিনী !

—প্রথম বাক্যার্থের হেতু পরবর্তী বাক্যার্থগুলিতে বিবৃত।

(।/০) এ নহে তন্দ্রা-অরণ্যছায়াচারী
ত্রস্ত হরিণ ; সংহরো তব শর।

—শরসংহার করার কারণটি চমৎকৃতির সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

অর্থাপত্তি

লক্ষণ : অর্থাপত্তি প্রমাণটি যদি চমৎকারিত্বের সঙ্গে কোথাও প্রযুক্ত হয় তাহলে এই অলংকার হবে।

—অর্থাপত্তি হ'ল প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের অতিরিক্ত মীমাংসকদের উদ্ভাবিত প্রমাণ বিশেষ। দর্পণকার এখানে দণ্ডাপূপিকা ন্যায়ের সাদৃশ্যে চমৎকারজনক প্রমাণের কথা তুলেছেন। 'মূষিক দণ্ডটি উদরসাৎ করেছে' এই কথা বলতে এর সঙ্গে যে অপূপ অর্থাৎ পিষ্টক গাঁথা ছিল তাও নিশ্চয়ই উদরসাৎ করেছে এই বোঝা যায়। দুষ্কর ও বড় ব্যাপারটা যদি ঘটে তাহ'লে সুকর ও ছোট ব্যাপার নিশ্চিতই ঘটবে এই বুদ্ধি অর্থাপত্তির মূলে।

উদাহরণ :

(/০) হাতী ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল।

(৵০) নাম-পরতাপে যার ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।

(৶০) অন্ন দিয়া অন্নপূর্ণা বাঁচাইলা প্রাণ।
বাঁচাও শিবের ক্রোধে নাহি দেখি ত্রাণ॥

—অন্ন দিয়ে যিনি প্রাণ রক্ষা করতে পারেন, শিবের ক্রোধে ত্রাণ করা তো তাঁর পক্ষে তুচ্ছ বিষয়, এই ধারণা।

(।০) তোমার মহিমা বেদে নাহি সীমা
অন্যজন কিবা জানে।

(।৶৹) কিসে তার অনুগ্রহ নিগ্রহ বা কিসে।
বুঝিতে কে পারে যার তুল্য সুধাবিষে ॥

অনুমান

লক্ষণ : চমৎকৃতিবিশেষ সহকারে যদি ব্যাপ্য থেকে ব্যাপকের জ্ঞানোদয় বুঝায় তাহ'লে অনুমান অলংকার হয়। অর্থাৎ প্রমাণটি চমৎকৃতির সঙ্গে বর্ণিত হ'লে অলংকার হবে, নতুবা ন্যায়ের দ্বিতীয় প্রমাণ মাত্র হবে।

ব্যাপ্য যা প্রমাণ করে, ব্যাপক অর্থে যাকে প্রমাণ করে। কাব্যলিঙ্গের সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে, সেখানে কারকহেতু কাজ করে, এখানে জ্ঞাপক হেতু। উৎপ্রেক্ষার সঙ্গে পার্থক্য এই যে, উৎপ্রেক্ষায় সাদৃশ্যানুভব জনিত সংশয়। এখানে নিশ্চিত জ্ঞান।

উদাহরণ :

(৵৹) পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার।
জগাই মাধাই তিঁহো করিলা উদ্ধার ॥
প্রতাপরুদ্র ছাড়ি করিবেন জগৎ উদ্ধার।
এই প্রতিজ্ঞা করি জানি করিয়াছেন অবতার ॥

—শেষ দু পঙ্‌ক্তির সাধ্য বিষয় প্রথম দু পঙ্‌ক্তির সাধন থেকে অনুমিত।

(৶৹) দেখি নাই আমি
মন তব? জাননা কি প্রেম অন্তর্যামী।
বিকশিত পুষ্প থাকে পল্লবে বিলীন,
গন্ধ তার লুকাবে কোথায়। কতদিন
যেমনি তুলেছ মুখ, চেয়েছ যেমনি,
যেমনি শুনেছ তুমি মোর কণ্ঠধ্বনি,
অমনি সর্বাঙ্গে তব কম্পিয়াছে হিয়া—

নড়িলে হীরক যথা পড়ে ঠিকরিয়া
আলোক তাহার। সে কি আমি দেখি নাই।

—সাধ্য জ্ঞান অন্তরে রাগোদয়, তা 'কম্পিয়াছে হিয়া' প্রভৃতির দ্বারা ব্যাপিত।

(৶০) সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস শাখা দুলাইয়া গাছে,
দুটি পাকা ফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে।
ভাবিলাম মনে, বুঝি এতখনে আমারে চিনিল মাতা।
স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা।

—নিজ মৃত্তিকা-জননী তাকে চিনেছেন এই নিশ্চিত জ্ঞান পাকা ফলের পতন থেকে অনুমিত।

(।০) কহিলাম পাণ্ডবের হইবে বিজয়।
আজি এই রজনীর তিমিরফলকে
প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ নক্ষত্র-আলোকে
ঘোর যুদ্ধফল। এই শান্ত স্তব্ধ ক্ষণে
অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে
জয়হীন চেষ্টার সংগীত, আশাহীন
কর্মের উদ্যম—হেরিতেছি শান্তিময়
শূন্য পরিণাম।

—বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ যা তিনি পাঠ করেছেন তা অনুমিতি মাত্র। এবং তা বিভিন্ন ব্যাপ্যজ্ঞান থেকে এসেছে।

(।৴০) কভু কি আসনি দীপ্ত ললাটে স্নিগ্ধ পরশ বুলাতে।
দেখেছি তোমার মুখ কথাহারা
জলে-ছলছল ম্লান আঁখি-তারা,
দেখেছি তোমার ভয়ে-ভয়ে সারা করুণ পেলব মুরতি।

—সুতরাং দীপ্ত ললাটে স্নিগ্ধপরশ বুলাতে এসেছ এ সত্য। সাধন হ'ল 'মুখ কথা-হারা' 'জলে ছলছল আঁখিতারা' ইত্যাদি।

(।৶০) হে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগি, ছলনা জানি সব—
সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
ছদ্মরণবেশে।

আক্ষেপ

লক্ষণ : বিশেষ কিছু প্রতিপত্তির জন্য আসল বক্তব্যকে অন্যথা করলে বা চাপা দিলে আক্ষেপ হয়।

অথবা, বস্তুতঃ নিষেধে নয়, আভাসে বা ব্যঞ্জনায় নিষেধ উচ্চারিত হ'লে অথবা 'বিধি'র দ্বারা 'নিষেধ' বিবৃত হ'লে আক্ষেপ হয়। ব্যঞ্জনার দ্বারা অভিপ্রেত বিষয় সিদ্ধ হয়। যথার্থ নিষেধ স্থলে এ অলংকার হবে না।

উদাহরণ :

(৴০) যাও, বন্ধু, কী হইবে মিথ্যা কাল নাশি,
উৎকণ্ঠিত দেবগণ —

—বস্তুতঃ যেতে নিষেধ করা হচ্ছে। কারণ, এর পরেই রয়েছে—

যেতেছে চলিয়া ?
সকলি সমাপ্ত হ'ল দুকথা বলিয়া ?
দশশত বর্ষ পরে এই কি বিদায় !

—ইংরেজি মতে ওটি Irony.

(৶০) যাবে যদি যাও সাধিয়া কী হবে ?
জন্মান্তরে তোমায় এ দুখিনী পাবে।

অর্থাৎ, তুমি গেলে আমার মৃত্যু নিশ্চিত। অতএব যেও না।

(৷০) যাও চলি, মহাবল, যাও কুরুপুরে
নবমিত্র পার্থ সহ ! মহাযাত্রা করি
চলিল অভাগী জনা পুত্রের উদ্দেশে !

আসল বক্তব্য যেতে নিষেধ করা। ব্যঞ্জনায় তা প্রতিপন্ন হয়েছে।

(১০) যদি বারণ কর তবে গাহিব না।
যদি শরম লাগে চোখে চাহিব না।

পাঁচালিকার দাশরথি রায় নিষেধাভাসের এই ব্যঞ্জনাটিকে নিয়ে শ্লেষ সহকারে মানভঞ্জনে কৃষ্ণের অবস্থা বর্ণন করছেন—

কৃষ্ণ কন তবে যাই বৃন্দে! বৃন্দে কহে হে গোবিন্দে,
'এস গো' তবে বিলম্ব কিসের তরে?
শুনিয়া গোবিন্দ যান, পথে গিয়ে করেন অনুমান
'এস গো' বললে বৃন্দে কেন মোরে?
পুনঃ ফিরে গিয়ে বৃন্দেরে কন, মৃদুভাষে—ভাসে বদন—
নয়নের নীরে।
"এসো গো" বললে—সেইত আসা, পুরাইতে পার আশা?
প্রাণের আশা নৈলে যায় দূরে॥

কহে কথা বৃন্দে শুনে—

যাই বললে কেউ বন্ধুজনে, বিদায় দেয় "এসো" বচনে,
আবার এলে কি কেউ তেমন দেখে?
বুঝ নাই হে রসরায়, যেতে বলেছি ইশারায়,
জেতে রহিত করি নাই তোমাকে॥
শুনে কেঁদে শ্যামরায়, চলিলেন পুনরায়,
পথে পুনঃ করেন মন্ত্রণা।
যেতে রহিত করিনে বললে কিসের কারণে,
ফিরে গিয়ে উচিত তত্ত্ব জানা॥
…যদি রহিত না কর যেতে, তবে কেন বল যেতে,
শুনে বৃন্দে নিন্দা করি বলে।
যারা করে গোচারণ, তাদের অমনি আচরণ,
পূর্বে বললে উত্তরেতে চলে॥

পর্যায়োক্ত

লক্ষণ : অভিপ্রেত অর্থটি যদি বাচ্য-বাচকের অতীত হয় অর্থাৎ ব্যঞ্জনাসাপেক্ষ হয় তাহ'লে পর্যায়োক্ত হয়।

এই অলংকারটি বিশেষভাবে ব্যঞ্জনার উপর নির্ভরশীল।

উদাহরণ :

(।০) জীবনেরে কে রাখিতে পারে।
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।

—এখানে বাচ্যার্থে তারা কর্তৃক জীবনকে আহ্বান অথবা পূর্বাচল কর্তৃক নিমন্ত্রণপত্র দান ইত্যাদি অভিপ্রেত নয়। রূপ থেকে রূপান্তর গ্রহণ, জন্মান্তর পরিগ্রহই অভিপ্রেত অর্থ। বাচ্য-বাচকের জ্ঞান থেকে তা সিদ্ধ হচ্ছে না, কিন্তু ব্যঞ্জনায় অর্থটি ঠিক উপলব্ধ হচ্ছে।

(৵০) ফাটিত এ পোড়া প্রাণ হেরি তারাদলে,
ডাকিতাম মেঘদলে চির আবরিতে
রোহিণীর স্বর্ণকান্তি।

এখানে উল্লিখিত কার্য থেকে নায়িকা তারার চন্দ্রে আসক্তি প্রতীতিগম্য।

(৶০) সিঁথার সিন্দূরে তোর না পড়িল কালি।
পরিধান বস্ত্রে তোর না পড়িল মলি॥
পায়ের আলতায় তোর না পড়িল ধূলি।

—অভিপ্রেত অর্থ হ'ল বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই বেহুলার পতিবিচ্ছেদ।

(।৹) নাহিতে পড়িল জলে নাসার বেশর।
ভাঙিবে কপাল, মাথে পড়িবে বজর॥

খনে খনে প্রাণ কাঁদে নাচে বাম আঁখি।
দক্ষিণে ভুজঙ্গ যেন রহি রহি দেখি॥

—অভিপ্রেত অর্থ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আসন্ন পতিবিচ্ছেদ। তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে আবার সুলক্ষণের দ্বারা কল্যাণ সূচিত হয়েছে। কারণ, গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ বিশ্বের অভূতপূর্ব কল্যাণের জনক।

(।/০) সদর্পে কন্দর্প নামে মীনধ্বজ রথী,
পঞ্চ খর শর তূণে, পুষ্পধনু হাতে,
আক্রমিছে পরাক্রমি অসহায় পুরী ;—
কে তারে রক্ষিবে সখে, তুমি না রক্ষিলে ?

—ব্যাঙ্গ্যার্থ হ'ল উদ্দিষ্ট 'সখা'র প্রতি নায়িকা প্রণয়াসক্তা এবং তিনি মিলন বাঞ্ছা করছেন। ভিন্ন ভঙ্গিতে প্রকারান্তরে এই কথাই ব্যক্ত হয়েছে।

(।৵০) এ পোড়া বদন মুহুঃ হেরিনু দর্পণে,
বিনাইনু যত্নে বেণী, তুলি ফুলরাজি
(বন-রত্ন) রত্নরূপে পরিনু কুন্তলে !
চির-পরিধান মম বাকল ; ঘৃণিনু
তাহায় !

—ব্যাঙ্গ্যার্থে নায়িকার অন্তরে প্রেমের আবির্ভাব প্রকটিত করা হয়েছে। সোমের প্রতি তারা।

(।৶০) সূক্ষ্ম হিসেব করলে দেখি, আসছ তুমি চালিয়ে মেকি,
শপথ ক'রেই বলতে পারি সুন্দরী সে সবার চেয়ে।

—অর্থাৎ তোমার চেয়ে সুন্দরী, সুতরাং তাতে আমি আসক্ত, এই বস্তু উক্তিবৈচিত্র্যে ব্যঞ্জিত হয়েছে।

(॥০) তোমারি চরণমূলে
আছি আমি বিশ্ব ভুলে !
আমারে না হেরে রাধা কাঁদে উভরায়।

শকুন্তলা নিত্য আসি
হেরে মম রূপরাশি।
রত্নাবলী লতা-ফাঁসি গলে দিতে চায়!

—প্রণয়ভাবুকতায় কবি প্রখ্যাত প্রণয়ীদের সঙ্গে একাত্মতা ব্যঞ্জিত করছেন।

(৷৴৹) হাত উঁচু আর হ'ল না যে ভাই তাই লিখি করি ঘাড় নিচু।

—অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ করতে পারছেন না, লেখার মধ্যে সামান্য যা করতে পারেন—এই আক্ষেপ করছেন।

(৷৵৹) কোন্ রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে।
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখে নাই তার পাশে॥

—নারীদের পতিবিচ্ছেদ স্বেচ্ছায় সহ্য করার অসামান্য ত্যাগের কথা প্রকারান্তরে ব্যক্ত হয়েছে।

(৷৶৹) কোন্ দেশ আপনার দ্বারা অলংকৃত হয়, কোন্ দেশবাসীকে আপনি বিরহ-পীড়িত ক'রে এখানে এসেছেন?

—প্রকারান্তরে বক্তব্য হ'ল, আপনার বাড়ী কোথায়?

(৸৹) যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল
সে পথ দিয়ে ফিরল নাক তারা।

—তাদের মৃত্যু প্রকারান্তরে ব্যক্ত হয়েছে।

ব্যাজোক্তি

লক্ষণ: গোপনীয় কোনো ভাব প্রকাশিত হয়ে পড়লে প্রকারান্তরে তাকে গোপন করার প্রয়াস যদি চমৎকারিত্বের জনক হয় তাহ'লে ব্যাজোক্তি ঘটে। (এর পরিসর এত সংকীর্ণ যে একে অলংকার শ্রেণীতে গণ্য না করলেও চলে)।

উদাহরণ :

উমা এল বাহির দুয়ারে,
কোলে করি ত্বরা ক'রে জিজ্ঞাসি উমারে,
"আমার শিব তো আছেন ভাল ?"
উমা বলে—"আছেন ভাল"—চোখে দেয় অঞ্চল,
বলে "চোখে কি হ'লো ? আমার চোখে কি হ'লো ?"
আমি বুঝিনু সকল, কেন চোখে দেয় অঞ্চল।

শিব-প্রসঙ্গে উমা বিরহদুঃখ গোপন করছেন।

পরিকর

লক্ষণ : অভিপ্রেত ভাবের প্রকাশক একাধিক বিশেষণ প্রয়োগের চমৎকারিতা পরিকরালংকারের বিষয়।

উদাহরণ :

(৵০) হে পদ্মা ! প্রলয়ংকরী ! হে ভীষণা ! ভৈরবী সুন্দরী !
হে প্রগল্‌ভা ! হে প্রবলা ! সমুদ্রের যোগ্য সহচরী
তুমি শুধু !

(৶০) তপন-তপ্ত, চির-অতৃপ্ত অনন্তরূপ বহ্নি !
শিবললাটিকা, প্রলয়াত্মিকা তুমি দীপশিখা তন্বী।

(৷৶০) হায় পুত্র, হায় বৎস নবনীনির্মল,
করুণ কোমলকান্ত, হা মাতৃবৎসল,
একান্ত নির্ভরপর, পরম দুর্বল,
সরল চঞ্চল শিশু পিতৃ-অভিমানী
অগ্নিরে খেলনাসম পিতৃদান জানি
ধরিলি দুহাত মেলি বিশ্বাসে নির্ভয়ে।

(।০) শৈলেন্দ্র-নন্দিনী রুদ্রেন্দ্র-গৃহিণী গঙ্গা আশিসে তোমারে।

পর্যায়

লক্ষণ : ক্রমানুসারে একাধিক বস্তুর বিন্যাসের চমৎকারিতা।

উদাহরণ :

(৵০) দুই দিন পরে দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজগ্রামে।
কুমোরের বাড়ী দক্ষিণে ছাড়ি রথতলা করি বামে,
রাখি হাটখোলা নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে, —ইত্যাদি।

(৵০) পড়িল মধ্যাহ্ন রৌদ্র ললাটে অধরে
উরু 'পরে কটিতটে স্তনাগ্রচূড়ায়,
বাহুযুগে, সিক্তদেহে রেখায় রেখায়
ঝলকে ঝলকে।

এটিই যদি ক্রমোৎকর্ষ বা ক্রমাপকর্ষের নিয়মে ঘটে তাহ'লে যথাক্রমে Climax ও Anti-climax হবে।

সহোক্তি

লক্ষণ : সহ বা সহার্থক শব্দের যোগে বিভিন্ন বস্তুর একক্রিয়া-সংযোগের যে চারুত্ব তা সহোক্তি অলংকারের বিষয়।

উদাহরণ :

(৵০) কৈলাসবাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘরের আনন্দময়ী পিতৃভবন অন্ধকার করিয়া পতিগৃহে যাত্রা করিবে।

(৵০) বিরহিণীর দীর্ঘশ্বাসের সহিত হেমন্ত রজনী দীর্ঘতর হইতে হইতে চলিল।

(৶০) সকরুণ তব মন্ত্র সাথে
মর্মভেদী দুঃখ যত বিস্তারিয়া যাক বিশ্বপরে—

(।০) অসংখ্য পাখির সাথে
দিনে রাতে
এই বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো-অন্ধকারে।

(।৵০) ভূতলে পড়িল তরু তার সাথে আঁখিক'টি
জলভারে নামিয়া পড়িল।

বিনোক্তি

লক্ষণ : বিনা শব্দের যোগে উদ্ভূত চারুত্ব।

উদাহরণ :

(/০) সরসিজ বিনু সর সর বিনু সরসিজ
কী সরসিজ বিনু সূরে।

—পূর্বভাগে অন্যোন্য অলংকারও হয়েছে।

(৵০) পান বিনে ঠোঁট রাঙা

পরিবৃত্তি বা বিনিময়

লক্ষণ : দুই পৃথক্ জাতীয় বস্তুর চারুত্বপূর্ণ বিনিময় সম্পর্ক নির্দেশ।

উদাহরণ :

(/০) নিজ অন্ন পরে করপণ্যে দিলে,
পরিবর্তে ধনে দুরভিক্ষ নিলে।

(৵০) শিবনাথ ভাইকে প্রচুর স্নেহবাক্য দিয়া তৎপরিবর্তে তাঁহার বিষয়সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া লন।

অন্যোন্য

লক্ষণ : এক ক্রিয়ামুখে দুই বিষয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপিত হ'লে অন্যোন্য হয়।

উদাহরণ :

(/০) তুমি বিশ্বপানে চেয়ে মানিছ বিস্ময়,
বিশ্ব তোমা পানে চেয়ে কথা নাহি কয়,

(৵০) ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।

(৶০) নিশাতে শশীর শোভা, শশীতে নিশার।

(।০) মুক্তায় ভূষা উমার কণ্ঠ, কণ্ঠের ভূষা মুক্তাহার।

অধিক

লক্ষণ : আধার (আশ্রয়) ও আধেয় (আশ্রিত) উভয়ের বর্ণনায় একের গুণাধিক্য প্রকাশ পেলে **অধিক** হয়।

উদাহরণ :

(৵০) জলে মিশে থাকে পদ্মের পাত।
জল নাশে তার নহে নিপাত॥

—এখানে জল (আধার) থেকে পদ্মপত্রের (আধেয়ের) গুণাধিক্য।

(৶০) অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, নহে কভু ভূধর অধীর
সে পীড়নে।

—এখানে আধেয়াপেক্ষা আধারের গুণাধিক্য।

'এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে' ইত্যাদি স্থলে 'নয়নে' রূপের ধরা-সম্বন্ধে অসম্বন্ধ-স্থাপনরূপ **অতিশয়োক্তি** অলংকার হয়েছে। 'নয়নে' শব্দটি না থাকলে **অধিক** বলা চলত। অধিক বস্তুতপক্ষে অতিশয়োক্তিরই প্রকার বিশেষ। এজন্য দণ্ডীর মতে এটি আশ্রয়াতিশয়োক্তি।

ভাবিক

লক্ষণ : ভূত-ভবিষ্যতের বিষয় বর্তমানের প্রত্যক্ষের ন্যায় বর্ণিত হ'লে ভাবিক হয়।

উদাহরণ :

(৵০) আজও দেখি দুপুর বেলা
ভুঁয়ে শুয়ে ফুলের খেলা
আকুল প্রাণে দুকূল পেতে, বকুল-শোভা পায়!
ম'রে গেছে মানুষ সে যে বছর তিনেক যায়!

(৵০) শুনিনু নিদ্রার ঘোরে অযোধ্যার নাম।
…তরুণ দেবতাসম কিশোর কুমার
যৌবনে সন্ন্যাসী সাজি চলিয়াছে বনে—
সীতার বিরহভয়ে পুরী অন্ধকার
গগন শ্বসিয়া উঠে নিরুদ্ধ ক্রন্দনে।

পূর্বেকার ঘটনা প্রত্যক্ষের মত দেখা হচ্ছে।

কারণমালা

লক্ষণ: পূর্ববর্তী বস্তুটি পরবর্তী বস্তুর কারণ হয় এরকম ভাবে একাধিক বস্তুর বর্ণন।

উদাহরণ:

(/০) রণে যদি মর ঘুষিবে যশ,
যশ যার তার দেবতা বশ,
বশ হোলে দেব যাইবে দিবে,
দিবে গেলে সদা সুখ ভুঞ্জিবে॥
('নিবাতকবচবধ'। 'কাব্যনির্ণয়' গ্রন্থ থেকে)

একাবলী

লক্ষণ: কারণ-সম্বন্ধ ছাড়া যেখানে পূর্ব পূর্ব বস্তু ক্রমানুযায়ী পর পর সংযোজিত হয় সেখানে একাবলী।

উদাহরণ:

(/০) এখন তখন করি দিবস গোঁয়ায়ল
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিখ গোঁয়ায়ল
ছোড়ল জীবনক আশা॥

(৵০) জল নাই যাহা বিহীন-পদ্ম,
পদ্ম আছে, নয় অলির সদ্ম?
অলি কই যা না গুন্ গুন্ স্বরে
বিরহী জনেরে ব্যাকুলিত করে?

সার

লক্ষণ: বস্তুর ক্রমে ক্রমে উৎকর্ষ দেখিয়ে, অবধি নিরূপিত হ'লে 'সার' হয়। ইংরেজি Climaxএর মত।

কখনো কখনো 'সার' এই বাচক শব্দই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উদাহরণ:

(৴০) পৃথিবীর ভূষণ রাজা, রাজার ভূষণ সভা।
সভার ভূষণ পণ্ডিত, সভা করে শোভা॥
পণ্ডিতের ভূষণ ধর্মজ্ঞানী............

সমুচ্চয়

লক্ষণ: একটি কারণ কোনো বিষয়ে যথেষ্ট হলেও যেখানে আধিক্যময় চারুত্ব সম্পাদনের জন্য একই সঙ্গে আরও অন্যান্য কারণ বিন্যস্ত হয় সেখানে সমুচ্চয় অলংকার ঘটে।

সন্নিবেশ এই ন্যায়ে হয় যে, একটি পাত্রে যেমন বহু কপোত একই সঙ্গে আহার করতে পারে। একে খল-কপোতিকা ন্যায় বলা হয়।

উদাহরণ:

(৴০) পেয়েছ শিবের জটা তাহাতে সাপের ঘটা
কপালে বহ্নির তাপ লাগে।
চণ্ডী করে গণ্ডগোল ভূত ভৈরবের রোল
কোন্ সুখে আছ, কোন্ রাগে॥

(৵০) একে কুলকামিনী তাহে কুহু যামিনী
ঘোর গহন অতিদূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর
হাম যাওব কোন্ পুর॥

(৶০) প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ,
রুধিল না সমুদ্র পর্বত।

সমাধি

লক্ষণ : বহুপ্রার্থিত বস্তু যদি কার্যগতিকে অনায়াসে সিদ্ধ হয়, তার বর্ণনে সমাধি অলংকার হয়।

উদাহরণ :

(৴০) রাগিয়া বিমুখ প্রিয়া মেঘরবে কম্পিয়া
চকিতে চাপিয়া বুকে ধরে।

উপরি-উক্ত কতকগুলি অলংকারের নিজস্ব চমৎকারিতা তেমন কিছু নেই, আর বাঙ্‌লায় এদের প্রয়োগে কবিকুলের তেমন আগ্রহও দেখা যায় না। শাস্ত্রে এ ছাড়া আরও বহু গুরুত্বহীন অলংকারের বিন্যাস দেখা যায় এবং আরও কত হতে পারে, সে-সব এ গ্রন্থে উল্লিখিত হয়নি।

ইংরেজির সংস্পর্শে এসে ইংরেজি স্টাইলের প্রভাবে বাঙ্‌লায় বহু Figure of Speech অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। এগুলির মধ্যে Simile, Metaphor, Personification, Hyperbole, Alliteration, Pun এবং Epigram এই ক'টি অলংকারের সঙ্গে বাঙ্‌লার অনুরূপ অলংকারগুলির কোথাও পুরো, কোথাও বা আংশিক সাদৃশ্য মেলে। Metonymy, Synecdoche, Allusion, Inuendo, Euphemism, Chiasmus প্রভৃতি তেমন চমৎকারিত্বের অভাবে সংস্কৃত-বাঙ্‌লায় অলংকার ব'লে পরিগণিত হয় না। শব্দ ও বাক্যের বহিরঙ্গ প্রয়োগ-বৈচিত্র্য হেতু এ ধরনের অতি সামান্য চমৎকৃতি লক্ষণা ও ব্যঞ্জনাশক্তির ব্যাপার ব'লে ধরা হয়।

বাঙ্‌লায় অনুপ্রবিষ্ট ইংরেজির প্রধান অলংকারগুলি স্থান-অনুসারে পূর্বেই নির্দিষ্ট হয়েছে।

ছন্দ-প্রসঙ্গ

তৃতীয় পর্ব | ছন্দ-প্রসঙ্গ
বাঙ্‌লা ছন্দের উদ্‌ভব ও যথার্থ স্বরূপ

কাব্যরচনা নিতান্ত লৌকিকতা থেকে মুক্ত ও অলংকৃত বাগ্‌-ভঙ্গিমাকে আত্মসাৎ ক'রে আবির্ভূত হয়। ছন্দ এই অলংকরণের একটি প্রধান উপাদান।

প্রচলিত বাঙ্‌লা ছন্দের আবৃত্তিরূপ তিনটি রীতির একটি হ'ল এমন যাতে অক্ষরমাত্রেই উচ্চারণে এক মাত্রার সময় পায়, আর একটি এমন যাতে অক্ষরের * ঐ নির্দিষ্ট মাত্রামূল্য থাকে না, যৌগিক অক্ষর এমন কি প্রাচীন উচ্চারণের যে-কোনো দীর্ঘ স্বর (আ, ঈ, ঊ পর্যন্ত) ক্ষেত্রবিশেষে আজও দীর্ঘ উচ্চারণ করা যায়, যদিও বাঙলার স্বাভাবিক উচ্চারণে স্বর ব্যঞ্জন কোনো অক্ষরই দীর্ঘ নয়। আর তৃতীয়টি পরিস্ফুটভাবে শ্বাসাঘাত-নির্ভর, যাতে অক্ষরের মাত্রা মূল্যহীন হয়ে পড়ে, এবং যতি খুবই প্রাধান্য পায়।

বস্তুতঃ বাঙ্‌লা ছন্দ মূলে সুরতালধর্মী। ঠিক গানের সুরতালের বিস্তৃত বৈচিত্র্য হয়ত ছন্দে নেই, তবু সীমিত বৈচিত্র্য নিশ্চিতই রয়েছে, আর তাতেই কবিতা ছন্দোযুক্ত হয়ে অপূর্ব বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুরতালের এক একটি প্যাটার্‌ন্‌ বা ঢঙ্‌ উক্ত তিন রীতির মধ্যে প্রথম দু'টিতে অর্থাৎ দীর্ঘতাহীন অক্ষরমাত্রিকে এবং দীর্ঘতাবহুল যৌগিক-দ্বিমাত্রিকে যতিপাতের সুতরাং পর্ববিভাগের সুষমাময়

* অক্ষর=সিলেব্‌ল। উচ্চারণের সব থেকে স্বল্প অংশ--একটি স্বর, একটি স্বরযুক্ত এক বা একাধিক ব্যঞ্জন। যতি=বাক্য উচ্চারণের মধ্যেকার স্বাভাবিক বিরাম বা থামা, যা অর্থশেষ না হলেও আপনা হতেই আসে। গদ্য বা গদ্যছন্দ ছাড়া উক্ত তিনরীতির ছন্দে যতির স্থান চার থেকে দশমাত্রা পর্যন্ত। ঐ বিরাম আরও স্বল্প হলে অর্ধযতি, দুই তিন চার মাত্রার পর। স্বরপ্রবাহের বা চরণের শেষে দাঁড়ি-চিহ্নে শেষযতি ও তালসমাপ্তি। মাত্রা উচ্চারণ-সময়ের একটা মাপ।

সামঞ্জস্যের উদ্ভব ঘটিয়েছে। যেমন, অক্ষরমাত্রিকে ৮+৬, ৬+৫, ৬+৬, ৮+১০, ৬+৬+৮, ৮+৮+১০ প্রভৃতি চরণের এবং মাত্রাবৃত্তে ৮+৬, ৫+৫+৫, ৮+৮+৮+২ প্রভৃতি গ্রন্থনের বৈচিত্র্য এনেছে। এবিষয়ে নিয়ত-চারমাত্রা পর্বের শ্বাসমাত্রিক ছন্দ বরঞ্চ বৈচিত্র্যহীন।

সে যাই হোক, লক্ষণীয় এই যে, এই যতিপাত (বা তালবিধানের) ও মাত্রাবিধানের সঙ্গতি সহ এক একটি সুরধর্ম বাঙ্‌লা ছন্দের মূল নিয়ন্ত্রী শক্তি। **সুরতালের নিয়ন্ত্রণের জন্যই বাঙ্‌লা অক্ষরের মাত্রা অনেকটা স্থিতিস্থাপক, কমিয়ে বাড়িয়ে অক্ষরকে বিশিষ্ট একটি ধাঁচের সঙ্গে সমঞ্জস বা সুসংগত করে নেওয়া যায়।** এইজন্যই অক্ষরমাত্রিক বা পয়ার-শ্রেণীর পদ্ধতিতে (খুবই ক্বচিৎ) একমাত্রাকে টান দিয়ে কৃত্রিমভাবে দু'মাত্রা ক'রে নিয়েও ছন্দ রক্ষা করা চলে। ইংরেজির মত অনিয়ত পর্ব (irregular foot) বাঙ্‌লায় অচল। শ্বাসমাত্রিক ছন্দে শ্বাসগত সুরধর্ম বিদ্যমান এবং তা-ই অক্ষরের হ্রস্বদীর্ঘের নিয়ামক। ছন্দের মূলে উক্ত অদৃশ্য ব্যাপারটির কর্তৃত্ব অনুধাবন না করলেই নয়। ছন্দের আলোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়টির উপরই পুনঃপুনঃ জোর দিয়েছেন।

উক্ত পদ্ধতিত্রয়ের মধ্যে প্রথম দুটি অর্থাৎ অক্ষরমাত্রিক (প্রচলিত নামে অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান বা মিশ্র কলামাত্রিক) এবং যৌগিক-দ্বিমাত্রিক (প্রচলিত নামে মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান বা কলামাত্রিক) সংস্কৃত-প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে পরিবর্তনের নিয়মে বাঙ্‌লায় এসেছে। বলা যায়, এ দুটি তদ্ভব ছন্দ। তৃতীয়টি অনার্যমূল, বাঙ্‌লাভাষার নিজ রূপ লাভ করার পরেই এসে যোগ দিয়েছে। আদি বাঙ্‌লা চর্যাগীতির অধিকাংশ পদ পাদাকুলক ছন্দের ৮+৮ দ্বিপর্বিক, হ্রস্ব দীর্ঘ প্রয়োগ স্বচ্ছন্দ। কয়েকটি ত্রিপর্বিক ৮+৮+৮+৪ এর ছাঁচও দেখা যায়। জয়দেবের গীতগোবিন্দে ১০, ৮, ৭. ৬ মাত্রার ঘোরানো-ফেরানো বিবিধ বৈচিত্র্য দেখা যায়। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই অক্ষরমাত্রিক রীতির পয়ার-ত্রিপদী প্রভৃতির পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখা যাচ্ছে। ৮+১০, ১০+১০+৮+৪ এসবের বিভিন্ন স্তবকসজ্জাও এতে দেখা

যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মাত্রাবৃত্ত নেই, শ্বাসমাত্রিক ছড়ার ছন্দও নেই, কৃত্তিবাসী রামায়ণেও নেই। যদিও লোকমুখে কথিত প্রবচন বা ছড়ার মধ্যে একালেই সে ছন্দের ব্যবহার ছিল। এসব বিষয় পরিস্ফুট ক'রে এবং ছন্দের প্রচলিত আলোচনায় যে-সব ছোটখাট সমস্যা তৈরি করা হয়েছে তার সমাধানের পথ যথাসম্ভব নির্দেশ ক'রে আমরা সংক্ষিপ্ত ছন্দের আলোচনা শেষ করব। বিশেষ বিশেষ কবির আলোচনায় তাঁদের ছন্দোবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

সংস্কৃত-প্রাকৃতে ছন্দের দুই রীতি, অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত। লঘুগুরু বিশেষ বিশেষ ঢঙ্‌সহ নির্দিষ্ট অক্ষর গণনায় যে রীতির পরিচয় ফুটে ওঠে তা অক্ষরবৃত্ত, আর মাত্রার পরিচয়ে ও সংখ্যায় যার স্বরূপ চিহ্নিত হয় (অক্ষরসংখ্যা যাই থাক না কেন) তা মাত্রাবৃত্ত। যতির বিরাম সংস্কৃত-প্রাকৃতে থাকলেও তার স্থান গৌণ, বাঙ্‌লার মত মুখ্য নয়। মাত্রাবৃত্তেরই সমিল অপভ্রংশরীতি হ'ল "জাতি"। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে নির্দিষ্ট লঘুগুরুমাত্রা-যুক্ত ৮+৮ অক্ষরের অলিল্লহ, পাদাকুলক প্রভৃতি ছন্দ বাঙ্‌লা অক্ষরবৃত্তের ৮+৬ এর পয়ারে এবং চউপইআ, চউবোলা, মরহট্টা, তিভঙ্গী, দুর্মিলা, ঝুল্লন প্রভৃতি বৃত্ত ৬, ৮, ৯, ১০ প্রভৃতি মাত্রার যতিযুক্ত বাঙ্‌লা ত্রিপদীতে রূপান্তরিত হয়েছে। মাত্রাবৃত্ত থেকে অক্ষরবৃত্তে রূপান্তরের কালে শ্বাসাঘাত ও যতির প্রবণতা ছাড়া সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ অক্ষরবৃত্তও তার প্রভাব বিস্তার করেছে। অপভ্রংশের সমমাত্রিক পর্বের ছন্দেও যে বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে এবং সেগুলি যে বিভিন্ন ছন্দঃপদ্ধতির অধীন হয়ে বিভিন্ন আখ্যা পেয়েছে তার মূলে রয়েছে লঘুগুরু অক্ষর স্থাপনের সামঞ্জস্যময় বৈচিত্র্য। গীতগোবিন্দের গানগুলিতে আটমাত্রার পর্বের প্রাধান্য থাকলেও ঐ আটমাত্রার লঘুগুরু বিন্যাস সর্বত্র এক নয়, আর তাতেই শ্রুতিগত রম্যতার উদ্‌ভব। কিন্তু চর্যাগীতি বা গীতগোবিন্দের ছন্দ থেকে বাঙ্‌লা ছন্দের উদ্ভব এরকম মনে করলে এই ভুল হয় যে ঐ দুই গীতেও প্রচলিত অপভ্রংশ

অপভ্রংশ ছন্দে মাত্রা ও যতি

ছন্দোরীতির কয়েকটি মাত্র রূপকল্প স্থান পেয়েছে। সমীচীন কথা হ'ল এই যে, অপভ্রংশের কয়েকটি ছন্দোরূপ থেকে বাঙ্‌লা দ্বিমাত্রিকতাবহুল মাত্রাবৃত্তের ও একমাত্রিকতাবহুল অক্ষরমাত্রিক পদ্ধতির ছন্দের উদ্ভব। চর্যাগীতি বা গীতগোবিন্দে দেখা যায় না এমন কয়েকটি অপভ্রংশবৃত্ত বাঙ্‌লা কয়েকটি ছন্দোরূপের জন্ম দিয়েছে, যেমন 'রসিকা'—সর্বলঘু একাদশ মাত্রার। নিঃসন্দেহে এটি বাঙ্‌লা 'একাবলী'র পূর্বরূপ—

ইহ রসিঅউ / মিঅণঅণি।
এহ দহকল / গঅ গমণি ॥

অর্থাৎ—

ইনি সে রসিকা / মৃগনয়নী।
উনি ষোলকলা / গজগমনী ॥

ঝুল্লণ ছন্দ—১০ + ১০ + ১০ + ৭ মাত্রা—

পঢম দহ দিজ্জিআ পুণবি তহ কিজ্জিআ
পুণবি দহ সত্ত তহ বিরই জাআ।

তু° শশিশেখর—১০ + ১০ + ১০ + ···

তুঙ্গমণিমন্দিরে ঘনবিজুরি সঞ্চরে
মেঘরুচি বসন পরি ধানা।

অথবা—

নবহুঁ রুচি সেহ সখি নিপহুঁ মূলে পেখলুঁ
নয়ন মন ভুলল মঝু ভরমং।

অপভ্রংশ বর্ণবৃত্তের চার অক্ষর, পাঁচ অক্ষর, ছ' অক্ষর প্রভৃতি বাঙ্‌লায় অনুরূপ অক্ষরবৃত্তের জন্মদাতা, যেমন—

অপভ্রংশ	বাঙ্‌লা
সঈ উমা রখো তুমা	জল পড়ে পাতা নড়ে।
পবন বহ সরির দহ	বচন ধর রচন কর।
কমল গঅণী অমিঅ বঅণী।	কবিতা কি ধন জানে কবিগণ।
তরুণী ঘরিণী মিলই সুপুণি ॥	কি গুণ রতনে পশু কি তা গণে ॥

অনুরূপ ৭, ৮, ৯ ইত্যাদি। আবার ছ' অক্ষরের বর্ণবৃত্ত বাঙ্‌লা ছ' মাত্রা-ছ' অক্ষরের লঘু ত্রিপদীতে রূপান্তর পরিগ্রহ করেছে। এর বিস্তার রূপে ভঙ্গত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতিও যথেষ্ট দেখা যায়। যেমন পদাবলীর—

'কিংস্থক কোরক/নাসিকা স্থভগ/আঁখি উতপল/রাতা'

ইত্যাদি। অথবা "রূপেতে ভ্রমরা গুণে ননিচোরা বিভব ধবলী বসতি গাছে" "কালিন্দীর কূল বিকসিত ফুল মত্ত অলিকুল পড়লহি পাঁতিয়া"।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে অপভ্রংশ ছ' মাত্রার মাত্রাবৃত্ত (যেমন 'হীর' নামক ছন্দে) বাঙ্‌লা পদাবলীতে বিশেষ বিস্তার লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথই বাঙ্‌লা ষণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তের প্রচলন করেছেন এরকম ভুল ধারণা কোন কোন বাঙ্‌লা ছন্দোগ্রন্থে দেখা যায়। পদাবলীতে এর বহুল উদাহরণ সনাতনাদির সংস্কৃতপদে, তা ছাড়া নিম্নোদ্‌ধৃত শ্রেণীর রচনায়—

'নব নায়রি নবনায়র নৌতুন নব নেহা'
আওত পর বঞ্চক শঠ নাগর শত ধরিয়া'
'অতি শীতল মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহনা'
'শারদচন্দ পবন মন্দ বিপিন ভরল কুস্থমগন্ধ'

ইত্যাদি। প্রাকৃত এবং অপভ্রংশের মাত্রাবৃত্তে ১২, ১৪, ১৬, প্রভৃতি মাত্রার দীর্ঘপর্বের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। বাঙ্‌লা মাত্রাবৃত্তে পর্বের উক্তরূপ দীর্ঘতা আমাদের উচ্চারণ-প্রবণতার বাইরে, ফলে অপ° দশ মাত্রার পর্ব বাঙ্‌লায় ৫+৫, এগার মাত্রার পর্ব ৬+৫, বার মাত্রার পর্ব ৬+৬, পনের মাত্রার পর্ব ৮+৭, ষোল মাত্রার পর্ব ৮+৮ ইত্যাদি রূপে ভাগ ক'রে তবে শ্রুতিযন্ত্রের প্রত্যাশিত স্থষমা রক্ষা করতে হয়। আদ্যন্ত ছ'মাত্রার পর্বে ভাগ করা যায় অপভ্রংশ 'হীর' বৃত্তের মত এমন কবিতা গীতগোবিন্দে নাই। কিন্তু ছ'মাত্রার মিশ্র পর্বে বিভাগ করা যায় এর দৃষ্টান্ত গীতগোবিন্দে যথেষ্ট—মূলগীতে এবং ধ্রুবপদে। উদাহরণ স্বরূপ গীতগোবিন্দের

গীতগুলির পর্ববিভাগ দেওয়া গেল। এ থেকে পরিস্ফুটভাবে গীতধর্মী অপভ্রংশ ছন্দে জয়দেব-সমানীত পর্ববৈচিত্র্যের স্বরূপও কতকটা অনুধাবন করা যাবে—

(১) প্রলয়পয়োধিজলে | ধৃতবানসিবেদং =১০+১০
বিহিতবহিত্রচ | রিত্রমখেদম্। =৮+৮
কেশবধৃত | মীন শরীর | জয়জগদীশহ | রে ৬+৭+৮+২

(২) শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল | ধৃতকুণ্ডল | কলিতললিতবনমাল
=১২+৬+১২
জয় জয় দেবহ | রে =৮+২

(৩) ললিতলবঙ্গল | তাপরিশীলন | কোমলময়স | মীরে
=৮+৮+৮+৪

(৪) চন্দনচর্চিত | নীলকলেবর | পীতবসনবন | মালী =৮+৮+৮+৪

(৫) সঞ্চরদধরসু | ধামধুরধ্বনি | মুখরিতমোহন | বংশম্
=৮+৮+৮+৪

(৬) নিভৃতনিকুঞ্জগৃ | হংগতয়া নিশি | রহসি নিলীয়ব | সন্তম্
=৮+৮+৮+৪

(৭) মামিয়ং চলি | তাবিলোক্য বৃ | তং বধূনিচ | য়েন =৭+৭+৭+৩

(৮) নিন্দতি চন্দন | মিন্দুকিরণ মনু | বিন্দতিখেদম | ধীরম্
=৮+৮+৮+৪

(৯) স্তনবিনিহিতমপি | হারমুদারম্ =৮+৮
সা মনুতে কৃশ | তনুরিব ভারম্ =৮+৮

(১০) বহতিমলয় | সমীরে ॥ মদনমুপনি | ধায় =১১+১০
অথবা (৬+৫+৬+৪)
স্ফুটতিকুসুম | নিকরে বির | হিহৃদয় দল | নায় =৬+৬+৬+৩

(১১) রতিসুখসারে | গতমভিসারে | মদনমনোহর | বেশম্
=৮+৮+৮+৪

(১২) পশ্যতি দিশি দিশি | রহসি ভবন্তম্ =৮+৮
তদধরমধুরম | ধূনি পিবন্তম্ =৮+৮

(১৩) কথিতসময়েঽপি হরি | রহহ ন যযৌ বনম্ * =১০+১০

---

* বাঙ্‌লা মতে একে ৫+৫ | ৫+৫ এ ভাগ করা হয়েছে।

(১৪) স্মরসমরোচিত | বিরচিতবেশা =৮+৮
গলিতকুসুমদর | বিলুলিতকেশা =৮+৮

(১৫) সমুদিত মদনে | রমণীবদনে | চুম্বনবলিতাধরে =৮+৮+১২ (রে ৩)

(১৬) অনিলতরল কুব | লয়নয়নেন =৮+৮ (৮+৭)
তপতি ন সা কিশ | লয়শয়নেন =৮+৮ (৮+৭)

(১৭) রজনিজনিতগুরু | জাগররাগরক | ষায়িতমলসনি | মেষম্
=৮+৮+৮+৪

(১৮) হরিরভিসরতিব | হতিমৃদুপবনে =৮+৮

(১৯) বদসি যদি কিঞ্চিদপি | দন্তরুচিকৌমুদী * =১০+১০

(২০) বিরচিতচাটুব | চনরচনংচর | ণে রচিতপ্রণি | পাতম্
৮+৮+৮+৪

(২১) মঞ্জুতরকুঞ্জতল | কেলিসদনে। ১০+৭
বিলসরতিরভস | হসিতবদনে ॥ ৮+৭

(২২) রাধাবদনবি | লোকনবিকসিত | বিবিধবিকারবি | ভঙ্গম্
=৮+৮+৮+৪

(২৩) কিশলয়শয়নত | লে কুরুকামিনি | চরণনলিনবিনি | বেশম্
=৮+৮+৮+৪

(২৪) কুরু যদুনন্দন | চন্দনশিশিরত | রেণ করেণ প | য়োধরে
৮+৮+৮+৫

উদ্‌ধৃত দৃষ্টান্তে অষ্টমাত্রিক পর্বের উপর গীতগোবিন্দের কবির পক্ষপাত দৃষ্ট হ'লেও সম-সম অথবা সম-বিষম বিভিন্ন পর্বের মিশ্রণও লক্ষ্য করার বিষয়। এই মিশ্রণের উৎকর্ষ ঘটেছে কিন্তু তাঁর ধ্রুব-পদগুলিতে। ধ্রুবপদগুলি প্রায়শই মূল গীতির ছন্দোরীতি থেকে ভিন্ন, এমনকি কোনো কোনোটি গদ্যচ্ছন্দের রীতিতে বাঁধা। কিন্তু এই পার্থক্যেও এগুলি মূলগীতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে হার্মনির সৃষ্টি করেছে। ধ্রুবপদগুলির ছন্দোভঙ্গির নির্দেশ দেওয়া গেল—

(১) বিহরতি হরিরিহ | সরসবসন্তে =৮+৮
নৃত্যতি যুবতিজ | নেন সমং সখি | বিরহিজনস্য দু | রন্তে। +৮+···

* বাঙ্‌লা মতে ১০=৫+৫

(২) হরিরিহ মুগ্ধব | ধূনিকরে =৮+৬
(বি) লাসিনিবিলসতি | কেলিপরে =৯+৬ (১+৮+৬)

(৩) রাসে হরিমিহ | বিহিতবিলাসম্
স্মরতি মনোমম | কৃতপরিহাসম্ } =৮+৮

(৪) (সখি হে) কেশীমথনমু | দারম্ ইত্যাদি =৮+৪

(৫) (হরি হরি) হতাদরতয়া | গতা সা কুপি | তেব
=৮+৭+৩ (৮+১০)

(৬) সা বিরহে তব | দীনা ইত্যাদি =৮+৪ ইত্যাদি

(৭) রাধিকা তব | বিরহে কেশব =৭+৮

(৮) সীদতি তব | বিরহে বন | মালী =৬+৬+৪

(৯) ধীর সমীরে | যমুনাতীরে | বসতি বনে বন | মালী
=৮+৮+৮+৪

(১০) নাথ হরে | সীদতি রাধা | বাস ঘরে =৬+৮+৬

(১১) যামি হেক | মিহ শরণং | সখিজনবচ | ন বঞ্চিতা
=৬+৬+৬+৬

(১২) কাপি মধুরিপু | না =৭+২
বিলসতি যুবতির | ধীকগুণা =৮+৬

(১৩) রমতে যমুনা | পুলিনবনে | বিজয়ী মুরারি | রধুনা
=৮+৬+৮+৪

(১৪) (সখি) যা রমিতা বন | মালিনা =৮+৫

(১৫) যাহি মাধব | যাহি কেশব | মা বদ কৈতব | বাদম্
=৭+৭+৮+৪

(১৬) (মাধবে) মা কুরু মানিনি | মানময়ে =৮+৬

(১৭) (প্রিয়ে চারুশীলে) মুঞ্চ ময়ি মানমনি | দানম্ =১০+৪

(১৮) (মুগ্ধে) মধুমথনমনুগতম | নুসর রাধিকে =১০+৮

(১৯) (প্রবিশ) রাধে মাধব | সমীপমিহ =৮+৬

(২০) সা দদর্শগুরু | হর্ষবশংবদ | বদনমনঙ্গবি | কামং
=৮+৮+৮+৪

(২১) ক্ষণমধুনা না | রায়ণমনুগত | মনুভজ রাধি | কে
=৮+৮+৮+২ (খি ২ মাত্রা)

জয়দেব নিশ্চিতই পূর্বেকার অপভ্রংশের প্রচলিত কাঠামোর উপর তাঁর পর্ববিভাগ এবং লঘুগুরু অক্ষর সংস্থাপনের বৈচিত্র্য গ্রথিত ক'রে তদানীন্তন ছন্দঃচাতুর্য প্রদর্শন করেছিলেন। যেমন করেছেন অধুনা রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত অক্ষরমাত্রিক এবং মাত্রামূলক বৃত্তে।

উপরি-উক্ত অপভ্রংশ এবং জয়দেবীয় ছন্দোবিন্যাস থেকে বোঝা যায় যে, আধুনিক বাঙ্‌লায় মাত্রাবৃত্তে ৫, ৬, ৭, ৮, এবং অক্ষর-মাত্রিকে বহুল প্রচলিত ৬, ৮, ১০, এবং স্বল্প প্রচলিত ৪, ৫, ৯ সবই অপভ্রংশের অনুরূপ অথবা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘযতির ছন্দ থেকে নানাভাবে রূপ পরিগ্রহ করেছে। অপভ্রংশ থেকে বাঙ্‌লার বিশেষ পার্থক্য এই যে, অপভ্রংশে মাত্রা মুখ্য, যতি গৌণ; বাঙ্‌লায় যতি মুখ্য, মাত্রা গৌণ। সংস্কৃতেও যতির গৌণতা। বাঙ্‌লার এই যতি-মুখ্যতা তার উচ্চারণবৈশিষ্ট্য থেকেই সমুৎপন্ন। আচার্য সুনীতিকুমার ভাষাতত্ত্ব বিচারে বাঙ্‌লা উচ্চারণে শব্দে ও শব্দগুচ্ছে আদি-শ্বাসাঘাত প্রবণতার দিকটি দেখিয়েছেন। প্রতিটি শব্দের আদিতে ঝোঁক এবং কয়েকটি শব্দের একত্র উচ্চারণের বেলায় শব্দগুচ্ছকে একক ধ'রে তার আদিতে ঝোঁক—এই হ'ল আমাদের উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য আচার্যের যথাযথ অধ্যয়নে চর্যাগীতির সময় থেকে ক্ষীণভাবে প্রারব্ধ হয়েছে মাত্র, কিন্তু কৃষ্ণকীর্তন রচনার কালে এটি পূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছে। ঝোঁকযুক্ত শব্দগুচ্ছের অন্তরালে যে স্বাভাবিক বিরাম তা-ই সংগীতের তালের মত বাঙ্‌লাছন্দের বৈচিত্র্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এই কারণে বাঙ্‌লা ছন্দের স্বভাব সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ থেকে পৃথক্ হয়ে পড়েছে। এই কারণে সংস্কৃত-প্রাকৃত (ঠিক অপভ্রংশ তেমন নয়) অক্ষরের সুনির্দিষ্ট হ্রস্বদীর্ঘ মাত্রাও বাঙ্‌লায় রক্ষিত হয়নি। বাঙ্‌লার এই নবপ্রতিষ্ঠিত ঝোঁকের বিষয়ে অনার্য-মিশ্রণ চিন্তনীয়। প্রাকৃত-অপভ্রংশ থেকে উৎপন্ন হচ্ছে না এমন ঝোঁকপ্রধান ছড়ার ছন্দের উদ্ভবও অনার্য-মিশ্রণ থেকে, বিস্তার প্রবচন লোকোক্তির মধ্য দিয়ে।

অপভ্রংশ রীতি থেকে বাঙ্‌লা রীতির উদ্ভব

চর্যাগীতিতে যে অপভ্রংশের 'পাদাকুলক' এবং 'মরহট্টা' জাতীয়

ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়, তার কারণ, পরবর্তী বাঙ্‌লার পয়ার এবং ত্রিপদীর জন্মদাতা ঐ দুই ছন্দের প্রচলন সেকালে সবচেয়ে বেশি ছিল। এরও কারণ, এগুলিতে লঘুগুরু অক্ষর সংস্থাপনের নিয়মতন্ত্র অন্যান্য ছন্দের মত কঠোর ছিল না। হ্রস্বদীর্ঘ সন্নিবেশ যেখানেই হোক, তালবিভাগ ঠিক থাকলেই হ'ল। একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে 'সুকবিদের প্রিয়' এবং বহুল ব্যবহৃত পাদাকুলক ছন্দই বাঙ্‌লা পয়ারের পূর্ববর্তী রূপ। বাঙ্‌লায় যতির মূল্য বেড়ে যাওয়ার জন্য অথবা শব্দগুচ্ছের আদিতে শ্বাসাঘাত দেওয়ার প্রবণতার জন্য ষোলমাত্রার স্থানে পয়ার চোদ্দ অক্ষরের এবং চোদ্দমাত্রার হয়েছে। মাত্রামূল্য থেকে অক্ষরমূল্যে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ঝোঁকযুক্ত উচ্চারণ নিঃসন্দেহে তার প্রভাব বিস্তার করেছে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে শ্বাসাঘাত-প্রবণতার জন্য অতিদীর্ঘপর্বের পর যতিপাতও বাঙালির সহিষ্ণুতা ও উচ্চারণধর্মের বিরোধী হ'ল। এইভাবে ত্রয়োদশ, চতুর্দশ শতাব্দীতে বাঙ্‌লা ছন্দ প্রাকৃত ও অপভ্রংশের ধারা আংশিক ভাবে ত্যাগ ক'রে একদিকে অক্ষরমাত্রিকতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'ল, আর একদিকে মাত্রাবৃত্তের পদ্ধতি (যতির বিভিন্নতা সত্ত্বেও) যথাসম্ভব অনুবর্তন ক'রে চল্‌ল। এই অক্ষরমাত্রিকতার পূর্ণপরিচয় কৃষ্ণকীর্তন কাব্যে। এই কাব্য সুবৃহৎ হলেও এবং সূক্ষ্ম ও বিচিত্র ভাবের আধার হলেও মাত্রাবৃত্তরীতি এতে গৃহীত হয়নি। কিন্তু এ কাব্যে এমন বহু কাব্যাংশ বা কবিতা রয়েছে যেখানে অপভ্রংশের মাত্রাবৃত্ত এবং বাঙ্‌লার অক্ষর-মাত্রিক উচ্চারণ পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটেছে। অপভ্রংশ থেকে বাঙ্‌লা ছন্দে সংক্রমণের কালে পুরাতন ও নূতন মাত্রাপদ্ধতির এরকম সহবসতি অস্বাভাবিক নয়। যেমন ধরা যাক—

> নীল জলদ সম কুন্তল ভারা।
> বেকত বিজুলি শোভে চম্পক মালা॥ ইত্যাদি

স্পষ্টতই এ পদটিকে মাত্রাবৃত্ত রীতিতে পাঠ করতে আগ্রহ জন্মে। অর্থাৎ এর 'নী' 'কুন্' 'ভা' 'রা' এবং 'চম্' 'মা' ও 'লা' অক্ষর দু'মাত্রা

হিসাবে ধ'রে প্রতিচরণকে ৮+৮ পর্বে বিভক্ত করার প্রবণতা জাগে। কিন্তু স্বল্পপরেই দেখা যায় এই কবিতাটিতে ৮+৬ এর খাঁটি পয়ারের ঢঙই অনুসৃত হয়েছে—

'প্রভাত সময়ে যেন উয়ি গেল সুর।'
'ললাটে তিলক যেহ্ নবশশিকলা।'
'নাসা তিল ফুল তোর আতি আনুপমা।' ইত্যাদি।

অক্ষরমাত্রিক পয়ারেই গোটা কবিতাটির রচনা সাধিত হয়েছে, মাত্রাবৃত্তে নয়। তবু যেহেতু অপভ্রংশ থেকে অক্ষরমাত্রিক পয়ার-ত্রিপদী জাতীয় ছন্দ এসেছে সেই হেতু প্রাকৃত-অপভ্রংশের মাত্রাপদ্ধতির প্রভাব নব উদ্ভূত অক্ষরমাত্রিক তখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু আজও কি সম্যক পেরেছে? আজও কি রবীন্দ্রনাথের মত ঋদ্ধিমান্ কুশল কবির রচনায় অক্ষরমাত্রিক ছন্দে যৌগিক অক্ষর সীমিত দু' একটি ক্ষেত্রে দু'মাত্রার মূল্য লাভ করে নি? পূর্বে এরকম মিশ্রণ ছিল বেশী, এখন নেহাৎ স্বল্প, এই তফাৎ। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ, যাঁর চণ্ডীমঙ্গল ১৬০০ খ্রীঃ এর পরে লেখা হয়েছে, তিনি অক্ষরমাত্রিক রীতিতেও ব্যঞ্জনান্ত যৌগিক অক্ষরকে প্রয়োজনবশে দু'মাত্রার মূল্য দিয়েছেন। যেমন—

মধ্যযুগের অনিয়তত্য

"**ধন্য** বাঁকুড়া রায় ভাঙ্গিল সকল দায়"
"**শূন্যে** করিয়া স্থিতি চিন্তিলান মহামতি
সৃষ্টির উপায়-করণ॥"
"**কার্তিক** মাসে হৈল হিমের জনম"
"**পৌষে** সকল ভোগ সুখী সর্বজন"
"**স্তম্ভিত** শরধনু দেখি মহাবীরে।" ইত্যাদি

পদাবলী দেখা যাক্। মাধবদাসের রাগাত্মিক কালীয়দমনের পদ—

ব্রজবাসীগণ হেরি আনন্দচন্দ।
হেরই ভূখল চকোরক ছন্দ॥
... ...
(বী) বিষ জলে জনু দাহন ভেল।
ব্রজপ্রেমামৃতে শীতল কৈল॥ ইত্যাদি।

এ পদটিকে অল্পস্বল্প এদিক-ওদিক ক'রে ৮+৮ এর মাত্রাবৃত্ত ঢঙে অথবা ৬+৫ এর অক্ষরমাত্রিক একাবলী ছন্দে পড়া যেতে পারে। প্রাচীনের যেখানে এরকম গোলযোগ দেখা যাবে সেখানে কবিতাটি ঠিক কোন্ ছন্দে রচিত এ নির্ধারণ করতে গেলে সমস্ত কবিতাটি ভালো ক'রে পড়ে দেখতে হবে কবি ঠিক কোন্ পদ্ধতিতে রচনা করতে চেয়েছেন।

অক্ষরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত এই দুই পদ্ধতির প্রাথমিক মিশ্রণের পর অপভ্রংশ-জাত 'ভাষা'-ছন্দ দুটি পৃথক্ রীতিতে বিভক্ত হয়ে পড়ল। একটি খাঁটি অক্ষরবৃত্ত বা অক্ষরমাত্রিক (বর্তমানে যেখানে অক্ষরমাত্রেই ১ মাত্রা, ব্যতিক্রম স্থলে ছন্দঃপতনের ভুল গণনা করা উচিত), আর একটি মাত্রাবৃত্ত বা পুরাতন মাত্রামূলকতার অনুগামী। আধুনিক বাঙ্‌লা মাত্রাবৃত্তে যৌগিক অক্ষর (ঐ, ঔ, আই, আউ, অন্ পুন্ সন্ বক্ চম্ প্রভৃতি) আবশ্যিক দীর্ঘরূপে, আর, মৌলিক দীর্ঘ অক্ষরগুলি (আ, ঈ, ঊ, এ, ও) প্রয়োজন অনুসারে দীর্ঘরূপে গৃহীত হয়। অপভ্রংশ মাত্রাবৃত্তে ঠিক এই ব্যাপারই রয়েছে অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ ভাবে। বলা যেতে পারে যে মৌলিক দীর্ঘ অক্ষরগুলির হ্রস্বীকরণ বাঙ্‌লার থেকে কম, এই পর্যন্ত। প্রাকৃত-পৈঙ্গল রচয়িতা ভূমিকায় যে নিয়মগুলি দিয়েছেন তা স্মরণ করা যাক্—

> "যুক্তাক্ষরের পূর্বেকার বর্ণটি গুরু অর্থাৎ দীর্ঘ নাও হতে পারে। লঘুস্বরযুক্ত বর্ণ প্রয়োজনবশে দীর্ঘ পঠিত হতে পারে। দীর্ঘবর্ণ লঘুভাবে পাঠের প্রয়োজনে লঘুই হয়। আর দ্রুত পঠিত হ'লে দুতিনটি বর্ণও একটিমাত্র বর্ণের মূল্য গ্রহণ করতে পারে।"
>
> (প্রাঃ পৈঃ ৬—৮)

সংস্কৃতের বানান-অনুসারী সুনির্দিষ্ট হ্রস্বদীর্ঘ মাত্রিকতা থেকে প্রাকৃত ও অপভ্রংশ বানানের এই প্রয়োজন-মাত্রিকতা বাঙ্‌লা ছন্দের বিচারকদের অবশ্য অনুধাবনযোগ্য। জয়দেবও নানাস্থানে ছন্দের জন্য ভাষার ব্যাকরণগত শুদ্ধতা উপেক্ষা করেছেন। এই

বিশৃঙ্খলা যদি অপভ্রংশের বৈশিষ্ট্য হয়, ভাষার পক্ষে আরও অধিক বৈশিষ্ট্য-সূচক। অর্থাৎ, অপভ্রংশ ও ভাষার ছন্দে অক্ষরের হ্রস্বতা দীর্ঘতা বানানের হ্রস্বতা-দীর্ঘতার উপর সর্বত্র নির্ভরশীল নয়। আ, ঈ, এ প্রভৃতি কোথাও দীর্ঘ, কোথাও হ্রস্ব হতে পারে। পূর্বকল্পিত সুরতালের নিয়মানুসারেই অক্ষরের হ্রস্বতা-দীর্ঘতা, সংস্কৃতের মত বানান ও উচ্চারণের স্থিরনির্দিষ্ট ঐক্য এক্ষেত্রে অচল। **ফলতঃ একথা স্বীকার করতেই হয় যে বাঙ্‌লা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ অপভ্রংশের মাত্রাবৃত্তেরই প্রসারিত রূপ, এ প্রায় অপরিবর্তিত অপভ্রংশ ছন্দই, অক্ষরমাত্রিক পয়ারজাতীয় ছন্দের মত নবগঠিত নয়।** অপভ্রংশ মাত্রাবৃত্ত তার পূর্বতন বিশৃঙ্খলা নিয়ে বাঙ্‌লা মাত্রাবৃত্তের মধ্যে তার ধারা বজায় রেখেছে। অপভ্রংশ ছন্দ বিচারের প্রারম্ভে প্রাকৃতের পিঙ্গল যে নির্দেশ দিয়েছেন সেরকম অনিয়ততা পদাবলীর মাত্রাবৃত্তে প্রচুর। এরকম অনিয়ম সম্পর্কে কারও কারও বক্তব্য এই যে, ওগুলি গান, ছন্দোবদ্ধ কবিতা নয়, তাই একমাত্রা স্থানে বাহ্যতঃ একাধিক মাত্রা এবং একাধিক মাত্রা স্থানে বাহ্যতঃ লঘুস্বর দেখা যায়। কিন্তু এ অভিমত গ্রাহ্য নয়। পদাবলী পরে গীতে প্রযুক্ত হ'লেও এর রচয়িতারা ছন্দোবদ্ধ কবিতাই রচনা করেছেন। আর, যেখানে অনিয়ততার সঙ্গে নিয়মানুবর্তিতার দৃষ্টান্ত আনুপাতিক হিসাবে দশ এবং নব্বই সেখানে নির্দিষ্ট ছন্দঃপদ্ধতিতে রচনাকেই কবি-অভিপ্রায় হিসাবে গণনা করতে হয়। গায়ক এবং পুঁথির লিপিকারেরাও কবিদের মূল ভাষার উপর নানা যোগ-বিয়োগ চালিয়েছেন, এটুকুও এ প্রসঙ্গে ভেবে দেখতে হবে।

এবং তার কারণ

তা ছাড়া সেকালের কতকগুলি উচ্চারণ-প্রবণতাও ঐ নিয়ম বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করেছে বলা যায়। যেমন, একটি হ'ল তদ্ভব এবং তদ্দৃষ্টে তৎসম শব্দেরও অন্ত্য স্বরের বিলোপ। এই ব্যাপারটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে তার আধুনিক রূপ দিতে বহুলাংশে সহায়তা করেছে এবং অপভ্রংশ-জাতীয় মাত্রাবৃত্তেও নিঃসন্দেহে প্রভাব বিস্তার করেছে। এই অন্ত্য

স্বরধ্বনির বিলোপের জন্যই শব্দের শেষের আধুনিক ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর আজ তার পূর্ব-উচ্চারণের অর্থাৎ স্বরান্ত ২ অক্ষরের ২ মাত্রার মূল্য রক্ষা করছে। যেমন,

"মহাভারতের (অ) কথা অমৃত সমান (অ)"
"শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর"

বর্তমান উচ্চারণে শব্দান্তিক তের্ দের্ মান্ তল্ প্রভৃতি যদিচ এক অক্ষর, তবু ছন্দের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল পূর্বস্মৃতি নিয়ে ২ মাত্রা। কিন্তু কেবল অন্ত্যস্বরই নয়, শব্দের মধ্যবর্তী স্বরও মধ্যযুগের শেষদিক থেকে লোপ পেয়ে উচ্চারিত অক্ষর ও প্রদত্ত মাত্রার বৈষম্য ঘটিয়েছে—আপনা =আপ্না, রাঁধনা=রাঁধ্না, রাজকন্যা=রাজ্কন্যা প্রভৃতি। পদাবলীতে এবং কৃত্তিবাসাদির রামায়ণাদিতে অক্ষর ও মাত্রার যে আপাত-বৈষম্য দেখা যায় সেও ঐ উচ্চারণ-রূপান্তরেরই ফল। আধুনিক বাঙ্লায় পূর্বেকার সমস্ত অনিয়ম ধীরে ধীরে একটা শৃঙ্খলার মধ্যবর্তী হয়েছে। যেমন বলা যায় যে, যৌগিক অক্ষর আজকের কবিদের মাত্রাবৃত্তে সর্বত্র আবশ্যিক দীর্ঘতা লাভ করেছে। অক্ষরবৃত্তে যৌগিক অক্ষরের প্রসারণ এত স্বল্প হয়ে পড়েছে যে তা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। মৌলিক দীর্ঘ (অথচ সাধারণ উচ্চারণে হ্রস্ব) অক্ষরগুলির মাত্রামূল্য মাত্রাবৃত্তছন্দের ক্ষেত্রে এখনও নিয়মের মধ্যে আসেনি, ভবিষ্যতে হয়ত আসবে। পদাবলীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে স্পষ্ট দেখা যায়, ঐ যৌগিক অক্ষরের অবশ্যদীর্ঘতা সেখানে মাত্রাবৃত্তেও সর্বত্র প্রতিপালিত হয়নি, অপভ্রংশ-চালিত অনিয়ম তখনও বিদ্যমান রয়েছে—

"হৃদয় **মন্দিরে** মোর কানু ঘুমাঅল
প্রেম প্রহরী রহু জাগি।"
"স্বেদ-মরন্দ **বিন্দু বিন্দু** চূয়ত"
"তা সঞে জড়িত **কণ্ঠ**গত নিরখত
অবহুঁ জীবন ঘনশ্যাম।"

অথচ আধুনিক বাঙ্লায় মাত্রাবৃত্তে সুকবির লেখায় যৌগিক অক্ষরের দীর্ঘীকরণ হয়নি এমন একটি দৃষ্টান্তও আছে কিনা সন্দেহ।

এই আলোচনার পর বাঙ্‌লা ছন্দের মূলগত প্রকৃতি সম্বন্ধে দু একটি কথার অবতারণা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর "বাঙ্‌লা ছন্দের মূলসূত্র" নামক মূল্যবান্ গ্রন্থে পূর্বেই কিছু আলোকপাত করেছেন।

ছন্দের মূল স্বরূপ

আমরা কয়েকটি বিশেষ কারণে এ প্রসঙ্গের পুনরুত্থাপন করছি মাত্র। আমরা দেখছি অপভ্রংশের মাত্রামূলক ছন্দঃপদ্ধতি থেকে বাঙ্‌লা দুই রীতির ছন্দ এসেছে—অক্ষরমাত্রিক এবং মাত্রাবৃত্ত। প্রথমটি ধীরে ধীরে অপভ্রংশ থেকে স্বরূপে অনেকটা ভিন্ন হয়ে পড়েছে, দ্বিতীয়টি সুরধর্মে অপভ্রংশের স্বরূপ আজও বজায় রেখে চলেছে। সংস্কৃত থেকে অপভ্রংশ ছন্দোরীতি ভিন্নজাতীয়, অথচ বাঙ্‌লা হ'ল অপভ্রংশের সজাতীয়। বাঙ্‌লা ছন্দের আলোচনায় সংস্কৃতের মাত্রা বা অক্ষরের উচ্চারণরীতির উল্লেখের প্রয়োজন নেই। সংস্কৃত বৃত্ত বা ছন্দ লঘুগুরু বর্ণ সংস্থাপনের উপর নির্ভরশীল। অক্ষরের সংখ্যা বিভিন্ন ছন্দে ভিন্ন হলেও লঘুগুরু অক্ষরের বিচিত্র ব্যবহারই ঐ ছন্দের বৈচিত্র্যের মূলে। ৬, ৮, ১০, ১২ প্রভৃতি অক্ষর বা মাত্রার পর যতির নির্দেশ থাকলেও যতির মূল্য সেখানে এত গৌণ যে তা ছন্দের নিয়ামক নয়। অথচ অপভ্রংশ থেকেই যতি তার প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। হীর, তিভঙ্গী, দুন্মিল, দণ্ডকল, রসিকা, রোলা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত স্বল্পমাত্রিক যতির ছন্দে যতির প্রাধান্য লক্ষণীয়। নিঃসন্দেহে গদ্যে এবং কথোপকথনেও যতি আপনার প্রভাব বিস্তার করছিল। এই ক্রম-অভিব্যক্ত যতি-প্রাধান্য কতটা অনার্য মিশ্রণের ফল, কতটাই বা স্বকীয় সংগীতের রূপ থেকে প্রভাবিত তা অনুসন্ধানের বিষয়। একই সঙ্গে অপভ্রংশে মাত্রা-যোজনায় পূর্ববর্তী সুনির্দিষ্টতার লঙ্ঘনও লক্ষ্য করবার বিষয়। আবার বাঙ্‌লাতে এসে দেখছি তিন রীতির ছন্দের মধ্যে ছড়ার ছন্দে বা **শ্বাসাঘাত ছন্দেই যতি মুখ্যতম, মাত্রাবৃত্তে এ তিনের মধ্যে গৌণতম**। এ পার্থক্যটুকু যার ছন্দোবোধ আছে তিনিই ধরতে পারবেন। এরই সঙ্গে দ্রুত মধ্য ও বিলম্বিত লয়ের পার্থক্যও একত্র বিচারযোগ্য। আবার যতিকে

যদি সংগীতের তাল-পাতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখি তাহ'লে একথা স্বীকার করতেই হয় যে বাঙ্‌লা ছন্দ সংগীতাত্মক, সেইসঙ্গে তালাত্মকও। এই তালাত্মকতা ত্রিবিধ ভঙ্গির তিনটি ঠাটে নিজকে বিন্যস্ত করেছে। একটি অক্ষরমাত্রিকতার ঠাট যেখানে যৌগিক-অযৌগিক ১ অক্ষর=১ মাত্রা, (গরমিল অর্থাৎ ব্যতিক্রমের স্থানে এখন ছন্দোদোষ বলেই ধরতে হবে, যেহেতু দেখতে হবে যে মধ্যযুগের বাঙ্‌লায় এই বিশৃঙ্খলা পুনঃপুনঃ ঘটেছে, অথচ আধুনিক বাঙ্‌লায় ব্যতিক্রম বিরল হয়ে আসছে এবং এই পয়ারজাতীয় ঠাট ক্রমশঃ পূর্ণ অক্ষরমাত্রিক রূপ লাভ করতে চাইছে)। দ্বিতীয়টি মাত্রাবৃত্তের ঠাট, যেখানে ছন্দোরূপ নিয়ত যৌগিক-দ্বিমাত্রিক এবং মৌলিক-অনিয়তমাত্রিক এবং যা অপভ্রংশের মাত্রাবৃত্তেরই বিস্তৃতি ব'লে সহজেই অনুধাবন করা যায়। আর তৃতীয়টি হল নিয়ত-চতুর্মাত্রিক। এইভাবে বাঙ্‌লা ছন্দের একত্ব ও বৈচিত্র্যের স্বরূপ সহজে অনুভূত হতে পারে। এইভাবে মাত্রাত্মকতা এবং পর্বাত্মকতার বিরোধেরও সমন্বয় ঘটতে পারে। অমূল্যধনবাবুর মতে মাত্রা বাঙ্‌লা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় নয়। ঠিক কথা, কিন্তু তা সুরাত্মক মৌলিকতার বহিরঙ্গও নয়। যেমন মাত্রা সংগীতের বহিরঙ্গ নয়। কোন্‌খানে কত মাত্রা বসবে গানে এ যেমন সুর বা সুরযুক্ত তালপদ্ধতির উপর নির্ভর করে, ছন্দে তেমনি ঠাটের উপরে নির্ভর করে। কিন্তু একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে এই অনিয়মের মধ্যেও কিছু নিয়ম অবশ্যই রয়েছে। সে নিয়ম পর্ববিন্যাসের নয়, মাত্রাপদ্ধতির। পর্বগত উচ্চারণের ভঙ্গিটি একটি সাধারণ ভঙ্গি, কিন্তু এর কোন্ বিশেষ রূপ নিয়ে তিনটি ঠাট ভিন্ন হয়েছে সেকথা পর্ববিভাগ বলতে পারে না। মাত্রাবিভাগ অনেকটা বলতে পারে, যেমন—

অনিয়মের মধ্যেও নিয়ম

(১) ছড়ার ছন্দে প্রতিটি পর্ব অবশ্য চারমাত্রার।

(২) অক্ষরমাত্রিকে প্রতিটি অক্ষর (Syllable) ১ মাত্রার। শব্দের শেষের ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর তার পূর্ব ইতিহাসের স্মৃতি অনুসারে (২ অক্ষর=২ মাত্রা)

(৩) মাত্রাবৃত্তে যৌগিক অক্ষর নিয়ত ২ মাত্রার।

আমরা বলি, মাত্রা বর্জনীয় নয়, এবং তাল নিয়ে, মাত্রা নিয়ে, সুর নিয়ে সংগীতের ঐক্যবোধই বাঙ্‌লা ছন্দে। এককালে পয়ারাদি অক্ষরমাত্রিক ছন্দ সুর ক'রে পড়া হত, সংগীতে প্রযুক্ত হত। কীর্তনেই মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রথম পরীক্ষা এবং ঝুমুর জাতীয় নৃত্যসম্বলিত কোল-সম্পর্ক থেকে আগত গীত ছড়ার ছন্দেই নিবদ্ধ হয়েছিল। বাঙ্‌লা কাব্যাঙ্গ সংগীতের সঙ্গে কাব্যের এই একাত্মক সম্পর্কটি অনুধাবন করতে হবে। আমাদের মনে হয়, ভারতীয় সংগীত-পদ্ধতি তার তাল নিয়ে অপভ্রংশ ছন্দঃপদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং তারই অনুবর্তন চলেছে ভাষাগীতে। জয়দেবের সংগীতগুলির প্রারম্ভে ঠিকই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে "যতিতালাভ্যাং গেয়ম্।" কৃষ্ণকীর্তনের ৮+৭, ৬+৫, ৬+৪, ৮+৮+১০ প্রভৃতি পর্ববিভাগের কবিতাগুলি ঐ যতিতালের যোগে গেয় গীতও বটে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙ্‌লার সব কাব্য সম্পর্কেই এই কথা খাটে।

সংগীত ও কবিতায় যতি ও মাত্রার সাম্য

আমি কয়েকটি প্রাচীন ও আধুনিক গীতের তালচিহ্ন নির্দেশ করছি। পাঠকেরা দেখুন কবিতা হিসাবে যতিবিভাগের সঙ্গে তার মিল আছে কি নেই। দৃষ্টান্তগুলিতে পর্বের মাত্রাসংখ্যার দিক গণনা করা হচ্ছে না, কারণ টানের জন্য মাত্রা দ্বিগুণ, চতুর্গুণ হতে পারে, সুরে ও তালে ফেলতে গিয়ে পাঠ্য অক্ষরের মাত্রাও পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু কবিতার যতি ও গানের তাল (বা ফাঁক) এর মোটামুটি সংগতি আছেই—

> হৃদি বৃন্দাবনে বাস | যদি কর কমলাপতি
> ওহে ভক্তিপ্রিয় আমা(র) | ভক্তি হবে রাধা সতী—ইত্যাদি

কবিতার হিসাবে আটমাত্রার অক্ষরমাত্রিক ছন্দ। গান হিসাবে ১০ মাত্রার ঝাঁপতালে গেয়, ধা গে ধা গে ধিন্ঃ তা গে ধা গে ধিন্।

পাঁচ মাত্রার পর ফাঁক (=পর্বাঙ্গ "হৃদি বৃন্দা") এবং দশ মাত্রার পর শম=কবিতা হিসেবে পর্বের যতি।

মন্‌রে কৃষি | কাজ্‌ জান না
(এমন) মানব্‌ জমিন্‌ | রইল পতিত্‌ | আবাদ্‌ করলে | ফল্‌ত সোনা
—ইত্যাদি

কবিতায় চারমাত্রার ছন্দ। গানে একতালায় ঠিক ঐখানেই ছ'মাত্রার যতি ও তাল (৬+৬=১২)।

তোমারেই করিয়াছি | জীবনের ধ্রুবতারা
এ সমুদ্রে আর কভু | হবনাক পথহারা —ইত্যাদি

পূর্বেকার মত আটমাত্রার অক্ষরমাত্রিক, দশমাত্রার ঝাঁপতাল। চারমাত্রার পর পর্বাঙ্গ, ঐখানেই পাঁচমাত্রার পর ঝাঁপতালের ফাঁক।

॥ ॥ ॥
(জয়) তব বিচিত্র আ | নন্দ হে কবি |
জয় তোমার করু | ণা
॥ ॥ ॥
(জয়তব) ভীষণ সব | কলুষ নাশন | (রুদ্রতা)
॥
(জয়) অমৃত তব জয় | মৃত্যু তব জয় |
॥ ॥
(জয়) শোক তব জয় | সান্ত্বনা ইত্যাদি

পাঠ্য কবিতা হিসাবে সাতমাত্রার, গীত হিসাবেও সাতমাত্রার তেওড়া ছন্দ। ৩+২+২ পর্বাঙ্গ, তেওড়ার তাল বিভাগও ৩+২+২।

॥ ॥
(তাঁরে) আরতি করে | চন্দ্র তপন
॥ ॥
দেব মানব | বন্দে চরণ
॥ ॥ ॥ ॥
আসীন সেই | বিশ্বশরণ | তাঁর জগত | মন্দিরে

ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত। গীতে চৌতাল ১২ মাত্রার, ছয় মাত্রার পর ফাঁক।

এমন দিনে তারে | বলা যায়,
এমন ঘন ঘোর | বরিষায়
এমন মেঘস্বরে | বাদল ঝর ঝরে
তপনহীনঘন | তমসায় ইত্যাদি।

সাত মাত্রার মাত্রাবৃত্ত। সাত মাত্রার তেওড়া। ৩+২+২ অথবা ৩+৪ পর্বাঙ্গ। তেওড়ার মধ্যবর্তী তালের সঙ্গে সংগত্।

হিংসায় উন্ | মত্ত পৃথ্থী | নিত্ত্য নিঠুর | দ্বন্দ্ব

ষণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত। ছয়মাত্রার দাদরা। প্রথম তিনমাত্রার পর ফাঁক ও পর্বাঙ্গ।

তুমি কি কেবলি ছবি | শুধু পটে লিখা |
ঐ যে সুদূর নীহা | রিকা
যারা ক'রে আছে ভিড় | আকাশের নীড়
ওই যারা দিন রাত্রি |
আলো হাতে চলিয়াছে | আঁধারের যাত্রী —ইত্যাদি

কবিতার ৮ ও ৬এর পর্ব=গীতের আটমাত্রার কাহারবা। কবিতার ছয়ের সঙ্গে গীতের আটমাত্রার সংগতি রক্ষার প্রয়োজন ছাড়া সর্বত্র পর্বশেষে শম।

নিদ নাহি আঁখি | পাতে।
তুমিও একাকী | আমিও একাকী | আজি এ বাদল | রাতে।

ছয়মাত্রার অক্ষরমাত্রিক। বারো মাত্রার একতালা (৩+৩+৩+৩)

তোমরা হাসিয়া | বহিয়া চলিয়া | যাও
কুলুকুলু কল | নদীর স্রোতের | মতো —ইত্যাদি

ছয়মাত্রার মাত্রাবৃত্ত। বারো মাত্রার একতালা। পর্ব-পর্বাঙ্গের যতির সঙ্গে তাল ও ফাঁকের মিল দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙ্‌লার যা কাব্য তাই সংগীত। গেয় নয় এমন কাব্য তখন স্বল্পই ছিল। চর্যাগীতি রাগরাগিণী মিশ্রিত সুরতালে গেয় কাব্যসংগীত। 'কৃষ্ণকীর্তন'ও তাই। এক কৃষ্ণ-কীর্তনের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায় রাগরাগিণী সংবলিত সুরের সঙ্গে শব্দার্থময় কাব্যকে ভাবের দিক থেকে মিশ্রিত ক'রে কত বিচিত্র পরীক্ষামূলক কাব্য-সংগীতের চর্চা চলেছিল! "পাঁচালী"* নামে খ্যাত গানের ঢঙের প্রবর্তয়িতা কৃত্তিবাস (?) তখন কাব্যসংগীতের এক নূতন দ্বার উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন। কীর্তন কাব্য-সংগীতেরই একটি উচ্চাঙ্গের রীতিবিশেষ। ভাটিয়ালি দেশী রীতি। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের তরজা এবং টপ্পা বিদেশ থেকে আগত। এ সবই বিশেষ রীতি বা প্রকারের গীত এবং প্রচলিত রাগসংগীতের সঙ্গে এগুলির মৌলিক সম্পর্ক নেই। কিন্তু কাব্যের শব্দার্থবাহিত ভাবের সঙ্গে এসব বিচিত্র রীতির গানের আত্মিক সম্পর্ক ছিল। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্‌লার ঐ উদার উন্মুক্ত সংগীত-সভায় তার পূর্বতন ঐতিহ্যের সমুচ্চ বাহকরূপেই উদিত হয়েছিলেন। তাঁর বিশেষত্ব এই যে তিনি একাধারে কাব্যাঙ্গের রচয়িতা এবং সুরযোজয়িতা। প্রাচীন ও মধ্য-যুগে এ বৈশিষ্ট্য সকলের ছিল না। হয়ত কৃত্তিবাসের ছিল, দ্বিজরাম-দেবের ছিল, জয়ানন্দ-লোচনদাসের ছিল, বৈষ্ণব পদকর্তাদের অনেকের ছিল, কিন্তু চণ্ডীদাস, মুকুন্দ, ভারতচন্দ্রের ছিল না। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ তাঁর কাব্যের প্রারম্ভে বলছেন—"লিখি পড়ি নানা গ্রন্থ, না জানি সংগীতপন্থ" এবং "অনভিজ্ঞ তালমানে, কেমনে বুঝাব আনে"। কিন্তু তাঁর এ দুশ্চিন্তা থেকে অবিলম্বে মুক্তি ঘটল রাজা বাঁকুড়ারায়ের আনুকূল্যে। তিনি চণ্ডীকাব্যের গায়েন স্থির ক'রে তাঁকে ভূষণ চন্দন

মধ্যযুগের কাব্যের গীতে প্রযুক্তি

---

* পাঁচালি=পঞ্চালক (সং), স্ত্রীত্ব করায় পঞ্চালিকা। অর্থ—দোহার সহযোগে আবৃত্তিগীত। পঞ্চালিকা শব্দের অন্য অর্থ পুতুল হলেও তার সঙ্গে 'পাঁচালি'র কোনো সম্বন্ধ নেই।

দিয়ে সম্মানিত করলেন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের এরকম গায়েন ছিলেন ডীউসাঁই নীলমণি। এইভাবে কাব্যরচয়িতা ও সুরপ্রযোক্তার ব্যক্তিত্ব এক না হ'লেও কাব্য ও গীতের, কথা-ও-সুরের একাত্মকতা ব্যাহত হয় নি। অবশ্য গায়ক পৃথক্ ব্যক্তি হওয়ায় কদাচিৎ কাব্যকে অতিক্রম ক'রে রাগরাগিণীর শুদ্ধতা রক্ষার দুরূহ প্রয়াস এবং কসরতের মোহ্ যে বিস্তার লাভ করেনি এমন নয়, কিন্তু বিস্মৃতপ্রায় আখড়াই, হাফ-আখড়াই প্রভৃতি দু'একটি ক্ষেত্র ছাড়া এর পরিচয় পাওয়া যায় না। যাই হোক্ সেকথা গীতানুসন্ধিৎসুর পক্ষেই বিশেষভাবে বিবেচ্য, আমাদের শুধু এই কথা মনে রাখলেই চলবে যে **কাব্যের ছন্দ এবং গীতের ছন্দ একাত্মক হয়েই বাঙ্‌লায় প্রবেশলাভ করেছে।** এমন কি এটুকু বুঝলেও সত্যভ্রষ্ট হওয়া যাবে না যে, অপভ্রংশের যুগে সংস্কৃতাপেক্ষা যে যতিপ্রাধান্য, যতিবৈচিত্র্য, অন্ত্যানুপ্রাস প্রভৃতি দেখা দিয়েছিল সে ঐ গীতেরই প্রভাবে, সুরতালের পটভূমিতে রচিত ছন্দে – যার পূর্ণপ্রকাশ গীতগোবিন্দে। আমাদের আরও মনে হয়, বাঙ্‌লা লিখনরীতির এক দাঁড়ি (।) দু-দাঁড়ি (॥) চিহ্ন তালবিভাগের সম্পূর্ণতা বোঝাবার জন্যেই প্রযুক্ত হয়েছিল, ভাব সমাপ্তি দ্যোতনার জন্য নয়। এই হিসাবে একটি চরণ সম্পূর্ণতার জন্য অন্য চরণের অপেক্ষাধীনও ছিল। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে ত্রিপদীতে দৃশ্যতঃ যে দ্বিতীয় চরণে দাঁড়ি পড়ছে তা লেখা বা ছাপার মহিমায়, নতুবা পর্বসামঞ্জস্যের দিক থেকে ঐখানেই যতি-শেষ ও প্রথম চরণ শেষ।

ছন্দোবিৎ প্রবোধ চন্দ্র সেন মহাশয় গীত ও কাব্যের এই সুরতালের একত্ব বিষয়ে একমত নন দেখছি। তিনি উদাহরণে দেখাচ্ছেন—ঐ আসে+ঐ অতি+ভৈরব—ইত্যাদি গীতে প্রযুক্ত বিখ্যাত কবিতাটির রূপ। কিন্তু এখানে দেখতে হবে কবি নাচের তাল রক্ষণের জন্যই ছ'মাত্রার স্থানে জোর ক'রে চার মাত্রা লাগিয়েছেন। অন্যত্রও ঐ নিয়মে তাল-ফেরতার জন্যও পরিবর্তন দেখানো যায়। একেই স্বাভাবিক মনে করলে ভুল করা হয়।

প্রয়োজনভিত্তিক দু' একটি ক্ষেত্র ছাড়া রবীন্দ্রনাথ সচরাচর পাঠ্য কবিতার গেয় গীতরূপে যতি ও তালের হেরফের ঘটান নি।

শ্রদ্ধেয় অমূল্যধনবাবু তাঁর গ্রন্থে গীত ও তালের সঙ্গে বাঙ্‌লা কবিতার সামঞ্জস্যের দিকটি ধরেন নি এমন নয়, কিন্তু একে তেমন সম্প্রসারিত ক'রে দেখেন নি। হ'লে দেখা যায় কবিতার পর্বে (পর্বাঙ্গেও) সংগীতের তালপাত ঘটছেই, আর এ বাঙ্‌লার তিন ঠাটের কবিতা সম্পর্কেই সমান ভাবে প্রযোজ্য। সংগীতের যতিই কবিতার যতি না হ'লে প্রাচীন বাঙ্‌লা কাব্যমাত্রেই সংগীতে প্রযুক্ত হওয়ার যৌক্তিকতা লাভ করত না। কৃত্তিবাসের পাঁচালি পয়ারকে আশ্রয় ক'রে পড়ে উঠত না। *মুকুন্দ প্রমুখ কবিগণ তাঁদের কবিতার সঙ্গে সম্ভাব্য গীতের ছন্দোগত একাত্মকতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া বিষয়ে শঙ্কা প্রকাশ করতে পারতেন না। বাঙ্‌লা ছন্দের এই মৌলিক গীতাত্মকতার জন্যই অক্ষরের মাত্রা সবক্ষেত্রে সমান নয়, ঠাট (অর্থাৎ ঐ ত্রিবিধ সুরধর্ম বা ভঙ্গি) অনুসারে অল্পবিস্তর পৃথক্, যদিও অক্ষরের প্রসারণ বা সংকোচন সর্বত্রই পূর্বনিহিত সুরতাল অর্থাৎ ছন্দের অনুযায়ী—এই মূল তত্ত্বটি সব ঠাটের পক্ষেই প্রযোজ্য।

এই কারণেই আমরা মনে করি যে সর্বত্র পর্বাঙ্গ-বিভাগও অর্থাৎ অর্ধযতি-বিন্যাসও ঐ তালের অনুসারেই হয়েছে। পয়ারে ৪ মাত্রার পর পর্বাঙ্গ। কোনো শব্দের মধ্যভাগ হ'লেও এই নিয়মই যথাযথ। সুতরাং "কাননে : কুসুম : কলি" এই অর্থানুসারী অথচ তাল-বিরোধী বিভাগের চেয়ে "কাননে কু : সুমকলি | সকলি ফু : টিল" এইরূপ পর্বাঙ্গ বিভাগেরই আমরা পক্ষপাতী। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ পয়ারের এই জোড় মাত্রার চাল ঠিকই লক্ষ্য করেছেন। অবশ্য তিনি যে চারমাত্রার মধ্যেই পূর্ণ যতি স্থাপন করতে চেয়েছেন সে-বিষয়ে মতান্তর ঘটা স্বাভাবিক, কারণ, বাঙ্‌লার চিরন্তন পয়ারের পাঠে বা সুরে আবৃত্তিতে ৮+৬ এতেই পূর্ণযতির স্থির প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। **অর্থবহ গদ্য এবং ছন্দোবহ পদ্যের**

শব্দ ও যতি

* কবিকঙ্কণের নাম মুকুন্দরাম নয়, কেবল মুকুন্দ।

প্রকৃতি পৃথক্‌। ফলে এরকম স্থলেও ছন্দঃপতন ঘটেছে মনে করার কোনো কারণ নেই—

"অন্নপূর্ণা উত্তরিলা | গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডা | কিলা পাটনীরে॥"
"কান্দে রানী মেনকা চ | ক্ষুর জলে ভাসে।
নখে নখ বাজায়ে না | রদ মুনি হাসে॥"
"পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠমাস পা | পিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস"
"অর্ধেক মাঃ নবী তুমি | অর্ধেক কল্ঃ পনা"
উঠিল বিঃ হঙ্গের | প্রত্যুষ গান"

এসব জায়গায় "যতিলোপ" ব'লে কবিকে রক্ষা করারও কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। শব্দ মধ্যে যতি ঠিকই পড়েছে।

বাঙ্‌লা পর্বাঙ্গও যেহেতু তাল অনুযায়ী, সেইহেতু, পর্বের মধ্যে পর্বাঙ্গের বা অর্ধযতির স্থাপনার নিয়ম কখনোই অর্থগত শব্দ অনুসারে হতে পারে না। তাল অনুসারেই হবে—কি অক্ষরমাত্রিকে, কি মাত্রাবৃত্তে। সুতরাং **পর্বাঙ্গের সমকত্বের উপর ছন্দোবোধ নির্ভর করে না, এরকম মন্তব্যও ছন্দঃ সম্পর্কে যথার্থবোধক নয়।** কারণ, সুর ও তাল নিজ প্রয়োজনে পর্ব-পর্বাঙ্গ সৃষ্টি করে। পূর্বে নির্দিষ্ট শব্দ-বিন্যাস অনুসারে যতিতাল-পাত ঘটে না। সেইজন্য নিম্নলিখিতরূপ অর্ধযতি স্থাপনে শব্দের স্বাভাবিক উচ্চারণ ও অর্থের গৌরব রক্ষিত হয় মাত্র, ছন্দঃপ্রয়োজন এবং শ্রুতিসুখকরতা খর্ব হয়ে পড়ে—

পর্বাঙ্গ যতি ও শব্দভিত্তিক না হতে পারে

সপ্‌তাহ : মাঝে | সাতশত : প্রাণ
আলোক : ছায়া | শিব : শিবানী | সাগর : জলে
রাখাল : গরুর : পাল
বাঁধা : বাহু : তার
॥
গ্রাম : রত্ন : ফুলিয়া | জগতে : বাখানি
দেশ : দেশান্তর : মাঝে | যার : যেথা : স্থান
আনন্দে : মোর | দেবতা : জাগিল | জাগে : আনন্দ |
ভকত : প্রাণে

মৃত্যুর : নিভৃত : স্নিগ্ধ ঘরে | বসে আছ : বাতায়ন : পরে।
জ্বালায়ে : রেখেছো : দীপখানি | চিরন্তন : আশায় : উজ্জ্বল

অথচ ঐ সব স্থানের নিম্নলিখিতরূপ সন্নিবেশ অর্থযতির বিরোধী হ'লেও ছন্দোযতিকে রক্ষা ক'রে শ্রুতিকটুতা থেকে আমাদের বাঁচায়—

সপ্‌তা : হ মাঝে | সাতশ : ত প্রাণ
আলোক : ছায়া | শিবশি : বানী | সাগর : জলে
রাখাল গ : রুর পাল
বাঁধাবা : হুতার
॥
গ্রামরত্ন : ফুলিয়া | জগতে বা : খানি
দেশ দেশান্ : তর মাঝে | যার যেথা : স্থান
আনন্ : দে মোর | দেবতা : জাগিল | জাগে আ : নন্দ |
ভকত : প্রাণে

মৃত্যুর নি : ভৃত স্নিগ্ধ : ঘরে
বসে আছ : বাতায়ন : পরে
জ্বালায়েরে : খেছ দীপ : খানি
চিরন্তন : আশায় উজ্‌ : জ্বল।

এরকম শব্দের মাঝখানে ভাঙা দেখায় খারাপ, কিন্তু তাতেই ছন্দোরূপ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। **অর্থের বেতালকে মানা ছন্দের তালদেবতার পক্ষে মর্যাদাহানিকর।** তা ছাড়া না-ভাঙার রীতিকে পূর্ণভাবে মেনে চলা অতিবড় অর্থপণ্ডিতের পক্ষেও সম্ভবপর নয়। ফলতঃ মাত্রাবৃত্তের ছ'মাত্রার পর্বে ৩+৩, পাঁচমাত্রার পর্বে ৩+২, অক্ষরমাত্রিক অথবা মাত্রাবৃত্তের আট মাত্রার পর্বে ৪+৪, অক্ষর-মাত্রিকের ছ'মাত্রায় ৪+২, দশ মাত্রায় ৪+৪+২, সাতের পক্ষে ৩+৪ (কবিকঙ্কণের বিষম চালের ৭+৭+৯ এর গ্রন্থন দ্রঃ) ছড়াজাতীয়ে নিয়তচতুর্মাত্রিকের বেলায় ২+২ এই হ'ল পর্বাঙ্গ-বিন্যাসরীতির সমকত্ব।

বাঙ্‌লা ছন্দের মধ্যে 'অমিত্রাক্ষরে'ই প্রথম শব্দভিত্তিক পর্বাঙ্গের পত্তন দেখি। 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দের রূপটি মধুসূদনের কানে সমগ্রভাবে প্রথমে ধরা পড়েছিল, তার অভ্যন্তরের পর্বাঙ্গ গ্রন্থনের সুষমা তখনও স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়নি। তাই ৮ এর যুগ্মমাত্রার চালে ৩+২+৩ আকারে (অথবা ২+৩+৩) শব্দ সাজানোতে যে ঐ চালে ভুল ঘটে তা মধুসূদন প্রথম ধরতে পারেন নি। দ্বিতীয় সংস্করণ মেঘনাদবধে ঐরকম শ্রুতিকটু অংশগুলি পরিবর্তিত ক'রে ৩+৩+২ শব্দ-গ্রন্থনে পরিণত করেছেন। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

কিন্তু যতি কোথায় শব্দার্থভিত্তিক হবে

১ম সংস্করণের পাঠ	২য় সংস্করণের পাঠ
মৃদু রোদন নিনাদ	রোদন নিনাদ মৃদু
শর আয়ত লোচনে	আয়ত লোচনে শর
প্রচণ্ড শর বর্ষণে বৈরীদল	বরষি প্রচণ্ডশরে বৈরীদলে
সম অটল সমরে	সদৃশ অটল যুদ্ধে
অমরী স্থিরযৌবনা	অমরী আমারা দেব
সাধিতে তোর এ কার্য	সাধিতে এ কার্য তোর

অমিত্রচ্ছন্দ বহুল পরিমাণে ভাবের বা অর্থের অনুগামী ব'লে মধুসূদনই প্রথম প্রয়াস করলেন গোটা একটি শব্দকে পর্বাঙ্গের ভিত্তি করতে। এই কারণে অষ্টমাক্ষরে যতি (১ম সংস্করণে) যেখানে শব্দান্ত হচ্ছে না এমন স্থানও তাঁকে পরিবর্তিত করে নিতে হয়েছিল। যেমন,

১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ
মনস্তাপে। হরষে বিষাদে লঙ্কাপতি	মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে
দেবগৃহ ; বিপণি রঞ্জিত নানা রাগে,	দেবগৃহ ; নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি,
শশীমুখী। ভুবনমোহিনী মূর্তি ধরি,	শশীমুখী, ধরি মূর্তি ভুবনমোহিনী
অটল ; চলিছে বামাদল মধ্যপথে।	অটল। চলিছে মধ্যে বামাকুলদলে।
কোথায় কে জাগে ? মহাক্লান্ত আজি সবে	কোথায় কে জাগে আজি ? মহাক্লান্ত এবে

মধুসূদনই প্রথম বাঙ্‌লা ছন্দের সুরাত্মকতাকে ত্যাগ ক'রে অর্থাত্মকতার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন, অথবা এমন বলাই সংগত যে ছন্দের সঙ্গে অর্থের একটা সামঞ্জস্য সন্ধান করেছিলেন। তাই পূর্বেকার পয়ারে যেখানে অর্থসমাপ্তি ছন্দোময়তার বশীভূত ছিল, অর্থাৎ প্রতি-চরণের অন্ত্যযতিতে অর্থসমাপ্তি বিহিত ছিল, সে নীতি তিনি লঙ্ঘন করলেন। ফলে তাঁর চরণান্ত যতি অত্যন্ত দুর্বল এবং পরবর্তী অর্থচ্ছেদের প্রায় বশবর্তী হয়ে পড়েছে। এরকম অষ্টমাক্ষরের পরবর্তী মধ্যযতিও হয়েছে, কিন্তু একথা *ঠিক* যে, পয়ারের স্বাভাবিক যতি (৮+৬এ) এতে বিবর্জিত হয়নি। ঘন ঘন বিরামের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে মাত্র। সুতরাং বলা যেতে পারে যে তিনি বাঙ্‌লা পয়ারের গীতিধর্মের সঙ্গে বিষয়গত ভাবধর্মের একটা এমন সামঞ্জস্য সাধন করেছিলেন যাতে গীতও রক্ষা পায়, বিষয়গৌরবেরও হানি না ঘটে। তাঁর গদ্য ও পদ্যের এই আশ্চর্য সমন্বয় পরবর্তী নাট্যসংলাপকে একটি স্থায়ী রূপ দান করেছে। অথচ মধুসূদন, চরণান্তে ছেদ বিন্যাস কখনোই করা চলবে না এমন পণ ক'রে লেখনী চালনা করেন নি। যেখানে ভাব-অনুসারে চরণান্তে সমাপ্তি অনায়াসেই ঘটে গেছে সেখানে তাকে মান্য করেছেন, যেমন মিল্‌টন তাঁর Paradise Lost-এ স্বাভাবিক ভাবে আগত চরণান্ত অনুপ্রাসকে পরিবর্তিত করেন নি। **সুতরাং অর্থানুসারে শব্দকে একক ধ'রে পর্বাঙ্গ-ভাবনা মধুসূদনীয় অমিত্রচ্ছন্দে এবং তদনুসারী রীতিতে চলতে পারে, কিন্তু অক্ষর-মাত্রিকেরও অন্যান্য রীতিতে নয়, মাত্রাবৃত্তে বা ছড়ার ছন্দে তো নয়ই।**

আধুনিক **গদ্যচ্ছন্দেও** যতি—আবশ্যিক ভাবে শব্দভিত্তিক। গদ্যচ্ছন্দে প্রবহমান একটি সুরধর্ম আছে ঠিকই, কিন্তু ঐ সুরধর্ম বা Cadence গদ্যরীতির অধীন। এইজন্য নিম্নলিখিতরূপ অংশে পর্বাঙ্গ-বিন্যাস সর্বত্র শব্দশেষে, কোথাও শব্দ-মধ্যে নয়, পর্বের শেষ তো শব্দমধ্যে নয়ই—

মানুষকে : গণ্ডীর মধ্যে : হারিয়েছি।

মিলেছে : তার : দেখা
দেশবিদেশের | সকল : সীমানা : পেরিয়ে। ইত্যাদি।

সুরতালের সংগতিই (অমূল্যধনবাবুর মতে Beat & Bar বা পর্ব-পর্বাঙ্গ) যদি বাঙ্‌লা ছন্দের প্রাণস্বরূপ হয়, তাহ'লে ঐ তিনটি ঠাটের কিরূপ নামকরণ করা যায়? পর্ব-পর্বাঙ্গের অথবা অন্য কোন্ ধর্মের বিশেষ রূপায়ন পৃথক্ ত্রিবিধ ছন্দোরীতির উদ্ভব ঘটিয়েছে? আমরা দেখছি ছড়ার ছন্দে যতি বা তাল নিয়ত চতুর্মাত্রার পর পড়ছে। সুতরাং এখানে মাত্রা বা তালের দিক থেকে (এক একটি তালবিভাগকে চতুর্মাত্রিক ধ'রে) নামকরণের কোন অসুবিধে হচ্ছে না। বলা যেতে পারে, নিয়ত-চতুর্মাত্রিক। কিন্তু অন্য দুটি ঠাট সম্বন্ধে যতি ও মাত্রার পরস্পর-পৃথক্ নিয়মানুবর্তিতা নেই। অর্থাৎ ছয়, আট, পাঁচ অক্ষরের পর যতি যেমন অক্ষরমাত্রিকে তেমনি মাত্রাবৃত্তে। সুতরাং যতি ও মাত্রার মিলিতধর্মের দিক অবলম্বন ক'রে এ দুয়ের নামকরণ চলছে না। অমূল্যধনবাবুর মতে কেবল মাত্রার দিক থেকেও চলছে না, (কারণ তাঁর মতে সবই অনিয়ত-মাত্রিক) এবং এজন্য তিনি আন্তর ধর্মের (যেমন গানের সুর ও রাগের) বা উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর ক'রে নাম দিতে চেয়েছেন তানপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান (এবং শ্বাসঘাত-প্রধান)। আমরা তাঁর এই স্বরূপনির্দেশকে অযৌক্তিক বলছি না, কিন্তু সে প্রসঙ্গে ঐ একদেশবর্তী এবং অব্যাপ্তিজনক লক্ষণ নিয়ে সংজ্ঞা-নির্দেশে দ্বিধাবোধ করছি। যদি বলা যায়, ঐ পরস্পর-পৃথক্ বিশেষ ধর্ম যদি প্রধান হয়, অপ্রধান কী? তানপ্রাধান্য হেতু পয়ারের যে "আশ্চর্য শোষণশক্তি"র উদ্ভব অথবা ধ্বনিপ্রাধান্যের জন্য যে উচ্চারণ-স্পষ্টতার উদ্ভব তাই দিয়ে যদি নাম করা যায় "শোষণমূলক" ও "স্পষ্টোচ্চারণমূলক" ছন্দ তাহ'লেই বা ক্ষতি কী? তা ছাড়া উচ্চারণ বা পাঠরীতিকেই ছন্দোনির্ণয়ের (আবৃত্তির নয়) মূলভিত্তিরূপে ধরলে গোলমালও কম হয় না। "ভূতের মতন চেহারা যেমন" অথবা "পাখী

নাম-সমস্যা ও সার্থক নামকরণ

সব করে রব" ইত্যাদিকে শ্বাসাঘাত দিয়ে চারমাত্রার ক'রে পাঠ করলে পাঠককে নিবৃত্ত করতে পারি এমন স্পষ্ট মাপের দণ্ড কী আছে? এই অস্পষ্টতার জন্যই কি কোনো ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথের মাত্রাবৃত্তে নির্মিত কোনো কোনো কবিতাকে শ্বাসাঘাত ছন্দ ব'লে গ্রহণ করার ভ্রম প্রবর্তিত হয় নি? যেমন—'ঝর্ণা ঝর্ণা, সুন্দরী ঝর্ণা' অথবা "মেঘলা থম থম, সূর্য ইন্দু" প্রভৃতি রচনাকে। যাঁর ছন্দঃসৌন্দর্যবোধ কিছু আছে তিনিই বলবেন এগুলি স্পষ্টতঃ যৌগিক-দ্বিমাত্রিক ছন্দের। পরপর দীর্ঘীকরণে পর্বাঙ্গ কোথাও কোথাও উচ্চারণে দুঃসহ হচ্ছে এই পর্যন্ত।

অপর এক ছান্দসিক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন প্রদত্ত নোতুন নাম—দলবৃত্ত (=শ্বাসমাত্রিক), কলাবৃত্ত (=মাত্রাবৃত্ত=যৌগিক-দ্বিমাত্রিক) এবং মিশ্রকলাবৃত্ত (=অক্ষরমাত্রিক) ছন্দোবোধের এবং পৃথক্‌করণের কোনো সহায়তাই করছে না। শ্বাসাঘাত গ্রথিত পর্বের অক্ষরগুলিকে দল বা পাপড়ি বললে এবং মাত্রাবৃত্তের বিশেষ অক্ষরকে কলা বললে কী উপকার হচ্ছে বোঝা যায় না। সবচেয়ে আপত্তিজনক হ'ল অক্ষরমাত্রিকের মিশ্রকলাবৃত্ত নাম। অত্যন্ত সীমিত ক্ষেত্রে ক্বচিৎ কোনো অক্ষরের দীর্ঘীকরণ এতে হয়ে পড়েছে বলে একে মিশ্র-মাত্রা-বৃত্ত বলতে হবে? বস্তুতঃ এর উচ্চারণরীতি কি তথাকথিত কলাবৃত্ত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন নয়? হাজারে একটা অনিয়মিত দীর্ঘীকরণকে তো ভুল-ত্রুটি বলে গণ্য করাই ভালো।

আসল কথা, লক্ষণে ও নামকরণে এই অনির্দেশ্যতা ও অর্ধ-বাচকতার পথ ত্যাগ না করলেই নয়। গানের দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখি নামকরণের উৎপাত এতে ঠিক খাটে না। কারণ, শুদ্ধ ও মিশ্র, রাগ ও তালের এত বৈচিত্র্য যে শুধু মোটামুটি বিবরণ দিয়েই ক্ষান্ত থাকতে হয়, যেমন, বেহাগ-ঝাঁপতাল, কি আড়ানা-ত্রিতাল অথবা মিশ্রকেদারা-একতালা ইত্যাদি। নামকরণের ঠিক কোনো সমস্যাই এতে নেই। কিন্তু কবিতায় যেহেতু তার ছন্দের প্রকৃতি গাণিতিক ভাবে ধরার যোগ্য এবং নির্ণেয় হয়ে ওঠে সেই হেতু এর নামকরণের প্রয়াস চ'লে আসছে চিরকাল। ফলে বাঙ্‌লাতে আমাদের দেখতে

হবে যে ধরা-ছোঁওয়া-যায় এমন একটি ভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনটি ঠাটকে সুনির্দিষ্টভাবে পৃথক্ করা যায় কিনা। শুধু উচ্চারণের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে শ্রুতিকটু হচ্ছে কি হচ্ছে না এই অস্পষ্টতা ও অনির্দেশ্যতার উপর নির্ভর ক'রে দুরুচ্চারণপরায়ণ পাঠকের সঙ্গে কলহে ছন্দোবিৎএর জয়লাভ সংশয়িত হয়ে পড়ে।

এরকম অবস্থায় মাত্রাকে অবলম্বন করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। মাত্রা ছন্দের মূলভিত্তি নয়, আত্মা নয়, কিন্তু প্রাণ। হ্রস্ব দীর্ঘ বিভিন্ন পর্বরচনার সঙ্গে মাত্রা একাত্ম হয়েই কাজ করে। অক্ষরের মাত্রা সর্বত্র নির্দিষ্ট বা সমমূল্যের না হ'লেও পর্বসামঞ্জস্য অর্থাৎ কয়েকটি তালক্ষেপের একটি বিশিষ্ট পদ্ধতির মূলে বিশিষ্ট পর্বমাত্রিকতা বিদ্যমান। সংস্কৃতের মত অক্ষরের মাত্রা বাঙ্‌লায় স্থিরনির্দিষ্ট না হ'লেও বিভিন্ন ঠাটে এর মিলিত এমন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যাকে অবলম্বন ক'রে ছন্দোবিচার এবং ছন্দঃস্বরূপ নির্ণয় চলতে পারে। এ বিষয়ে তিনটি সূত্র আমরা পূর্বাহ্ণেই নির্দেশ করেছি এবং মাত্রাস্থাপনরীতির গুরুতর বিশৃঙ্খলা থেকে আমরা ক্রমশঃ মুক্তিলাভ ক'রে একটা নির্দিষ্ট পন্থায় যে এসে পৌঁছাচ্ছি এ বিষয়ও উল্লেখ করেছি। এই হিসাবে পয়ার-জাতীয় ছন্দ 'অক্ষরমাত্রিক', মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান 'যুগ্মাক্ষরদ্বিমাত্রিক' এবং ছড়ার ছন্দ 'অনিয়তমাত্রিক অথচ নিয়তচতুর্মাত্রপর্বিক'। পয়ারজাতীয় ছন্দের এই অক্ষরমাত্রিকতা ক্রমশঃ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ব'লে পয়ার-জাতীয় ছন্দকে অক্ষরবৃত্ত বা বর্ণবৃত্ত বললেও এর স্বরূপ স্পষ্টভাবে বিচার-বিশ্লেষণের যোগ্য হয়। পুনশ্চ আমাদের পূর্বেকার কথা স্মরণ করতে হচ্ছে—এই ছন্দে শব্দের শেষের ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরটিকে ষোড়শ শতাব্দীর স্মৃতি অনুসরণে ১+১ দুই মাত্রার গণনা করতে হবে। ঐ অন্ত্য হসন্ত অক্ষরটি বিনা কারণে প্রসারিত হচ্ছে না। এর পিছনে ভাষাবিজ্ঞানের নিয়ম বর্তমান। ভাষার উচ্চারণরীতি নানা কারণে দ্রুত অগ্রগামী, কিন্তু ছন্দোবোধ রক্ষণশীল। সুতরাং এই ছন্দে নগণ্য ব্যতিক্রমস্থল ছাড়া অক্ষরমাত্রেই

নূতন নামকরণে যুক্তি

একমাত্রায়। এই ঠাটের পুরাতন নাম এইভাবে ব্যর্থ হয়ে পড়ে না। তবু আরও স্পষ্ট নির্দেশের জন্য আমরা **'অক্ষরমাত্রিক'** নামটিই পছন্দ করি। দ্বিতীয় ঠাটের পুরাতন নাম 'মাত্রাবৃত্ত' চলে কিনা দেখা যাক। অপভ্রংশ ছন্দের প্রকৃতি বিচার করতে গিয়ে আমরা পূর্বেই দেখেছি যে যদিও সংস্কৃত-প্রাকৃতে অক্ষরের হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্ব স্থির-নির্দিষ্ট ছিল, অপভ্রংশের কাল থেকেই দীর্ঘ স্বরগুলি উচ্চারণে দীর্ঘতা রক্ষা করতে সর্বত্র প্রস্তুত ছিল না। বিশেষত শব্দের শেষে দীর্ঘস্বর থাকলে তাকে হ্রস্ব উচ্চারণ করা এ কালের রীতিতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। যদিও ঐ, ঔ, আই, আউ প্রভৃতি স্বরান্ত যৌগিক এবং যাবতীয় ব্যঞ্জনান্ত যৌগিকের দীর্ঘতা রক্ষার বিধি পরিত্যক্ত হয় নি। অপভ্রংশ থেকে ভাষায় এসে এই প্রবণতারই সম্প্রসারিত রূপ দেখতে পাচ্ছি। এখানে কিছু কিছু বিশৃঙ্খলা (যেমন, মধ্যযুগে যৌগিক অক্ষরকেও তালের বা যতির খাতিরে কোথাও কোথাও লঘু গণনা করা) থাকলেও ধীরে ধীরে একটি বিশেষ উচ্চারণরীতিতে ঐ ছন্দের ক্ষেত্রে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। বর্তমানে ঐ বিশেষ রীতির ছন্দে 'যৌগিক' মানেই আবশ্যিক দীর্ঘ এবং পুরাতন মৌলিক দীর্ঘ এবং মৌলিক হ্রস্ব সবই হ্রস্ব বা লঘু। তথাপি এই ঠাটের ছন্দে যে মৌলিক অক্ষরেরও দীর্ঘীকরণ কোথাও কোথাও চলছে, ছন্দোরক্ষার জন্য আমরা যে পুরাতন (আ, ঈ প্রঃ) দীর্ঘ অক্ষরকেও দীর্ঘ করছি এবং তাতে যে গুরুতর শ্রুতিকটুতার উদ্ভব হচ্ছে না, তার কারণ, আমাদের পূর্বেকার ঐ মাত্রাসমক অপভ্রংশের স্মৃতি। অপভ্রংশেও যা, ব্যাপকভাবে বাঙ্‌লাতেও তাই। এ ঠাটেও মাত্রা হিসাবে গণনার পদ্ধতি একদিক দিয়ে ঠিক, কারণ যৌগিক অবশ্য দ্বিমাত্রার। ফলতঃ এই ঠাটকে যদি **যৌগিক-দ্বিমাত্রিক** বলা যায় তাহ'লে অন্ততঃ একটা স্পষ্ট মূর্তির ও ধরা-ছোঁওয়া-যায় এমন একটা যথাযথতার মধ্যে এসে পৌঁছানো যায়। সমস্ত উচ্চারণধর্ম বজায় রেখে অপভ্রংশ ছন্দের বাঙ্‌লায় এই অনুস্মৃতির বিষয়টি অনুধাবন করলে আটমাত্রার যতিপাত-মূলক বিশেষ ঠাটটিকে "প্রত্নমাত্রাবৃত্ত" নামে চিহ্নিত করারও আবশ্যকতা

থাকে না। মৌলিক অক্ষরের দীর্ঘীকরণের আধিক্যের দিক থেকেও ভিন্ন নামকরণ যুক্তিসহ হয় না। আজও ঐ ঠাট চলছে, রবীন্দ্রনাথের হাতেই চলছে, যদিও একথা সত্য যে এর ব্যবহার এবং আবেদন কমে গেছে। ছড়ার ছন্দকে পর্বের দিক থেকে **চতুর্মাত্রিক** বলা যায়, কিন্তু যেহেতু অন্য দুটি ঠাটকে আমরা অক্ষরবর্তী মাত্রার দিক থেকে বিবেচনা করেছি, সেইহেতু, সংগতিরক্ষার জন্য **শ্বাসমাত্রিক** এই নামটিই আমরা বেছে নিচ্ছি। ছড়ার ছন্দের ধর্মই এই যে এতে একাধিক অক্ষরকে সংকুচিত ক'রে বা একাক্ষরকে প্রসারিত ক'রে চার মাত্রার পর যতিপাত ঘটাতে হয়। চারমাত্রার পর ঐরকম পূর্ণযতি অন্য দুইরীতির ছন্দে নেই। অবশ্য অর্ধযতি থাকতে পারে এবং আছেও। ঐ রকম অর্ধযতিকে বা পর্বাঙ্গ-যতিকে পূর্ণযতি হিসেবে গ্রহণ করা সম্পর্কে সাবধান হতে হবে।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা দেখেছি কৃষ্ণকীর্তনকার চণ্ডীদাস জয়দেবের অপভ্রংশ গীতের এবং বহু সংস্কৃত শ্লোকের অনুসরণে কবিতা লিখলেও অপভ্রংশ মাত্রাবৃত্তের অনুসরণ করেন নি। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগের কবি কৃত্তিবাস বা মালাধর বসুও করেন নি। কবিকঙ্কণ মুকুন্দও না। পদাবলীর মধ্যস্থতায়ই বাঙ্‌লায় মাত্রাসমকের আবির্ভাব। আমাদের মনে হয় ব্রজবুলি ভাষা নির্মাণই এর জন্য দায়ী এবং কবি বিদ্যাপতির গীত থেকে প্রেরণা নিয়ে যেমন ব্রজবুলি নামধেয় কাব্যিক ভাষার ওড়িয়া-বাঙলায় প্রচলন হয়েছিল তেমনি মাত্রাবৃত্ত ঢঙের ছন্দেরও। এ ছন্দ তার যতিবিন্যাসের বৈচিত্র্য নিয়ে কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, রায়শেখর, যদুনন্দন, উদ্ধবদাস, ঘনশ্যাম এবং জগদানন্দের মধ্যে তার পূর্ণতা লাভ করেছিল। এই ছন্দে যতিবিভাগের যা কিছু বৈচিত্র্য এঁরাই তার পথপ্রদর্শক এবং এঁদের রচনাতেই ঐ ছন্দের কৌশলময় সৌন্দর্যের পূর্ণতা বলা যেতে পারে। অধুনা রবীন্দ্রনাথ এঁদের কীর্তির উপর নির্ভর ক'রেই অনুপ্রাস-যোজনায় এবং চরণ-বিন্যাস, স্তবকনির্মাণ প্রভৃতি বিষয়ে

কবিকৃতিতে যৌগিক-দ্বিমাত্রিক

বৈচিত্র্য এনেছেন। অবশ্য সে কৃতিত্বও তাঁর সূক্ষ্ম কলাকুশলতার পরিচায়ক এবং কম নয় সেকথা বলাই বাহুল্য। পদাবলীতে আমাদের পরিচিত ক্ষুদ্রবৃহৎ পঞ্চাশেরও অধিক কবি এই ছন্দে তাঁদের কবিমানস উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, যার ফলে আজ আমরা বাঙ্‌লা কাব্যে কোমল কলাবিলাসের এই সুন্দরতম বাহনটিকে লাভ করেছি।

বাঙ্‌লা মঙ্গলকাব্যে এবং অনুবাদ-কাব্যে এ ছন্দোরীতি প্রথমের দিকে যে প্রসারলাভ করেনি, অন্ততঃ বিজয়গুপ্ত-মুকুন্দ-কৃত্তিবাস-কাশীরামদাস যে অক্ষরমাত্রিক পয়ার ত্রিপদী একাবলীতেই তাঁদের সমূহ কবিকীর্তি নিবদ্ধ করেছেন, তার দৃষ্টান্তেও এই বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে অপভ্রংশ মাত্রাবৃত্ত প্রায় অপরিবর্তিতভাবে ব্রজবুলির মধ্যস্থতায়ই বাঙ্‌লায় প্রবিষ্ট হয়েছিল। মধ্যযুগের বাঙ্‌লার দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য এই ছন্দ মঙ্গলকাব্য এবং অনুবাদ শাখায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে—দ্বিজ রামদেবের অভয়ামঙ্গল, আলাওলের পদ্মাবতী, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এবং জগদ্‌রাম ও রঘুনন্দনের রামায়ণ তার দৃষ্টান্ত। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে একালের অনুবাদে ও মঙ্গলকাব্যে বৈষ্ণব প্রভাবের ফলে গীতিভাবুকতারও স্পর্শ লেগেছে। তা ছাড়া সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী ভাষাবিষয়ক চারুতারও আতিশয্যের কাল। কবি আলাওল সপ্তদশ শতাব্দীর এবং কবি ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগপ্রতিনিধি কবি। উভয় কবির কাব্যেই ব্রজবুলির অনুগামী বাঙ্‌লা ভাষাভঙ্গি নির্মাণের এবং অপভ্রংশ ছন্দঃপ্রয়োগের উৎসাহ লক্ষণীয়।

উল্লেখ্য রূপকারগণ

দ্বৈতের সংঘাত চলেছে নিসর্গে ও জীবনে। মানুষের সৃষ্টিতেও এই দুইয়ের সংঘাত এবং মিলন। অসীম এবং সীমা, সূক্ষ্ম এবং স্থূল, আত্মা এবং দেহ, রস এবং রূপ একত্র উদ্ভূত, পরস্পর আসক্ত; লৌকিকে পৃথক্ কিন্তু পরমার্থে অভিন্ন। যেহেতু সীমা ছাড়া অসীমের প্রকাশ নেই সেইহেতু সীমার দ্বারাই, সীমার সঙ্গেই অসীম লভ্য। রূপের দ্বারাই অরূপ অর্থাৎ অনির্বচনীয় রস বোধ্য। যাকে অপরূপ কাব্যসৌন্দর্য বলি তার সঙ্গে ভাষা রীতি অলংকার সমবায়-সম্পর্কে আবদ্ধ, অঙ্গাঙ্গি-স্বভাবসম্পন্ন, সমগ্রেরই অংশ। পরস্পর-বিরোধী তো কোন অংশেই নয়, "শান্তিপুর্ণ সহ-অবস্থান" নীতির দ্বারাও চালিত নয়।

কবি যখন কাব্য রচনা করেন, ঔপন্যাসিক উপন্যাস, তখন পর্যায়-ক্রমে অথবা সূচী-কটাহ-ন্যায়ে রস-রীতি-অলংকার বা প্লট-কাহিনী-চরিত্রের বিন্যাস করেন না, সকলকে আকর্ষণ করেন একই সঙ্গে। নির্মাণকার যদি শক্তিমান হন তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ হয় না। এ সম্পর্কে ধ্বনিকারের প্রামাণ্য অভিমত—রসবহুল কাব্যার্থ এবং অলংকারময় রূপ মহাকবিরা লেখনীর এক প্রয়াসেই নির্বাহ করেন। যে কাব্য-সমীক্ষক বক্রোক্তিকে কাব্যের প্রাণস্বরূপ দেখেছেন তাঁর অভিমতে কাব্যের সহৃদয়-আহ্লাদজনক অর্থ এবং অলংকারবৈচিত্রীকে পৃথক্-ভাবে অনুভব করা যায় না; বক্র কবিব্যাপারের দ্বারা গ্রথিত হয়ে চমৎকারজনক বস্তু কবির অন্তরে মণিখণ্ডের মত শব্দাদিতে সমুদ্ভাসিত হয়ে অখণ্ডরূপেই প্রকাশ পায়। ক্রোচের যুক্তিযুক্ত ধারণা অনুসারে Intuition-এর সঙ্গে Expression অভিন্ন হয়ে জন্মপরিগ্রহ করে, Bradley প্রভৃতির মতে Meaning এবং From অচ্ছেদ্য—এ সকল

কথা পূর্বেই উপস্থাপিত হয়েছে। ফলতঃ কাব্যসত্য হচ্ছে বিশিষ্টাদ্বৈত, যেখানে রূপকে বাদ দিয়ে রূপাতীতের প্রকাশ নেই। রস রূপের মধ্যেই লীলাময় হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে এই দ্বান্দ্বিক সিদ্ধান্তই কাব্যের। এই হিসাবে যিনি যথার্থ কবি তিনি সুনিশ্চিতভাবে রূপদক্ষও।

বাঙ্‌লা কাব্য প্রথম রূপময় হয়ে আবির্ভূত হয়েছিল সহজ সাধকদের গীতে, 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' যে-গীতগুলির টীকাকার প্রদত্ত আখ্যা। কিন্তু চর্যা-গীতি কি যথার্থ কাব্য? এর শব্দার্থ কি কবি-কল্পনায় উদ্ভাসিত হয়ে চমৎকারজনক আহ্লাদ বিস্তার করে, যেমন করে বৈষ্ণব পদাবলী? এ প্রশ্নের অতিসংগত উত্তর হ'ল—না। "A thing of beauty is a joy for ever" একথা চর্যাগীতি সম্পর্কে বলা যায় না। তবু এও সত্য যে এর গীতিকারেরা নিগূঢ় ধর্মীয় উদ্দেশ্য সাধন করলেও এক বিচিত্র মণ্ডনকলার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। শব্দ এবং অর্থ উভয়তঃ এক বিশেষ নির্মাণরীতি নিঃসন্দেহে সেকালে তাঁদের কতকটা কবি-যশের অধিকারী করেছিল। পরিমিতি-বহুল বাক্‌প্রয়োগ, উপমা ও শ্লেষালংকারের ব্যবহার, ছন্দে যতিস্থাপনা ও অন্ত্যানুপ্রাসের যথাযথ বিন্যাস, বস্তুসৌন্দর্যরূপে ডোম্বী, শবরী, পাটনী প্রভৃতির চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তিতে গীতধর্মাত্মকতা প্রভৃতি বিভিন্ন কাব্যকৌশল চর্যাগীতিকে সাহিত্য-চমৎকারিতার কাছাকাছি নিয়ে গেছে। কিন্তু এরই সঙ্গে পরিস্ফুটভাবে যোজিত হয়েছে রূপনির্মাণের একটি বিশেষ আদর্শ, আর সেই কথাই প্রথমে উপস্থাপিত করতে চাই।

চর্যাগীতি

চর্যার ছন্দোরূপ অপভ্রংশের। তার একটির নাম 'পাদাকুলক'। পাদাকুলক সম্বন্ধে অজ্ঞাত (পিঙ্গল নামে কথিত) প্রাকৃত ছন্দঃকারের নির্দেশ 'লহু গুরু এক্ক ণিঅম ণহি জেহা' ইত্যাদি; অর্থাৎ ষোল মাত্রার যে ছন্দে গুরু ও লঘু অক্ষরের স্থাপনা বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই। কবি ও রসিকের শ্রুতিসুখকরতাকেই এতে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ফলে এই অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ও বৈচিত্র্যযুক্ত ছন্দই বাঙ্‌লার আদি কবিসম্প্রদায়ের আশ্রয়স্থল হয়েছে। পাদাকুলক ছাড়া যাকে

আমরা বাঙ্‌লায় ত্রিপদী বলি, প্রাকৃতে অপভ্রংশে যা মরহট্টা, চউবোলা প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ, সেই ছন্দেরও (৮+৮+৮+৪) কয়েকটি কবিতা চর্যায় রয়েছে (১৪, ১৫, ১৬, ২৩, ২৮, ৩S, ৩৯, ৪১, ৫০ সংখ্যক)। স্থান বিশেষে উনপাদ বা ভঙ্গত্রিপদীও যোজিত হয়েছে। গায়ক ও পুঁথিলেখকের যোজিত কিছু অতিরিক্ত বর্ণ বা শব্দ স্বাভাবিক ভাবেই নানাস্থানে রয়েছে, কোথাও বা মূলের বর্ণ বা শব্দ পরিত্যক্তও হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মোটামুটি ছন্দোরূপ স্পষ্টভাবেই আমাদের কাছে ধরা দেয়। একথা বলা ঠিক হবে না যে চর্যা-কবিতাকারেরা শিথিলভাবে বাঙ্‌নির্মাণ করেছিলেন। তাঁরা অনেকেই আমাদের চেয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন এ বিষয় সন্দেহের অতীত।

কিন্তু এ সকলের ঊর্ধ্বে গীতরচনা বিষয়ে রূপগত যে বিশেষ ঐক্যের দিকটি পরিস্ফুট হয়েছে তা হ'ল দশচরণ বা দশটি ছেদ ও অন্ত্যানুপ্রাসে কবিতাগুলির পূর্ণতাসাধন। বৃত্ত বা metreএর দিক থেকে অপভ্রংশ রূপ অনুবর্তন করলেও দশটি ছেদবিন্যাসে এক একটি কবিতাকে সমগ্র রূপ দেওয়ার লক্ষণীয় বিশেষত্বটি এঁদের। মদ্‌গুরু ৺মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় টীকাকারদের 'form' এর প্রতি আনুগত্যের দিকটি লক্ষ্য ক'রেও বিষয়টি ঠিক ধরতে পারেন নি। অনর্থক বাঙ্‌লা সনেটের পূর্বরূপ কল্পনা করেছেন। আমাদের প্রস্তাব এই যে,

চর্যাগীতির সামগ্রিক 'form'

চর্যার মূলরচনা সমস্তই দশচরণের, অধিক চার চরণ যে-তিনটি চর্যায় রয়েছে তা পরবর্তী কালে গায়কের বা ব্যাখ্যাকারের যোজনা, মূল রচয়িতার নয়। অনুরূপ ব্যাপার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মহাকাব্যেও ঘটেছে। গ্রন্থকার ষোল চরণের বা ছেদের কবিতাতেই সমগ্র কাব্যখানি নির্মাণ করেছেন ব'লে আমাদের সন্দেহ। গীতগোবিন্দেও দেখছি আটটি শ্লোক বা ষোল চরণের এক একটি গীতে কবি এক একটি বিষয় ও ভাব বিন্যস্ত করেছেন। এ বিষয়ে কেবল পঞ্চম সর্গের একটি গীতই ব্যতিক্রম এবং সেখানেও আমাদের সন্দেহ যে তিনটি শ্লোক লুপ্ত বা পরিত্যক্ত হয়েছে। এই তিনটি গ্রন্থের রচনারীতি দৃষ্টে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়

যে প্রাচীন কবিরা কাব্যনির্মাণে তাঁদের স্ব স্ব প্রতিভার এবং কাব্যবস্তুর ধর্ম অনুযায়ী এক একটি বিশেষ রূপনির্মিতিকে অবলম্বন করেছিলেন। তাঁদের ভাবগুলিকে অবিন্যস্ত এবং অসংবদ্ধ রাখেন নি, তাঁরা বিশৃঙ্খলবাক্‌ নন।

যে তিনটি চর্যায় দশের অধিক চার চরণ বিন্যস্ত হয়েছে তা হ'ল—১০ সংখ্যক ডোম্বীপাদের এবং ২৮ ও ৫০ সংখ্যক শবরপাদের চর্যা। কবির অভিপ্রায়গত কাব্যার্থ অনুধাবন ক'রে প্রক্ষিপ্ত চরণ চারটি পৃথক্‌ করা বোধ হয় দুরূহ নয়। ১০ সংখ্যক চর্যা দেখা যাক্‌। 'নগর বাহিরি (রে) ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ' থেকে আরম্ভ ক'রে 'তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়-পেড়া' এই দশম পঙ্‌ক্তিতে বক্তব্যের প্রকর্ষ এবং উপসংহার সূচিত হয়েছে। এর পর চার পঙ্‌ক্তি "তূ লো ডোম্বী হাউ কপালী ··মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ" পরবর্তী ব্যাখ্যাকার ও গায়কের আবেগপূর্ণ যোজনা ব'লেই মনে করি। বস্তুতঃ এই

প্রক্ষেপ নির্ধারণ

অংশের ব্যাখ্যায় টীকাকারকে সামঞ্জস্যরক্ষাকল্পে 'অপরিশুদ্ধাবধূতিকা' নামে বিপরীত প্রকারের ডোম্বীর কল্পনা করতে হয়েছে, সহজে অর্থ-সংগতি রক্ষিত হয়নি। অনুরূপ ভাবে ২৮ সংখ্যক 'উঁচা উঁচা পাবত' প্রভৃতি দশ পঙ্‌ক্তিতে শবর-শবরীর বসন্ত-মিলন বর্ণিত। শেষ চার পঙ্‌ক্তির—'গুরুবাক্‌ পুচ্ছিঅ······বিন্ধহ পরম নিবাণে, উমত শবরো গরুআ রোসে' প্রভৃতি তত্ত্বকথা পূর্বপ্রস্তাবের সঙ্গে অসংগত এবং বিপরীতার্থবহও বটে। ৫০ সংখ্যক চর্যায় শবর-শবরীর শরৎকালীন মত্তাবস্থার বর্ণনায় "ছাড় ছাড় মায়া মোহ" প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিও অনুরূপ-ভাবেই নিতান্ত বিসদৃশ। এগুলি পরবর্তী যোজনা সন্দেহ নেই। চর্যাগীতিগুলি বিভিন্ন সাধকের রচনা হলেও এর রচনাপদ্ধতির অন্তর্নিহিত ঐক্য লক্ষণীয়। আমরা পূর্বে এই গীতিগুলির মধ্যে মিল-যুক্ত পাঁচ শ্লোক বা দশ চরণের নির্মাণ-প্রবণতা লক্ষ্য করেছি। এছাড়া শ্লেষাত্মক ও প্রহেলিকার ভাষার অনুসরণ ('সন্ধা ভাষা') এবং উপমা-রূপক প্রয়োগও এদের নির্মাণ-বৈশিষ্ট্য।

ডকটর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় চর্যাগীতির হেঁয়ালি-পদ্ধতির সঙ্গে ভারতীয় ধর্মীয় রচনার পূর্বাপর সামঞ্জস্য যথার্থ-ভাবেই লক্ষ্য করেছেন। ফলতঃ চর্যাগীতির অংশবিশেষ পূর্বতন সংস্কৃত কোনো কোনো রচনার অনুবাদ হওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, চর্যার সাধকেরা সংস্কৃতজ্ঞ হ'লেও রচনায় তদ্ভব শব্দের প্রয়োগকেই বাঞ্ছনীয় এবং তৎকাল-প্রচলিত প্রসিদ্ধ লোকোক্তিকেই माननीय ব'লে মনে করেছেন। ধর্মপ্রচারের দিক থেকে এটি তাঁদের কর্তব্যও ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই শ্লেষাত্মক বা প্রহেলিকার ভাষার ঠিক কাব্যগত প্রয়োজনীয়তা নেই।

'সন্ধা ভাষা'র স্বরূপ

যদিও এক দিক্ থেকে সব কাব্যই নিগূঢ় সংকেত বহন করে, এবং কবি সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'অভ্র-আবীরে'র ভাষাকে 'সন্ধ্যাভাষা' ব'লে গৌরবান্বিত করতে চেয়েছেন, তবু কাব্যের আলো-ছায়ার এবং প্রহেলিকার বর্ণবিন্যাস বা শব্দবিন্যাসগত কৌশল একাত্ম নয়। সাহিত্যদর্পণকার প্রহেলিকাকে রসের পরিপন্থী বলেছেন এবং ধ্বনিকার যমক ও শ্লেষালংকারবহুল দুরূহ কৌশলময় রচনাকে অকাব্য বলেছেন*। সুতরাং ভাষাভঙ্গির দিক থেকেও চর্যাগীতিগুলি সাধারণভাবে সাহিত্যিকতার দাবি করতে পারে না। তবে এই ধরনের তির্যক ভঙ্গি অনায়াসেই সহজিয়া সম্প্রদায়ের আধুনিক গীত-রচয়িতাদের মর্মপ্রকাশে সহায়তা করেছে। আচরণমূলক ধর্মসাধনার ভাষাই এই। কাব্যের ভাষা এর থেকে স্বতন্ত্র। এরকম হেঁয়ালি রচনার নিঃশেষ উদাহরণ বোধ হয় ঢেণ্ঢণ পাদের গীতটি। রচয়িতা ভণিতায় বলছেন "ঢেণ্ঢণ পাএর গীত বিরলে বুঝঅ।" সন্দেহ নাই তাঁর প্রহেলিকার বোদ্ধা অতি বিরল। কিন্তু আমরা ঠিক এইজন্যই এ গীতিটি নিম্নে উদ্ধৃত করছি না। আমাদের আরও একটু উদ্দেশ্য আছে। আমরা দেখাতে চাই যে এক-একটি বিশেষ রীতি অবলম্বন

* 'রসস্য পরিপন্থিত্বাৎ নালংকারঃ প্রহেলিকা।'

ক'রেই এঁরা এক-একটি পদ রচনা করেছেন। কতকগুলিতে সহজ এবং স্পষ্ট অধ্যাত্মকথা, যেমন, ভদ্রপাদ চাটিলপাদ এবং লুইপাদের গীতি ; কয়েকটিতে লৌকিক বিষয়ের যথা দাবা খেলা, মৃগয়া, নৌযাত্রা প্রভৃতির রূপক, যেমন ভুসুকু, শান্তিপাদ, শবরপাদ ও কাহ্নপাদের কয়েকটি গীতি ; কয়েকটিতে যৌনমিলনের বর্ণনা, যেমন কুক্কুরীপাদের দুটি পদ ; আবার কয়েকটিতে প্রহেলিকার পন্থা, যেমন কৃষ্ণাচার্যের কয়েকটি এবং গুঞ্জরীপাদ, ঢেণ্ঢণপাদ প্রভৃতির গীতিগুলি। ঢেণ্ঢণ-পাদের নিম্নলিখিত পদটি দেখা যাক—

টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেষী।
হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥
বেঙ্গ স সাপ বড়্হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামাঅ॥
বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে।
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে॥
জো সো বুধী সোহ নিবুধী।
জো সো চোর সোই সাধী॥
নিতি নিতি সিআলা সীহে সম জুঝঅ।
ঢেণ্ঢণপাএর গীত বিরলে বুঝঅ॥

এর অধ্যাত্মতত্ত্ব যাই হোক তা নিষ্পন্ন করা হয়েছে কয়েকটি পরস্পর-বিরুদ্ধ এবং অসম্ভাব্য বিষয়ের বর্ণনায়। প্রহেলিকার রীতি এর অবলম্বন হয়েছে। একে শ্লেষাত্মক বলব না। কারণ শ্লেষের মধ্যেকার ভিন্ন ভিন্ন অর্থগুলি পাঠকের অত্যন্ত অপরিচিত হয় না। এখানে শব্দে ও বাক্যে উভয়ত্রই সাধকের অভিলষিত অত্যন্ত দূরবর্তী বিষয় সংকেতিত হয়েছে। লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে চর্যাগীতির সংস্কৃত টীকাকার এবং তদনুযায়ী ৺মণীন্দ্রমোহন বসু মহোদয় গীতিটির আদ্যন্ত-বিস্তৃত এই বিশেষ রূপনির্মিতিটি ধরতে পারেন নি। ফলে অর্থবোধেও বিভ্রাট ঘটেছে এবং তার উপর স্থানবিশেষে পাঠবিকৃতির জন্য অর্থ প্রায় বিপরীত নির্ধারিত হয়েছে। ৺প্রবোধচন্দ্র বাগচী

মহাশয় তিব্বতী পাঠ অনুসারে যে অর্থের ইঙ্গিত দিয়েছেন তাই কবিতাটির রূপনির্মাণের দিক থেকে সংগত এবং গ্রহণযোগ্য। এই দিক থেকে টাল=নগর, আবেশী=পূর্ণোদর, 'বেঙ্গ সংসার' এর স্থানে "বেঙ্গ স সাপ" এবং বড্‌হিল জাঅ=পশ্চাদ্ধাবন করে। শৃগালের সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করা, দোহা দুধের বাঁটে প্রবেশ করা প্রভৃতি পরস্পরবিরুদ্ধ বিষয়ের সঙ্গে নগরমধ্যে বাস অথচ প্রতিবেশী না থাকা, ভেকের সর্পবিতাড়ন প্রভৃতিই সর্বথা সংগতিবহ। এইভাবে কবির রূপনির্মিতির উপর নির্ভর ক'রেও সংশয়িত পাঠ, সংশয়িত ছন্দঃস্বরূপ প্রভৃতি নির্ণীত হতে পারে। তত্ত্বকথা এবং ভাষা নির্মাণের এরকম পার্থক্যের দিক থেকে চর্যাগীতিকারদের বিভিন্ন সম্প্রদায় অনুমান করা যেতে পারে।

আমরা দেখলাম, (১) চর্যাগীতির কবিসম্প্রদায় চরণবিন্যাস এবং বক্তব্যের আরম্ভ ও সমাপ্তি বিষয়ে একটি বিশেষ রীতিকেই অনুসরণ করেছেন—সেটি হ'ল দশ চরণ বা পাঁচটি শ্লোকে কবিতার সমাপ্তি, (২) বাগ্‌বিন্যাসে শ্লেষ ও উপমার ব্যবহার এবং প্রহেলিকার পদ্ধতি অনুসরণ, (৩) লৌকিক বিষয় এবং বস্তুর স্বরূপ বর্ণনাচ্ছলে ধর্মসাধনার নির্দেশ। এবার আমরা বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে প্রবেশ করছি।

·

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

বিষয়বৈচিত্র্যে বর্ণনবাহুল্যে এবং অভিজাত ও লৌকিক যাবতীয় ভাষার সংগ্রন্থনে কৃষ্ণকীর্তন মহাকাব্য। এর সর্গগুলির 'খণ্ড' সংজ্ঞা পুরাণের অনুসরণে। কিন্তু ঐ সংজ্ঞা এবং প্রারম্ভের জন্মবর্ণনার আয়োজন ছাড়া রচনায় পুরাণের আকৃতি-প্রকৃতি কিছুই নেই বললেই চলে। জন্ম দিয়ে আরম্ভ হ'লেও কৃষ্ণের প্রেমলীলা ছাড়া আর কিছুই এতে বর্ণিত হয়নি। এই বিষয়টি এবং বড়াই চরিত্রের উপস্থাপন স্মরণে রেখে এ-কথা স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে কবি রাধাকৃষ্ণপ্রণয়, বিশেষতঃ রাধাপ্রেমের স্বরূপ প্রতি-পাদনের জন্যই গ্রন্থ রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে জয়দেবের "কংসারিরপি

সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাং রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ" এই শ্লোকটিই এই প্রণয়কাব্যের মূলে এমন মনে করা যেতে পারে। জয়দেব যে কৃষ্ণকীর্তনের কবিকে প্রভাবিত করেছিলেন তার দৃষ্টান্ত গ্রন্থমধ্যেই নানা স্থানে রয়েছে জয়দেবের কয়েকটি গীতের ভাবানুবাদের মধ্যে। এছাড়া দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদিতে কৃষ্ণের যেসব সুচতুর প্রণয়বাক্য গ্রথিত হয়েছে তাতে গোবর্ধনের আর্যাসপ্তশতী এবং শৃঙ্গারতিলকাদি রচনার প্রভাব অনিবার্যভাবে পড়েছে। কবি বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র এবং কুট্টনীমতম্ প্রভৃতি গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এও খুব স্বাভাবিক। তখনকার রীতি অনুসারে (জয়দেব তুলনীয়) 'ভাষা'য় বর্ণিতব্য বিষয়ের ভূমিকা কবিকে সংস্কৃতেই করতে হয়েছিল। তাঁর এই সংস্কৃত রচনাগুলিও তাঁর সংস্কৃত কাব্যভাষার উপর অসামান্য অধিকারের পরিচায়ক*। এইভাবে কৃ-কীতে আয়োজন বিস্তর থাকলেও কবির স্বকীয় অভিপ্রায় এবং মৌলিক কবিশক্তির পরিচয়ই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কৃষ্ণকীর্তন 'আদাবন্তে চ মধ্যে চ' খণ্ডিত গ্রন্থ। কিন্তু এই খণ্ডন অর্থাৎ রচনাংশের অপ্রাপ্তি কাব্যটিকে ঠিকভাবে অনুভব করতে এবং বুঝতে তেমন কোনও বাধা ঘটায়নি। এর কারণ, কবির অতি বিস্তৃত বর্ণন-ক্ষমতা। বস্তুর নয়, হৃদয়ভাবদ্বন্দ্বের। আর সমগ্র কাব্যটি যে একই ব্যক্তির রচনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না সর্বত্র ভাব ও রীতির একত্ব লক্ষ্য ক'রে এবং বর্ণনের মধ্যে পূর্ব পূর্ব ঘটনার উল্লেখ দৃষ্টে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও কৃষ্ণকীর্তনে পালাগায়কদের যোজনা এবং লিপিকারের অবলেপ প্রচুর রয়েছে এবং সেই বিষয়ে অবহিত হয়ে তবেই কৃষ্ণকীর্তনকারের রচনা সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে।

* তবে শ্লোকগুলি যে কবিরই এমন কথা জোর করে বলা যায় না। কারণ, উক্ত শ্লোকগুলিতে, এবং দণ্ডক, প্রকীর্ণক, লগনী প্রভৃতির উল্লেখে পালাগানে বা নাট্যগীতিতে প্রযুক্তির নির্দেশ পালাগায়কই দিয়েছেন। শ্লোকগুলিতে বিষয়বস্তু বা সংলাপগত চরিত্রের সূত্রও দেওয়া হয়েছে।

গীতগোবিন্দের এবং চর্যাগীতির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি কবিরা তাঁদের খণ্ড খণ্ড কাব্যগুলির রচনায় পরিমিতিগত এক একটি শাসন মান্য করেছেন। জয়দেব আট চরণে এবং চর্যাকারেরা দশ চরণে তাঁদের বক্তব্য সমাপ্ত করেছেন। কৃষ্ণকীর্তনকারেরও কবিব্যক্তিত্ব এ বিষয়ে একটি বিশেষ বিধিকেই শিরোধার্য করেছিল এমন মনে করলে ভুল হয় না। গ্রন্থমধ্যে দেখছি ১৬ চরণের অর্থাৎ ষোলটি ছেদ বা দাঁড়িতে সমাপ্ত হয়েছে এমন খাঁটি পয়ারের (বা ত্রিপদীর) কবিতার সংখ্যা শতকরা সত্তরটি। বাকি শতকরা তিরিশটি ক্ষেত্রে যেখানে দেখছি ১৬ দাঁড়ির অতিরিক্ত রয়েছে সেখানে কোনও কোনও জায়গায় "ধ্রু" চিহ্নিত অংশগুলি তুলে দিলেই গোল চুকে। কিছু পূর্বে লেখা আমার একটি প্রবন্ধে আমি এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। সেখানে দেখাতে চেয়েছি যে "আলো" "বড়ায়ি গ" "রাধা ল" প্রভৃতি ছন্দের অতিরিক্ত ভাবাবেগময় সম্বোধনাদি তো বটেই এমন কি দুই তিন অথবা চার চরণের "ধ্রু" চিহ্নিত অংশগুলিও পালাগায়কের যোজনা। ঐগুলি ছন্দের অতিরিক্ত, কবির প্রস্তাবিত ভাবার্থের সঙ্গে প্রায়শই অসম্বদ্ধ, কদাচিৎ পূর্বোক্তির বিস্তার—কবিতাকে গীতে পরিণত করার প্রয়োজনে গায়েনদের আবেগময় যোজনা। কিন্তু এ ছাড়া আরও অনেক অতিসম্ভাব্য বিশৃঙ্খলা গ্রন্থটির মধ্যে রয়েছে। একটি কবিতা থেকে কতক অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য কবিতার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে। এমন কি "ধ্রু" ছাড়া সম্ভাব্য মৌলিক অংশেও কবি-অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধতা স্পষ্ট। কোনও কোনও কবিতায় একাধিক ধ্রু-চিহ্নিত অংশও রয়েছে। আমি "form"-এর দিক থেকে বিচার ক'রে এই সিদ্ধান্তে আসছি। যদি এমন সুদিন আসে যে কৃষ্ণকীর্তনের আরও দুটি অথবা একটি পুঁথি আবিষ্কৃত হয় তখন এই সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত সমর্থন পাওয়া যাবে ব'লে আমি মনে করি। এ সম্বন্ধে সংশয় নেই যে প্রাপ্ত কৃষ্ণকীর্তন কবি-লিখিত মূলপুঁথির অনুলিপির অনুলিপিও নয়। গায়েনদের ব্যবহার করা পুঁথি মাত্র। এর কবিতাগুলিকে গীতে

প্রতি পদের চরণ-সংখ্যা ও গায়েনের প্রক্ষেপ

প্রয়োগ করতে গিয়ে গায়েনদের রাগরাগিণীর নাম দিতে হয়েছে এবং কবির কথা, একজনের আলাপ, দু' জনের পারস্পরিক আলাপ, তিন জনের আলাপ, আলাপের মধ্যে কবিকৃত ঘটনার বর্ণনা এই সব বোঝাবার জন্য—লগনী, দণ্ডক, চিত্রক, প্রকীর্ণক, কাব্যোক্তি প্রভৃতি সংকেত জ্ঞাপন প্রয়োজনীয় ব'লে অনুভূত হয়েছে। হতে পারে কৃ-কী বাঙ্‌লা যাত্রাগান রীতির প্রাচীন রূপ। যাই হোক, শাস্ত্রীয় এবং লৌকিক বিচিত্র রাগরাগিণীর নির্দেশ থেকেই বোঝা যায় চণ্ডীদাসের মূল রচনার উপর গায়েনরা নানাভাবে নিজ নিজ কৌশল বিস্তার ক'রে কাব্যখানিকে সুসংবদ্ধ পালাগীতে বা যাত্রাগীতে রূপান্তরিত করেছেন। এইজন্য এর ভাষায় অনায়াসে ষোড়শ শতাব্দীর চিহ্নও দর্শনীয় হয়েছে। এবং পূর্বে যা ছিল 'খণ্ড' কাব্যের সমষ্টি তা হয়ে দাঁড়িয়েছে গীতের অফুরন্ত ভাণ্ডার। আমরা পুর্বে বলেছি যে খাঁটি পয়ারে ষোলটি দাঁড়ি-চিহ্ন মোটামুটি কৃ-কী এর নিয়ম। মিলের দিক থেকে গ্রহণ করলে বলা যায় ৮টি স্তবক। স্তবক যেখানে তিনটি চরণে সেখানে অবশ্য ৮ × ৩ = ২৪টি দাঁড়ি-চিহ্ন। সুতরাং বলা যেতে পারে কৃ-কী-র তাবৎ কবিতা ৮ স্তবকে (আবার গীতের চারটি বিভাগে ৪ × ৪ ধ'রে ৪ স্তবকে) রচিত হয়েছিল। এর কবিতাগুলিতে প্রায়শই যে চারটি বিভাগ দেখা যায় তা পালাগায়কদের নির্দেশ অনুসারে হয়েছিল ব'লেও মনে করা যেতে পারে।

ছন্দে মাত্রামূলক আবৃত্তি থেকে যে-অক্ষরমূলক আবৃত্তির রীতি প্রাচীন বাঙ্‌লাতেই গড়ে উঠছিল কৃষ্ণকীর্তনে তার স্থায়ী প্রতিষ্ঠার চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণকীর্তন লোকভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত কাব্য, কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষার উপর নয়। এজন্যই বড়ু চণ্ডীদাস মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার করেন নি। তবু এর পয়ার-ত্রিপদীতে যে নানা স্থানে মাত্রাবৃত্তের অনুরূপ দীর্ঘীকরণ দেখা যায় তা অক্ষরমাত্রিকতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠার দিকে যাত্রার কালের স্বাভাবিক অবস্থা মাত্র। এর ধারা অর্থাৎ পয়ার-জাতীয় ছন্দে একাক্ষরকে দু'মাত্রার মূল্য দেওয়া অতি কদাচিৎ হলেও এবং কবির অশক্তিজনিত ব'লে চিহ্নিত হবার যোগ্য

হলেও, বর্তমানেও একেবারে যে না দেখা যায় এমন নয়। সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় রচিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দের অক্ষরমাত্রিক ছন্দে প্রয়োজনে হলন্ত যৌগিক অক্ষরকে দু'মাত্রার মূল্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঐ প্রাচীনেই—অক্ষরমাত্রিক ছন্দের নির্মাণপর্বেই বড়ু-চণ্ডীদাস এর শক্তির চরম পরীক্ষা করেছেন। বিভিন্ন মাত্রার পর্বের সামঞ্জস্যে, মিল যোজনার ও স্তবক নির্মাণের বৈচিত্র্যে কৃষ্ণকীর্তন আধুনিক যুগের মধুসূদনোত্তর ছন্দঃকুশল কবিদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

এক দানখণ্ডেই দেখছি পয়ার ছাড়া লঘুত্রিপদী, দীর্ঘত্রিপদী, একাবলী, ১০ মাত্রার চরণ প্রভৃতি। বৃন্দাবনখণ্ডে দেখছি দুটি আট মাত্রা ও একটি চোদ্দ মাত্রার মোট তিনটি চরণ নিয়ে একটি স্তবক গঠন করা হয়েছে, যেমন—

> বুঝিআঁ গোপীর মনে।
> থনেক গুণিল কাহ্নে।
> ষোল সহস্র গোপী তোষিবোঁ কেমনে॥ ইত্যাদি

এরই কয়েকটি স্তবকের শেষ চরণে দেখছি ১০, ১২ অক্ষর বা মাত্রাও রয়েছে। এই ব্যতিক্রমের জন্য লিপিকার বা গায়েনেরা কী পরিমাণ দায়ী, আর কবির প্রাথমিক প্রয়াসই বা কতদূর এর কারণ, তা নির্ণয় করা অবশ্য দুঃসাধ্য। বৃন্দাবনখণ্ডে এক ধরনের ভঙ্গ ত্রিপদীর নিদর্শন দেখছি যাতে দুটি আট মাত্রার ছেদ যতি ও মিলে বিন্যস্ত চরণের পর এক লঘুত্রিপদীর অংশ যোজনা, যেমন,—

> তোএ না গুণসি মনে।
> আল করিবোঁ যতনে।
> নিজধন দিয়া সুন্দরী রাধা
> নির্মায়িলোঁ (এ) বৃন্দাবনে॥

একে চৌপদীও বলা যেতে পারে। তিন চরণে স্তবক নির্মাণের

আগ্রহ 'রাধাবিরহ' অংশে বিস্তৃততর হয়েছে। ১০+৮ মাত্রায় পর মিল দেখা যাচ্ছে নিম্নলিখিত চরণবিন্যাসে—

আনাহ সকল সখিজন, মেলি করিউ যুগতী।
তবেঁ মথুরাক জাইএ সঙ্গে হঁআঁ একমতী॥ ইত্যাদি।

অক্ষরমাত্রিক ছন্দের বিচিত্র চরণবিন্যাসের রীতিতে এইভাবে কৃষ্ণকীর্তন পরবর্তী কাব্যগুলির পথপ্রদর্শক হয়েছিল।

কৃষ্ণকীর্তন সহজ লৌকিক ভাষার কাব্য। এর তদ্ভব শব্দের আধিক্য আমাদের কাছে বিদগ্ধ কবিকে গ্রাম্য কবি ব'লে চিহ্নিত করেছে। তা ছাড়া মাত্রাবৃত্ত ছন্দোরীতির অব্যবহারের জন্যও কবিকে খুব কৌশলী ব'লে মনে হয় নি এবং পরবর্তী পদাবলীর বাক্‌-সৌন্দর্য এতে অবিদ্যমান ব'লে কাব্যখানি তার প্রাপ্য গৌরব থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যেকালে কৃষ্ণকীর্তন রচিত হয় সেকালে লোকভাষারই আধিপত্য ছিল সমাজে। ঐ কাব্যে ঐ ভাষারই শক্তির সমূহ প্রকাশ। আর এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই যে প্রচলিত ভাষার উপর নির্ভর ক'রে যতপ্রকারের চারুতা হতে পারে সবই এই বর্ণনাপ্রধান কাব্যটি আত্মসাৎ করেছে। তবু রূপবর্ণনের ক্ষেত্রে কবি স্থানবিশেষে সংস্কৃত ভাষাভঙ্গির অনুসরণে বৈচিত্র্য আনয়নের প্রয়াস যে করেছেন তা স্পষ্ট। যেমন, "নীলজলদসম কুন্তলভারা" এবং "কুরঙ্গনয়ন জিনী তোহ্মার নয়নে। অধর বান্ধুলী গণ্ড মধুক সমানে" ইত্যাদি দানখণ্ডে। কাব্যটি সুবৃহৎ এবং বিস্তারিত বর্ণন নির্ভর ব'লেই কবি স্বচ্ছন্দে সংস্কৃতের চারুতা লোকভাষার স্থানে স্থানে অনুপ্রবিষ্ট করতে পেরেছেন। কবিকঙ্কণেও তাই, শুধু রূপবর্ণনেই প্রাচীন রীতি। উক্তির পরিস্ফুট বক্রতায় এবং প্রবচন-সদৃশ প্রৌঢ়ির সন্নিবেশে কৃষ্ণকীর্তন পুনঃ পুনঃ পাঠ্য কাব্য। দানখণ্ড এবং নৌকাখণ্ড অনুসরণ করতে করতে পাঠক দেখবেন যে শৃঙ্গারাদি ভাব বিষয়ে একত্র এত বিচিত্র এবং সরস উক্তির সমাহার বাঙ্‌লায় তো আর নেই-ই, সংস্কৃত কাব্যেও নেই। দ্বান্দ্বিক উক্তি-প্রত্যুক্তির সন্নিবেশে মনোহর

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাভঙ্গি

নিম্নলিখিতরূপ কাব্যাংশ দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডে প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়—

"তোর রূপ দেখি মোর চিত্ত নহে থীর।
প্রাণ যেহ্ন ফুটি জাএ বুক মেলে চীর॥"
"যার প্রাণ ফুটে বুকে ধরিতে না পারে।
গলাত পাথর বান্ধী দহে পসী মরে॥"
"তোহ্মে গাঙ্গ বারানসী সরুপেসি জাণ।
তোহ্মে মোর সব তীর্থ তোহ্মে পুণ্যস্থান॥"
"এ বোল বুলিতে কাহ্ন না বাসসি লাজ।
তোহ্মার মাউলানী আহ্মে শুন দেবরাজ॥"
হইএ আহ্মে দেবরাজ তোহ্মে মোর রানী।

... ...

'এ বোল বুলিতে তোর মণে বড় সুখ।
পরঘর পইসে যেহ্ন চোর পাটাবুক॥"
"ভাল বোল বুলিসি তো চন্দ্রাবলী রাণী।
আহ্মার মনের কথা কহিলেঁ আপুনী॥"

কৃষ্ণকীর্তনে উপমা, অতিশয়োক্তি এবং অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলংকার যত্রতত্র, এবং লোকভাষাতেই এগুলি সিদ্ধ হয়েছে। শৃঙ্গাররসময় উক্তিচাতুর্যের এর পরবর্তী নিদর্শন হ'ল কিছু পদাবলী ও ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের কাব্য। ভারতচন্দ্র সংস্কৃতজ্ঞ হলেও যতদূর সম্ভব কথ্য বাঙ্লাকেই তাঁর বচনচাতুর্যের ভিত্তি করেছেন। তাই প্রসাদগুণ এবং সরসতা একাধারে তাঁর কাব্যে মিশ্রিত হয়েছে।

কৃষ্ণকীর্তনের এই লোকভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত অক্ষরমাত্রিক পদ্ধতিতে রচিত কবিতার ধারা পদাবলীতে অনুসরণ ক'রে চলেছেন ছদ্মচণ্ডীদাসগণ, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, লোচনদাস প্রভৃতি। এর মধ্যে লোচনদাসের বৈশিষ্ট্য ছড়ার ঢঙে লেখা কবিতাগুলিতে—ছন্দে এবং ভাষায়। লোচনদাসের পদেই প্রথম দেখছি ছড়ার ছন্দ সাহিত্যের পদবীতে সমুত্তীর্ণ। এর পূর্বে নারীদের রচিত ছড়ায় এবং

ব্রতকথার মধ্যে এই ছন্দোরীতি প্রযুক্ত ছিল। লোচনের ধামালী কবিতায় ছড়ার ভাষার প্রায় আদি রূপ দেখতে পাচ্ছি।

ছদ্মচণ্ডীদাসের কতকগুলি বিখ্যাত পদের মূলে সংস্কৃত রচনা রয়েছে, যেমন, "ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার" "রাধার কী হইল অন্তরে ব্যথা" "কেবা শুনাইল শ্যাম নাম" প্রভৃতি। কতকগুলি পদের স্থানে স্থানে বড়ু চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতির অনুসরণ রয়েছে। আবার কতকগুলিতে চৈতন্যচরিতামৃতোক্ত পরকীয়া প্রীতি এবং রাধাভাবের অনুষঙ্গ রয়েছে এবং বাকি পদগুলির মধ্যে স্পষ্টভাবে সহজিয়া সাধনতত্ত্বের নির্দেশ রয়েছে। প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণীর পদ পর্যন্ত হয় দ্বিজ, নয় দীন, নয় চণ্ডীদাসের নামে চলেছে। আসলে বহু কবির পদই চণ্ডীদাসের নামে চলছে, কতকগুলি গায়কদের ভুলক্রমে, কতকগুলি কবির আত্মগোপনের জন্য। প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্‌লায় গায়ক এবং লিপিকারদের মিশ্রণ থেকে কোন্ কবির রচনাই বা অব্যাহতি পেয়েছে? স্বর্গত ডক্‌টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে চণ্ডীদাসের কবিতার এমন কতকগুলি আভ্যন্তরীণ সম্পদ এবং বহিরঙ্গ লক্ষণ রয়েছে যা দিয়ে এই শ্রেষ্ঠ কবির রচনা চিনে নিতে বিলম্ব হয় না। যেমন, যোগিনীর ভাব ও মর্মমুখিতা, একান্ত প্রীতিপরবশতা, একান্ত নিঃস্বার্থভাব ইত্যাদি এবং বহিরঙ্গ লক্ষণরূপে প্রসাদগুণ ও ঋজুতা, ত্রিপদী-ছন্দের ক্ষেত্রে প্রারম্ভে ভঙ্গত্রিপদীর ব্যবহার ইত্যাদি। এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই যে, যে-সব পদের সৌন্দর্যে ডক্‌টর সেন মহোদয় মুগ্ধ সেগুলি প্রথম শ্রেণীর রচনা এবং বাঙালির গৌরবের বস্তু। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, চণ্ডীদাস নামে প্রচলিত এরকম উত্তম পদের সংখ্যা পঞ্চাশের বেশি নয়। অন্যান্য পদগুলিতে অকারণ বর্ণনবাহুল্য, একই বিষয়ের পুনরুক্তি, ভাষার আড়ষ্টতা, পূর্ববর্তী কবিদের অনুকরণ প্রভৃতি বহু দোষ রয়েছে। আমরা প্রথম পর্বের আলোচনায় দেখিয়েছি যে স্বভাবোক্তি-প্রবণ উত্তম চণ্ডীদাসের রচনার মধ্যে উল্লেখ্য রচনা-কৌশল রয়েছে, যেমন, পরিমিত বাক্-প্রয়োগ, উত্তম-ক্রমযুক্ত

বড়ুচণ্ডীদাস ও চণ্ডীদাসগণ

মধ্যমিল ও অন্ত্যমিলের ব্যবহার ইত্যাদি। পদাবলীর চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত উত্তম কবিই লৌকিক বাঙ্‌লার প্রথম কবি যিনি মিল যোজনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন, যেমন, "চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়" "নিবার না যায় রে। কানু পথে ধায় রে" "সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে" ইত্যাদি। তিনিই উত্তম চণ্ডীদাস যাঁর চরণের পর্বগুলিতে মাত্রা ছাড়িয়ে অক্ষরের আধিক্য প্রায় নেই বললেই চলে। আর যিনি তিন অক্ষরের শব্দের উপরই অনুরাগ বেশি প্রকাশ করেছেন। আমরা হিসেব ক'রে দেখেছি বাঙ্‌লা তিন অক্ষরের শব্দে গীতিকাব্য রচনা চলে ভালো, ছন্দের পর্বাঙ্গ হিসাবেও তিন অক্ষরের চালই মানায় ভালো—বিশেষতঃ ছয় মাত্রার পর্বে—কি অক্ষরমাত্রিকে, কি মাত্রাবৃত্তে। আর এক কথা। ব্রজবুলি বাঙ্‌লায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর হি, হু, অল প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত পদ এবং তুয়া, তুহুঁ মঝু প্রভৃতি শব্দ খাঁটি বাঙ্‌লায় রচিত পদের মধ্যেও প্রয়োগ করেছেন যদুনন্দন, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস প্রভৃতি পদকর্তারা। উত্তম চণ্ডীদাসের রচনা এ ধরনের অবাঙালিয়ানা থেকে মুক্ত। ফলতঃ সন্দেহ করতেই হয় যে নিম্নবর্ণিতের মত পঙ্‌ক্তিগুলি ঐ শ্রেষ্ঠ কবির কিনা—

নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরি
চমকি চলিয়া গেল।
সঙ্গের সঙ্গিনী সকল কামিনী
ততহি উদয় ভেল॥

তা ছাড়া এতে বিদ্যাপতির অনুকরণ স্পষ্ট। অনুরূপভাবে বলা যায় যে, "সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে রে" ইত্যাদি পরিচিত পদটিতে রূপবর্ণনায় গতানুগতিক সুতরাং বৈচিত্র্যহীন অসুন্দর অতিশয়োক্তি নির্মাণ ঐ উত্তম কবির নয়—

বিম্বফল জিনি কেবা ওষ্ঠ গড়িল রে
ভুজ জিনিয়া করি-শুণ্ড॥
কম্বু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।

আরদ্র[1] মথিয়া[2] কেবা সারদ্র[3] বনাইল রে
ঐছন দেখি পীতাম্বর ॥

এই ভাবে, ভণিতা এবং অন্যবিধ সমস্যায় না গিয়ে, শুধু রূপকর্মের বিচারেই বরঞ্চ চণ্ডীদাসকে ভালোভাবে চিনে নেওয়া যায়।

রূপের দিক থেকে তাবৎ বৈষ্ণব পদাবলীকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক, ব্রজবুলিতে রচিত, দুই, খাঁটি বাঙ্‌লায় রচিত পদ। একই কবি দুই পৃথক্ রীতিতে রচনা করেছেন এমন দৃষ্টান্তও বহু, এবং ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের খাঁটি বাঙ্‌লা পদে ব্রজবুলির শব্দের প্রভাবও লক্ষণীয়। বিখ্যাত চণ্ডীদাসের পদে যেহেতু এ ভাষার প্রভাব নেই, সেইহেতু তিনি ব্রজবুলির ব্যাপক প্রয়োগের পূর্বেকার কবিই হবেন। জ্ঞানদাস ভাব ও ভাষায় চণ্ডীদাসের অনুসারী একথা অর্ধ-সত্য। তাঁর বাঙ্‌লায় রচিত পদে লোকভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত সরলতা ও গভীরতা লক্ষ্য করা যায় বটে, কিন্তু শব্দপ্রয়োগে তিনি চণ্ডীদাসের রীতি সম্পূর্ণ রক্ষা করেন নি এবং তাঁর ঐ জাতীয় রচনাতেও স্থানে স্থানে আলংকারিক বাক্-প্রয়োগ লক্ষণীয়। এ ছাড়া হিলনি, পুতলি, দোলনি, দাপনি, কালিয়া, পিরিতি এবং 'রস'যুক্ত ও 'জাতি' 'কুল'যুক্ত শব্দের প্রয়োগ অত্যধিক। জ্ঞানদাস শুধু বিরহের কবি নন, রূপসৌন্দর্যেরও, মিলন এবং সম্ভোগেরও। তিনি নিগূঢ় ইন্দ্রিয়ভাবালুতার কবিও। জ্ঞানদাস স্বভাবকবি শুধু বাঙ্‌লায় রচিত পদগুলিতে। মনে রাখতে হবে তিনি ব্রজবুলিতেও বিস্তর পদ রচনা করেছেন। এগুলিতে বিদ্যাপতির প্রভাব যথেষ্ট, বিশেষতঃ রূপবর্ণনে। দান ও নৌকা-লীলার পদগুলিতে চণ্ডীদাসের সঙ্গে জ্ঞানদাসের পার্থক্য মর্মানুভবসমূহের যথাসাধ্য নিবিড় বিশ্লেষণে। চণ্ডীদাস যেখানে এক কথায় সমস্ত অন্তর উদ্‌ঘাটিত করেছেন, জ্ঞানদাস সেখানে বিশ্লেষণ আশ্রয় করেছেন।

ব্রজবুলি ও জ্ঞানদাসাদি

১ আর্দ্রক (আদা) অথবা 'হরিদ্রা' শব্দের কৃত্রিম অবহট্ট হ'তে পারে।

২ প্রচলিত পাঠ 'মাথিয়া' ভ্রমাত্মক।

৩ সারদ্রব।

এ ছাড়া রূপের বর্ণনার দিক তো বটেই। 'আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনে'র তত্ত্বটি কাব্যরূপে জ্ঞানদাস যেমন অনুসরণ করেছিলেন এমন আর কেউ নয়। কাব্যে তিনি একাধারে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের শিষ্য এবং উপকরণে স্বরূপ দামোদর এবং রূপসনাতনের অনুচর।

এ যুগের নাম-করা বৈষ্ণব কবিমাত্রেই ব্রজবুলিতে পদ লিখেছেন। শেখর কবি, যদুনন্দন, গোবিন্দদাস কবিরাজ, তৎপৌত্র ঘনশ্যাম, শশিশেখর, রাধামোহন, জগদানন্দ প্রভৃতি অনেকে। ফলতঃ বাঙ্‌লাকে পশ্চাতে রেখে ব্রজবুলির সঙ্গেই যেন বৈষ্ণব ভাবুকতার সাজাত্য অধিক গড়ে উঠেছিল। এর কারণ নিশ্চিতভাবে ভাষা ও ছন্দ। খাঁটি বাঙ্‌লায় এরকম মনোহারিতার সঞ্চার তখনো দুরূহ ছিল। অথচ রাগানুগা ভক্তির বিচিত্র সূক্ষ্ম বিলাস বর্ণনে, শব্দালংকার অর্থালংকারে সুচারু এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কৌশলে মায়াময় এ-ভাষাই কবিকুলের প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠল। ব্রজবুলি ভাষার উদ্ভব সম্বন্ধে কোনো কল্পনায় না গিয়ে সহজ বুদ্ধি আশ্রয় করেই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা যায় যে ভাষাচতুর কবি বিদ্যাপতি মুখ্যতঃ এই কাব্যরূপের স্রষ্টা। শুধু ভাষার মাধুর্যই নয়, ছন্দের সঙ্গে একাত্ম অনুপ্রাসের ও দীর্ঘ উচ্চারণের সুষমা পদাবলীর মধুর সৌন্দর্যকে গতিশীল ক'রে তুলেছে। তদ্ভবশব্দ-প্রধান এবং ধ্বনি-রমণীয়তাহীন তৎকালীন বাঙ্‌লায় এ মাধুর্য সম্ভাব্য ছিল না। অবশ্য বাঙালি কবিদের হাতে বিদ্যাপতির ব্রজবুলি আরও অনায়াস, সহজবোধ্য এবং কোমল হয়ে উঠেছে। মনে রাখতে হবে, মৈথিল-ব্রজবুলির যখন সৃষ্টি হয় তখন কিন্তু বিভক্তি-প্রত্যয়ের দিক থেকে বাঙ্‌লার সঙ্গে মৈথিলের সম্পর্ক খুব দূরবর্তী ছিল না। এই কৃত্রিম ভাষার অর্ধ-তৎসম ও তৎসম শব্দের আধিক্য এবং উন্নত ধ্বনিসুষমা বাঙ্‌লা-আসাম-উড়িষ্যার কবিকুলকে সহজেই আকৃষ্ট করেছিল। আমরা পূর্বেই বলেছি ব্রজবুলির অনুসরণের পর থেকেই বাঙ্‌লায় মাত্রাবৃত্ত ছন্দোরীতির অনুপ্রবেশ। অপভ্রংশের বা অবহট্টের ভাষা ও ছন্দই

ব্রজবুলির ভাষা ও ছন্দ, এবং বাঙ্‌লা মাত্রাবৃত্ত এইভাবে অপভ্রংশের মাত্রাবৃত্তের ধারায় আজও চলেছে।

বিদ্যাপতি বক্রোক্তিতে নিপুণ কবি, কিন্তু অর্থালংকারে বিদ্যাপতির যতদূর গৌরব ততদূর শব্দালংকারে নয়। এইজন্য বিদ্যাপতির চেয়ে বাঙালি কবিদের ব্রজবুলি অধিকতর শ্রুতিমধুর। বিদ্যাপতি পর্ব-বিভাগগুলিতে গুরু ধ্বনির সুতরাং দীর্ঘমাত্রা স্থাপনের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেন নি। অথচ গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, যদুনন্দন কবিশেখর প্রভৃতির রচনায় এহেন অসামঞ্জস্য বিরল। এঁদের শতশত রুচির রচনার মধ্যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্মৃতি থেকে উল্লেখ করতে পারি। "আওত শ্রীদামচন্দ্র" "হামারি দুখের নাহি ওর" "গগনে অব ঘন মেঘ দারুণ" "ধনি ধনি বনি অভিসারে" "কাজর রুচিহর রয়নী বিশালা" "রাজিত চিকুর উপর নবমালতী" "ভজহুঁ রে মন নন্দনন্দন" "অঞ্জন গঞ্জন জগজন রঞ্জন" "কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল" "নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন" "অতিশীতল মলয়ানিল" "শারদচন্দ পবনমন্দ" "মঞ্জু বিকচ কুসুমপুঞ্জ" "উদিতারুণ হসিত নলিন" "নবনীরদবর্ণ কিসে গণ্য" ইত্যাদি। ব্রজবুলির এই শাণিত কোমল শব্দাবলীর প্রভাবে লৌকিক বাঙ্‌লাও যে ধ্বনিময় হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ "বিমল হেম জিনি তনু অনুপাম রে" "রজনী শাওনঘন ঘন দেয়া গরজন" "থীর বিজুরি বরণ গোরী" প্রভৃতি। বস্তুতঃ বৈষ্ণব পদকর্তারা বাঙ্‌লা ভাষার মধ্যে উত্তম গীতিকাব্যগুণ সঞ্চার করতে যে আশ্চর্য কলা-কুশলতার এবং প্রযত্নের পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা অন্য কোনও ভাষাতে পাওয়া যায় কিনা জানিনা। সংস্কৃতের এ কৌলীন্য পূর্ব থেকেই ছিল, তারই উপর নির্ভর ক'রে জয়দেব তাঁর ধ্বনিসুধাস্যন্দ বিতরণ করেছিলেন। প্রাকৃত বাঙ্‌লার এ সম্বল ছিল না। অক্ষর-মাত্রিক পদ্ধতিতে রচিত কৃষ্ণকীর্তন থেকে আরম্ভ ক'রে অনুবাদ-শাখাই হোক আর মঙ্গল-কাব্যই হোক সর্বত্র ভাষা মাধুর্যগুণহীন। পদাবলীর ভাব যেমন ঐ শাখার বিপরীত, ভাষাও তেমনি। আধুনিক কবি-চূড়ামণি রবীন্দ্রনাথ ঐ ব্রজবুলি বা ব্রজবুলি-প্রভাবিত ভাষার উপরেই

তাঁর সূক্ষ্ম গীতিভাবুকতাকে গড়ে তোলেন। বিষয়টি আমরা গ্রন্থান্তরে পরিস্ফুট করেছি।

পদাবলীকারদের ছন্দঃসিদ্ধি সম্পর্কে আরও কিঞ্চিৎ বক্তব্য রয়েছে। আমরা পূর্বেই কৃষ্ণকীর্তনকারের চরণ, পর্বগঠন ও স্তবকবন্ধন কুশলতার বিষয়ে আলোকপাত করেছি। পদাবলীতে সেই পয়ার, লঘুত্রিপদী, দীর্ঘত্রিপদী, ৮ মাত্রার চরণ, ১০ মাত্রার চরণ, একাবলী। পদাবলীর অক্ষরমাত্রিক স্তবক গঠন বিষয়ে আর একটু নবীনতা দেখছি যতুনন্দনে। তিনি ভঙ্গ ত্রিপদী এবং ভঙ্গ চৌপদী দিয়েই এক একটি পদ গ্রন্থন করেছেন, যেমন—

ছন্দ-নির্মাণে পদকারেরা

কে না পরতীত যায়।
বদন কমল বাঁধুলি অধর
দশন কুন্দকি তায়॥
কাহারে কহিব কথা।
কিংশুক কোরক নাসিকা সুভগ
আঁখি উতপল রাতা॥ ইত্যাদি

ঐ আট মাত্রার দুই চরণ প্রথমে বসিয়ে চৌপদী, যেমন—

গৌর বরণ সোনা।
ছটক চাঁদের জোনা।
তরুণ অরুণ চরণহি থির
ভাবে বিয়াকুল মনা॥

দশ মাত্রা দিয়েও তিনি তাই করেছেন। এ ছাড়া পর্ববিন্যাসেও যতুনন্দন স্বাতন্ত্র্যরক্ষার প্রয়াস করেছেন তাঁর ৮+৮+৮+৩ এর ত্রিপদীতে যেমন—

তোহোর সংকেত কুঞ্জে কুসুমশর-
পুঞ্জে রহল একসরিয়া। =(৮+৩)

অবশ্য এটি মাত্রাবৃত্ত ঢঙে রচিত। অক্ষরমাত্রিকে অনুরূপভাবে পর্ববৈচিত্র্য দেখিয়েছেন যদুনাথ দাস ৬+৬+৬+৫ এ, যেমন—

রূপেতে ভ্রমরা গুণে ননীচোরা
বিভব ধবলী বসতি গাছে। =(৬+৫)

উদ্ধবদাসের ৬+৬+৬+৭ এর রচনা—

কালিন্দীর কূল বিকশিত ফুল মত্ত অলিকুল পড়লহি পাঁতিয়া।

সর্বগুণাধার গোবিন্দদাস কবিরাজ ছাড়া ছন্দোনির্মাণে কারু-বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন অনন্তদাস, যদুনন্দন, উদ্ধবদাস, শশিশেখর এবং জগদানন্দ। কোনও কোনও বাঙ্‌লা ছন্দোগ্রন্থ রচয়িতা আমাদের ধারণা জন্মিয়ে দিয়েছিলেন যে বাঙ্‌লায় ৯ মাত্রার পর্ব অচল। ৯ মাত্রার পর্ব অপভ্রংশেও রয়েছে, পদাবলীতেও রয়েছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ ৭ মাত্রার পর্বের প্রচুর ব্যবহার করেছেন অক্ষরমাত্রিক ত্রিপদীতে। অবশ্য ৯ এর পর্ব বর্তমানে অচল, আর ৭ এর পর্ব সীমিতভাবে মাত্রাবৃত্তে দেখা যায়। এখন চল নেই ব'লে হ'তে পারে না এ ধারণা ঠিক নয়। আট মাত্রার মাত্রাবৃত্তের ব্যবহারও তো এখন কমে এসেছে। আমাদের জাতীয় প্রবণতায় ক্রমশঃ স্বল্পমাত্রার উচ্চারণের দিকেই ঝোঁক পড়ছে। কিন্তু যুগপরিবর্তনের ফলে কোনও উত্তম কবির হাতে ছন্দোবৈচিত্র্য নূতন রূপ গ্রহণ করবে না এবং আমাদের বাক্‌-প্রবণতায় বলিষ্ঠতা আসবে না একথা তো বলা যায় না। গোবিন্দদাসের মাত্রাবৃত্তে ত্রিপদীর কয়েকটি ষোলমাত্রার চরণ-বিন্যাস সাধারণ নিয়ম অনুসারে ৮+৮ এ বিভক্ত ক'রে পড়া হয়। কিন্তু এইভাবে পড়লে অনেক সময় প্রথম আট মাত্রার পর্বটি শেষ হচ্ছে কোনও একটি শব্দের আদ্যক্ষরে। ছন্দের যতি অর্থবহতার দাস নয়, নিজের ক্ষেত্রে তার স্বরাজ, একথা ধ'রে নিলেও, একবার নয় দুবার নয়, প্রায়শই ঐভাবে শব্দকে আদ্যক্ষরে ভাঙ্‌তে হবে এবং গোবিন্দদাসের মত তালসিদ্ধ কবি ঐ ভাবে পর্বনির্মাণ করবেন কেন, এই বিবেচনায়

৮+৮ এর পর্ব সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হলাম। এবং অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে দেখলাম অপভ্রংশ তোমর, সারঙ্গিকা, মহালক্ষ্মী প্রভৃতি ছন্দে ন'য়ের পর্ব রয়েছে এবং উদ্ধবদাস, শশিশেখর, যদুনন্দন প্রভৃতি স্বচ্ছন্দে ১০+৯, ৮+৯ এর বিভাগ চালিয়েছেন। (এ সম্বন্ধে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে)। সুতরাং গোবিন্দদাসের "কণ্টক গাড়ি কমলসমপদতল" "মাথহি তপন তপত পথ বালুক" "চঞ্চল চরণ কমলতলে ঝংকরু" "লুবধল মধুপ চকোর বিধুন্তুদ" "নিরমল বয়ন কমলবর মাধুরী" প্রভৃতিতে ৭+৯ এর ব্যবহারে তাঁর সংকোচ নেই। যেখানে স্পষ্ট ৮+৮ এর গ্রন্থনের সঙ্গে ঐ রীতি দেখব সেখানে মনে করব গোবিন্দদাস তালবৈচিত্র্যের জন্য ৭+৯ মাঝে মাঝে ব্যবহার করেছেন। গোবিন্দদাস যে পদাবলী-রাজ্যে কবি-সম্রাট তার কারণ তাঁর এই মাধুর্যগুণব্যঞ্জক শব্দানুষঙ্গ তাঁর কাব্যের মর্ম থেকে আপনি সমুদ্ভূত হয়েছিল। তাঁর যে-কোনও পদ বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে ভাবগৌরব এবং ভাষামাধুর্য দুই-ই পাশাপাশি চলেছে। একটি অন্যটিকে উপচিত করেছে। আবার অর্থের সঙ্গে অর্থ এবং শব্দের সঙ্গে শব্দও পূর্ণ সহযোগিতা ক'রে বিদ্যমান। অথচ অন্যদিকে "জগদানন্দ থলজলরুহ চরণকি বলিহারি" প্রভৃতি বচনবিন্যাস খোলের বোলের সঙ্গে যে-পরিমাণ সামঞ্জস্য নির্ধারণ করুক না কেন কাব্যের বিষয়ে তা সহাবস্থান-নীতি অতিক্রম করেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৈষ্ণব পদকর্তাদের ব্রজবুলি রচনা এইভাবে শব্দার্থের বিশিষ্ট সাহিত্যগুণ হারিয়ে ফেলায় এবং গতানুগতিকতায় পর্যবসিত হওয়ায়, প্রতিঘাত-রূপী লৌকিক ভাষা ও শ্বাসমাত্রিক ছন্দে নির্মিত শ্যামাসংগীতের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে।

ভাব এবং রূপ দুই দিক থেকেই মঙ্গলকাব্য পদাবলীর বিপরীত-ধর্মী রচনা। পদাবলী অন্তর্মুখ, মঙ্গলকাব্য বহির্মুখ। পদাবলী বাস্তববিমুখ—অপ্রাপণীয় সুদূরের প্রতি আগ্রহশীল, মঙ্গলকাব্য

লৌকিকমঙ্গলাপেক্ষ। পদাবলীর ভাষায় সংকেত ও সূক্ষ্মকারুকার্য, মঙ্গলকাব্য ঋজু ও সাধু লৌকিক বাঙলার প্রতিনিধি। লৌকিক মঙ্গল দানের নিমিত্ত চণ্ডীমঙ্গল-মনসামঙ্গল, এরই অনুকরণে চৈতন্যমঙ্গল। পদাবলীর যেমন মঙ্গলাপেক্ষা নাই, তেমনি জীবন-বৈচিত্র্যও নাই। পদাবলীতে যেখানে কাহিনীর স্পর্শ লেগেছে সেইখানে মাত্র ভাষা লৌকিকতা-সম্পন্ন হয়েছে, নতুবা বৈষ্ণব-কাব্য রূপকর্মের দিক থেকে 'নব রে নব নিতুই নব'।

মঙ্গলকাব্য-কথা

মঙ্গলকাব্য ছন্দ ও ভাষারূপের দিক থেকে কৃষ্ণকীর্তনের ধারা অনুসারী। আখ্যান কাব্যের বিষয়ে এ ভাষার যোগ্যতা অবশ্য স্বীকার্য। এতে শব্দালংকার নেই, স্থানে স্থানে অর্থালংকার রয়েছে মাত্র। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ কেবল চণ্ডীর রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে সংস্কৃতের অলংকারচাতুর্য দেখিয়েছেন। বিজয়গুপ্ত আলংকারিকতার দিকে যাননি বললেই চলে। যদিও অক্ষরমাত্রিক পদ্ধতিতে পয়ার ত্রিপদী ছাড়া আট মাত্রা, দশ মাত্রা, এগারো মাত্রার ছন্দ স্থানবিশেষে সকলেই ব্যবহার করেছেন।

মঙ্গলকাব্যের চৈতন্যপূর্ব এবং চৈতন্যপর এই দুই বিভাগ সমুচিত নয়, না ভাববস্তুর দিক থেকে, না ভাষাভঙ্গির দিক থেকে। মঙ্গল-কাব্য কোনোদিনই আত্মনিষ্ঠ পদাবলীর সগোত্র হয়ে ওঠে নি। একমাত্র সপ্তদশ শতাব্দীর কবি দ্বিজরামদেবের অভয়ামঙ্গলে শুধু বহিরঙ্গ গীতেই নয়, অন্তরঙ্গ কাহিনীবর্ণনের মধ্যেও, যেমন খুল্লনার বাৎসল্যে, গীতিভাবুকতা প্রভাব বিস্তার করেছে। নতুবা বৈষ্ণব গীতিকাব্যের প্লাবনের মধ্যেও মুকুন্দ চক্রবর্তী মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন এবং তাঁর কাব্যের বহির্মুখিতাকে বিন্দুমাত্রও ভাবুকতাসিক্ত করেন নি। সপ্তদশ শতাব্দীর কেতকাদাসও করেন নি, যদিও একথা ঠিক যে রূপবর্ণনাদির ক্ষেত্রে কেতকাদাস ভাষায় সহজ চারুতা এনেছেন। রামায়ণের বেলায় বরং সংগতভাবেই চৈতন্যপরত্ব ধর্মের প্রকাশ উল্লেখ্য হতে পারে। কিন্তু তাই ব'লে সীতা এবং চণ্ডীর

ভাবরূপে রাধাই প্রতিফলিত হয়েছেন এরকম ধারণা কিছুটা অব্যাপারে ব্যাপারবত্তার অনুসন্ধান হয়ে পড়ে।

বস্তুতপক্ষে পদাবলীর যুগে মঙ্গলকাব্যের বহির্মুখীনতা রক্ষাই সাহিত্যে বিস্ময়কর ব্যাপারের নিদর্শন, ছিটেফোঁটা প্রভাবের অস্তিত্ব নয়। একই কালে এই দুই বিরুদ্ধরীতির কাব্য বাঙ্‌লা দেশে আশ্রিত, পুষ্ট এবং রক্ষিত কী ক'রে হ'ল তার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে বাঙালি জাতির মানসিক গঠন অধ্যয়ন করতে হবে। একদিকে জীবন-বৈচিত্র্যের আস্বাদ, অন্যদিকে জীবনাতীতের অনুসন্ধান—ভাবজীবন ও বাস্তব জীবনের একত্র পরিচালন এবং সমন্বয়ই আমাদের মানস-প্রবণতার বৈশিষ্ট্য। তা ছাড়া লক্ষ্য করতে হবে যে, মঙ্গলকাব্যের প্রসারের মূলে রাষ্ট্র অথবা বণিক্‌সমাজ, নায়ক অথবা জমিদার শ্রেণী বিদ্যমান। মঙ্গলকাব্যের মূল স্রষ্টা সমাজ, পদাবলীর স্রষ্টা নিভৃতবাসী কবিব্যক্তি। ক্রমে সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে এর মধ্যে অনু-প্রবিষ্ট হয়।

মঙ্গলকাব্য প্রারম্ভে ব্যালাড্-জাতীয় রচনা ছিল। দেবতাকে কেন্দ্র ক'রে মানুষজীবনের সুখদুঃখের গীতে, 'যাত্রা'য় (=সম্মেলন), গাজন-উৎসবে (=গর্জন*) এর আবৃত্তি চলত। সে সময় নির্দিষ্ট কোনো কবি একটি সংগ্রথিত প্লট নিয়ে ও কাহিনী নির্মাণ ক'রে এই সব জীবনচিত্র ও দেবমহিমাকে সামগ্রিক কাব্যের আকার দেননি। আর্য-সভ্যতা ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিস্তৃতির পূর্ব থেকেই সমাজে এরকম ধর্মকেন্দ্রিক জীবনের প্রকাশধর্মের বীজ নিহিত হওয়া সম্ভব। চতুর্দশ পঞ্চদশ শতকে কবিরা যখন প্রচলিত বিচ্ছিন্ন কাহিনী অবলম্বন ক'রে সমগ্র কাব্য গড়ে তোলবার প্রযত্ন করলেন তখন নিঃসন্দেহে এর জন্যে বিশেষ একটি নির্মাণভঙ্গির অনুসন্ধানও তাঁদের করতে হয়েছিল। বাঙ্‌লায় সুগঠিত কাব্য বলতে তাঁদের সম্মুখে সংস্কৃত পুরাণের আংশিক অনুসারী কৃষ্ণকীর্তন হয়ত ছিল, হয়ত বা ছিল না। ফলে সংস্কৃত

* সামরিক ঘটনার অনুকৃতি।

পুরাণের গঠনরূপ তাঁদের স্বেচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক গ্রহণ করতেই হয়েছিল। এবং যদিও পুরাণের পঞ্চলক্ষণের (সর্গ, প্রতিসর্গ, দেব-বংশ, মন্বন্তরাদি এবং বংশানুচরিত) যথাযথ অনুসরণ সর্বাংশে সম্ভবপর ছিল না, তবু একথা মানতেই হবে যে পুরাণের নির্মাণ মঙ্গল-কাব্যের নির্মাণরীতির মূলে। এই কারণেই প্রারম্ভে দেবলীলা-কীর্তন ও শাপভ্রষ্ট দেবতাদের মানবরূপ পরিগ্রহের কথা।

কিন্তু পুরাণের নির্মাণরীতি অনুসরণ করলেও এবং দেবমহিমাকে বৃত্তের কেন্দ্রে স্থাপন করলেও "মঙ্গলকাব্য" যে-আকারে আমাদের সম্মুখে বর্তমান তাতে তা ষোল-আনা কাব্য। বাসনাময় মানুষের সুখদুঃখের কাহিনী প্রারম্ভ ও পরিণামে, আদি-মধ্য-অন্ত কৌশলে গ্রথিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ কাব্যের আস্বাদ আমাদের দিয়েছে। শুধু তাই নয়, মঙ্গলকাব্যে দেবতাকেও মানুষ করা হয়েছে। হরপার্বতীর মানুষী জীবনচিত্রই তার প্রমাণ। এর জন্যে মঙ্গলকাব্যের কবিরা পূর্বতন বহু সংস্কৃত কাব্য-কবিতা থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। শিবায়ন-রচয়িতা রামকৃষ্ণ প্রধানতঃ পুরাণ অবলম্বনে কাব্য লিখলেও কুমারসম্ভবকাব্যের স্থানবিশেষ কাব্যের অন্তর্নিবিষ্ট করতে দ্বিধা করেন নি। মঙ্গলকাব্য ট্র্যাজেডি নয়, কমেডি ; এর প্রারম্ভে সুখ, মধ্যে দুঃখ, পরিণামে দুঃখবিরোধের সমাধান ও স্বর্গারোহণ। এই সামঞ্জস্যময় নির্মাণরীতিতে কবিকঙ্কণই শ্রেষ্ঠ। তাঁর সামাজিক মন এই নির্মাণকেই চারুতা দিয়ে সম্পূর্ণ ক'রে তুলেছে, তাঁর বাস্তব জীবনবোধ এই ধরনের বৃত্তের পক্ষে একান্ত আবশ্যক হয়েছে। স্বল্পশক্তি কবিরা বৃত্ত, কাহিনী এবং জীবনচিত্রের এই একান্ত সহিতত্বের বিষয়ে অচেতন ছিলেন।

মঙ্গলকাব্য সুগ্রথিত কাব্য হ'লেও পূর্বসংস্কার অনুযায়ী এ গীতও বটে, অপূর্ণাঙ্গ যাত্রাও বটে। কবিকঙ্কণ প্রারম্ভে প্রার্থনায় বলেছেন— "বিশ্রাম দিবস আট, শুন গীত দেখ নাট"। মঙ্গলবার থেকে মঙ্গলবার আট দিনের, দিবা ও রাত্রিভেদে ষোলপালার গীতে, পালাগায়কের বিবেচনা-অনুসার বিভাগে মঙ্গলকাব্য তালমান সহযোগে গেয় ছিল।

নাট্যরূপ কী ছিল তা জানবার উপায় নাই। কৃষ্ণকীর্তন যদি যাত্রা-গানে প্রযুক্ত হয়ে থাকে তা নিশ্চিতই স্বতন্ত্র রীতির যাত্রা, গীতবহুল ও স্বল্প পাত্রপাত্রীর দ্বারা প্রযুক্ত। দ্বিজ রামদেব ও দ্বিজ মাধবের গ্রন্থে প্রতিদিনের দিবা ও রাত্রির পালা নির্দিষ্ট রয়েছে। তা ছাড়া পালাবিশেষের প্রারম্ভে গৌরচন্দ্রিকা-কল্পে গীতও যোজিত হয়েছে। এরকম বিভাগ ও গীতরচনা গায়েনের, কবির হতে পারে না। তবে কবি যদি নিজে গায়কও হন সে স্বতন্ত্র কথা। অনুমান হয় দ্বিজ রামদেব ও দ্বিজমাধব শুধু কাব্য-রচনা ক'রেই ক্ষান্ত হন নি, গায়কের কাজও করেছেন। মুকুন্দ, ভারতচন্দ্র, বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি গায়ক ছিলেন না।

মঙ্গলকাব্যধারার শেষ উল্লেখযোগ্য কবি ভারতচন্দ্র। তাঁর অন্নদামঙ্গলে পূর্বতন লৌকিকরীতির অনুসরণ এবং বিচ্যুতি দুই-ই দেখা গেল। ক্রমে ভাষার আভিজাত্য এবং অলংকরণ-রীতির প্রাধান্যে মঙ্গলকাব্য সমাজের আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হ'ল এবং গোষ্ঠীবদ্ধ বাক্যরসিকদের বিস্তর বাহবা অর্জন ক'রে রাত্রিশেষে আসর থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হ'ল। মঙ্গলকাব্য আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কোনও স্মৃতির প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। রীতি-অনুরাগী কবি ভারতচন্দ্রের বিষয় আলোচনার পূর্বে আমরা একালের কাব্য-গীতের স্বরূপ অনুসন্ধান করতে চাই।

মঙ্গলকাব্যগুলি যে ঢঙে গাওয়া হ'ত তাকে বলা হয়েছে পাঁচালি। কীর্তন, ভাটিয়ালি প্রভৃতি দেশীয় পদ্ধতি। পরবর্তী কালে উদিত বাউল, রামপ্রসাদী, তর্জা, টপ্পা প্রভৃতিও বিশেষ বিশেষ ঢঙের গীতরীতি। এগুলির সঙ্গে কখনও কখনও পূর্বেকার রাগ-সংগীতের কিছু কিছু মিশ্রণও ঘটেছে। আখড়াই, হাফ-আখড়াই, ঢপ-কীর্তন প্রভৃতি এরকম মিশ্রণ-জাত সুরবৈচিত্র্য। লক্ষণীয় এই যে, পাঁচালির রীতি বাঙ্‌লার সমূহ কাব্যকে সংগীতের পথে পরিচালিত করেছে। বলা যেতে পারে পয়ার-ত্রিপদীতে যেসব আখ্যানকাব্য রচিত হ'ত তার সবই

বিভিন্ন ঢঙ্ বা 'manner'

পাঁচালি-ঢঙে গীত হ'ত, অর্থাৎ রামায়ণ, কৃষ্ণমঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল, মনসামঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি থেকে আরম্ভ ক'রে অন্নদামঙ্গল এবং দাশুরায়ের খণ্ডকাব্যগুলির গীতরীতি পর্যন্ত এই পাঁচালি। কীর্তনের সঙ্গে পাঁচালির মিশ্রণজাত একপ্রকার ঢঙ্‌ আজও দেখতে পাওয়া যায়। কীর্তনের সঙ্গে রাগমার্গের মিশ্রণে একপ্রকার ঢপের কীর্তন এককালে খুবই জমেছিল। তেমনি রাগসংগীতের সঙ্গে তর্জার (তরজ্‌ = প্রকারবিশেষ + আ) খাদ মিশিয়ে আখড়াই প্রভৃতি বিভিন্ন রীতি অর্থাৎ গান গাওয়ার ধরন শেষ-মধ্যযুগে আসর মাত করেছিল। মধ্যযুগে গানের বিচিত্র ধরন এবং মিশ্রণ নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল। আধুনিক যুগে এর দৃষ্টান্ত ঠাকুরপরিবারে, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথে এবং কিছুটা দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে পাওয়া যায়।

বাঙ্‌লার প্রায় আদি কাব্য-গীত 'পাঁচালি' প্রারম্ভে যা ছিল, শেষের দিকে তা ছিল না এ সহজেই অনুমান করতে পারা যায়। কিন্তু মূল ঠাটটি যে নানাভাবে শেষ পর্যন্ত অনুসৃত হয়েছে একথাও সেই সঙ্গে বলা যায়। প্রশ্ন এই যে, এই মূল ঠাটটি কী? এবিষয়ে ডক্‌টর সুকুমার সেন অনুমান করেছেন যে, পাঁচালি পুতুলনাচ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, কারণ, পাঁচালি-শব্দের সংস্কৃত মূল হ'ল পাঞ্চালিকা, যার মানে পুতুল। ব্যুৎপত্তির দিক থেকে পাঞ্চালিকা থেকে পাঁচালি খুবই অনায়াস সন্দেহ নেই, কিন্তু পুতুল-নাচ থেকে ব্যাপক এবং অতি-বিশিষ্ট এই কাব্যগীতরীতিটি আসে নি। এটি যে খুব প্রাচীন না হ'লেও প্রাকৃত-অপভ্রংশ যুগের কাহিনী-কাব্যেরই একটি গীতরীতি তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

পাঁচালি

আমরা বাল্যকালে আমাদের গ্রামে প্রায়ই রামায়ণ-পাঁচালি শুনতাম। আজও স্বল্পপ্রচলিত হ'লেও এ রীতি রক্ষিত আছে এবং ক'লকাতাতেও মাঝে মাঝে শোনা যায়। এর ঢঙ ছিল, একজন মূলগায়েন আসরে দাঁড়িয়ে এবং সামনে-পিছনে গতায়াত ক'রে কাব্যের পয়ার অংশগুলি সুরে আবৃত্তি করতেন, আর

'লাচাড়ি'[1] অংশের আবৃত্তিতে নৃত্যচ্ছন্দে পদক্ষেপ করতেন। তাঁর পিছনে থাকত চারজন দোহার[2] বা জুড়ি, যাঁরা মূলগায়েনের আবৃত্তির পাদপূরণ করতেন বা একটি "ধ্রুব" কলি পুনঃ পুনঃ গেয়ে মূলগায়েন-গীত অংশের ভাবটিকে উদ্দীপিত ও সম্পূর্ণ করতেন। সামনে-পিছনে পা-চালি করা এঁদের পক্ষেও আবশ্যক ছিল। কোনও অংশের গানে ভাব যখন উদ্বেল হয়ে উঠত তখন জুড়িদের হাতের মন্দিরা, মূলগায়েনের পায়ের নূপুর ও বাদ্যযন্ত্র একসঙ্গে ধ্বনিত হয়ে উঠত এবং পঞ্চকণ্ঠের গীতি ও বাদ্যধ্বনি মিশ্রিত ঐকতানে আসর সরগরম হয়ে উঠত।

কীর্তন গানেও দোহারী থাকেন, কিন্তু তাঁরা আসরে চলাফেরা করেন না। কোনও কীর্তনে যদি ঐরকম করা হয় তবে তা পাঁচালির মিশ্রণ। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, আসরে মূলগায়েন ও সহায়ক চার যোগে পঞ্চ ব্যক্তির সম্মিলিত বিশিষ্ট গীতের রীতিই পাঁচালি। প্রমাণ অনুসন্ধানে দেখা যায়, দশম শতাব্দীতেও বাঙ্‌লা ভাষার উদ্ভবের আগেও এই গীতরীতি প্রচলিত ছিল। এর নাম ছিল 'পঞ্চালক'। এই 'পঞ্চালক' থেকেই স্ত্রীবাচক প্রত্যয় যোগে পাঁচালি। তুলনীয় প্রাদেশিক 'পচাল পড়া'। পুতুলনাচের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই।*

আমাদের অনুমানে কবি কৃত্তিবাসই বাঙ্‌লা কাব্যের গীতে পাঁচালি ঢঙের প্রবর্তক। তাঁর রামায়ণ কাব্যই এই রীতিতে গীত প্রথম কাব্য। "কীর্তিবাস" ভাষায় রামচরিতের প্রচার করেছিলেন,

১ নৃত্য > নাচ, লাচ + আল, আড় + ই = অর্ধ-নৃত্য।

২ ধ্রুবকার > দোহার।

* দশম শতাব্দীর বিক্রমশীলা বিহারের দর্শন ও ছন্দঃশাস্ত্রের অধ্যাপক জ্ঞানশ্রী মিত্র তাঁর 'ঈশ্বরবাদ' নিবন্ধে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ ক'রে বলছেন—ন অপ্রমাণানি ঋগ্‌যজুঃ সামানি ইত্যাদি যৎ পঞ্চালকং পঠতি তদেব স্বশিষ্য-সমেতাবেবোপযুজ্যতে। অর্থাৎ, বেদের প্রমাণ উদ্ধার ক'রে উনি যে পচাল পড়ে যাচ্ছেন তা নিজ শিষ্যদল সমেত হ'লে তবেই তো ঠিক হয়।

অধ্যাপক প্রবাল সেন এই প্রমাণটি উদ্ধার ক'রে দিয়েছেন।

কিন্তু তিনি আর্ষ রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি। "রামায়েৎ" সম্প্রদায়ের ভক্তিভাবুকতাকে আশ্রয় ক'রে, আখ্যান কাব্যের মধ্যেই গীতিভাবুকতা অনুপ্রবিষ্ট ক'রে, কতকটা লোকচিত্তরঞ্জক রামায়ণই সাধারণকে উপহার দিয়েছিলেন। এর জন্যে কিছু কিছু লোকপ্রচলিত কাহিনী এবং পূর্ববর্তী সংস্কৃত-প্রাকৃত ভাষার যাবতীয় রামচরিত থেকে উপাদান তিনি নিশ্চয়ই সংগ্রহ করেছিলেন। পরবর্তী কালে আরও নানান্ কথা তাঁর রামাখ্যানের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে বর্তমান-প্রচলিত রামায়ণকে পাঁচশ-বছরের বাঙালির ধর্মীয় ও সংস্কৃতির ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত ক'রে তুলেছে। কিন্তু এইরকম নানা উপকথা যোজনার মূল প্রেরণা যে কৃত্তিবাস থেকেই এসেছিল এ ধারণা অসমীচীন নয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণগান থেকে প্রেরণা পেয়েই 'অদ্ভুত রামায়ণে'র বাঙালি কবি আরও বহু উপকথায় রামায়ণকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। বাঙালির চিত্তবৃত্তির দিক থেকে নূতনত্বের প্রতি আগ্রহ্ একটি লক্ষণীয় বিষয়। দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি নূতনত্বের জন্যই রমণীয় হয়েছিল। মহাভারতের বেলায় জৈন ভারতকথাই আমাদের অধিকতর প্রিয় ছিল। তেমন কোনও বৈচিত্র্য ছিল না ব'লেই মালাধর বসু কৃত ভাগবতের অনুবাদ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। কবি কৃত্তিবাস শুধু সংস্কৃতবিৎ ছিলেন না, স্বদেশবাসীর "মনের ভুবনে নিভৃত গোপনে" প্রবেশের অধিকারও তাঁর ছিল। তাই একটি লোকায়ত গীতরীতিকে গুরুত্ব দিয়ে উচ্চতর কাব্যপর্যায়ের সঙ্গে সংমিশ্রিত ক'রে সাধারণ্যে কাব্য-রসাস্বাদের অধিকার পরিব্যাপ্ত ক'রে দিয়েছিলেন তিনি। এইজন্যেই তিনি স্মরণীয়, শুধু অনুবাদক হিসেবে নয়।

কৃত্তিবাস—দাশরথি

পাঁচালির রীতি কালক্রমে ভিন্নতর গীতরীতি, যেমন, কীর্তন, বৈঠকি রাগসংগীত, কবিগানের রীতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে পড়ে। দাশুরায়ের পাঁচালি এই মিশ্র ঢঙের। কিন্তু চামর মন্দিরা থাকা না-থাকা এর কোনও গুরুতর বৈলক্ষণ্য নয়। দাশরথি তাঁর কাহিনী-কাব্যের মধ্যে বহু রাগসংগীত ও কিছু দেশীয় সংগীত প্রবিষ্ট ক'রে দিয়েছেন। এই

বৈচিত্র্যের জন্যেই তাঁর পাঁচালি শোনবার আগ্রহ লোকপক্ষে অধিক ছিল। তা ছাড়া তাঁর ভাষাবৈচিত্র্য, তীব্র কটাক্ষ, তীক্ষ্ণ শ্লেষ এবং বহুল উপমা প্রয়োগের বাহাদুরিও তৎকালে খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে যে 'নলিনীভ্রমর কথা'র মত আখ্যানের পয়ার-ত্রিপদীর অংশগুলি তিনি প্রাচীন রীতিতেই সুরে এবং প্রয়োজনবশে নৃত্যভঙ্গিতে আবৃত্তি করতেন। তাঁর সহযোগী জুড়িরা ঐ অংশের আবৃত্তিতে পাঁচালি ঢঙের জুড়ির কাজ করতেন। আবার কীর্তনাদি গানের সময় তাঁরা তদনুযায়ী সহযোগীর ভূমিকা পালন করতেন। বস্তুতঃ রস ও রীতির বৈচিত্র্যই একালে আস্বাদনযোগ্য হয়েছিল। উপকরণের অভিনবত্ব থাকলেও তা গৌণ ব্যাপার।

বাঙালি পাঠক এবং শ্রোতাদের রুচি এবং অভিলাষ অনুযায়ী সাহিত্যে বিষয়বস্তু এবং ভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। সেকালে প্রায় সমূহ কাব্যসৃষ্টি 'রাজা' অর্থাৎ ভূম্যধিকারীদের আনুকূল্যে প্রচলিত হ'ত বলে এঁদেরও আপাততঃ ঐ সাধারণের অন্তর্ভুক্ত ক'রে দেখা যেতে পারে। সাধারণের রুচি নানা ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। আবার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বড় কবিরা তাঁদের উচ্চ স্বকীয়তার দ্বারা প্রচলিত রুচিকে কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত ক'রেও চলেছেন। এইভাবে সমাজের ও কবিদের প্রয়োজন এবং রুচি অনুযায়ী কালে কালে যে সব পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য এসেছিল তার স্বরূপ নির্ণয়ই সাহিত্যের ইতিহাসকারের কর্তব্য। একথা স্কুলের ছাত্রের কাছেও স্পষ্ট যে আকবর বা ঔরঙ্গজীবের শাসনারম্ভ বা মৃত্যুর তারিখ অনুসারে এবং সেই সঙ্গে গাণিতিক শতাব্দী অনুসারে বাঙালি-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রিত হয়নি। সুতরাং বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসের ঐভাবে কালবিন্যাস যুক্তিযুক্ত নয়। প্রাচীন কাব্যের অধ্যায়ে রূপবন্ধে এবং সেই সঙ্গে বিষয়ের মধ্যে যে সব নিশ্চিত পরিবর্তন এসেছে তা-ই ঐ সাহিত্যে যুগবিভাগের ধ্রুব নির্দেশক।

বৈষ্ণব সাহিত্যের সহজ-সুন্দর গীতিভাবুকতা এবং মঙ্গলকাব্যের

উদার জীবনবোধের ঔজ্জ্বল্য স্তিমিত হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে শ্যামাসংগীতের, অন্যদিকে পশ্চিম অঞ্চল থেকে আনীত কাহিনী কাব্যের উদ্ভব। এতকাল বাঙালি জীবন ও জীবনাতীতকে যেভাবে একত্র বরণ করেছিল সেই বিশেষ ধরনের রুচি যদিও রইল, বিষয় গেল বদলে। অবশ্য ভাবাবেগের মধ্যে তীব্রতা বা জীবনবোধের মধ্যে ব্যাপকতা তেমন রইল না তা বলাই বাহুল্য, তবু ঐ দুই ধারা যে নিঃশেষিত হয়ে পড়ল না তা-ই লক্ষণীয়। এখনকার ধর্মভাবুকতা হ'ল শ্যামাপ্রীতি বা তন্ত্র-যোগ-সাংখ্য-অদ্বৈতের সঙ্গে বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসকে জ্বাল দিয়ে এক সমন্বিত মিশ্রের সৃষ্টি, আর জীবনভাবুকতা বলতে বোঝাল শুধু প্রণয়-কথা। বিদ্যাসুন্দর রচয়িতারা, কবিওয়ালা ও টপ্পাগীতের প্রবর্তকেরা এই নূতনত্বের পথিক। ধর্মীয়তা থেকে অনিবার্যভাবে লৌকিকতায় সংক্রমণের চিহ্ন সপ্তদশ শতাব্দীতে পরিবর্তনের মধ্যে স্পষ্ট।

শ্যামাসংগীত—
রামপ্রসাদ

একথা ঠিক যে, শ্যামা-কালী-দুর্গা-পার্বতী নিয়ে রচিত গীতগুলি আবেদনের দিক থেকে প্রত্যক্ষ এবং স্পষ্ট। কিন্তু সেই সঙ্গে এও দ্রষ্টব্য যে বৈষ্ণবীয় ভাবগুলির সূক্ষ্মতা, যেমন প্রেমবৈচিত্ত্য বা মানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈচিত্র্যগুলি এর মধ্যে অবিদ্যমান ছিল। আর সেই সঙ্গে ভাষাও হয়ে পড়েছিল লৌকিক-ঘেঁষা, প্রাচীনকারুকলা-বিহীন। ভাবাবেগময় রচনায় নবশৈলীর প্রবর্তন রামপ্রসাদের কীর্তি। রামপ্রসাদ প্রচলিত ইডিয়মের সৌন্দর্যজনক ব্যবহার ক'রে এবং শব্দের মধ্যেই একধরনের বক্রতার বিন্যাস ক'রে রীতিবৈচিত্র্য সম্পাদনের প্রয়াসী হয়েছিলেন। যেমন—

"প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে সন্তরণে সিন্ধুতরণ।
আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন ॥"

"প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে।
সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি বুঝে নে মন ঠারে ঠোরে ॥"

"ও পদের মত পদ পাই তো সে পদ লয়ে বিপদ সারি" ইত্যাদি ॥

প্রসাদ এইভাবে লৌকিক সুভাষণের বক্রব্যবহারের সাহায্যে পদাবলীতে ভিন্নতর ভাষারীতি দিয়ে গেছেন। সহজ লৌকিকের কবি চণ্ডীদাসদের এ সাধ্য ছিল না। ভাব ও ভাষার প্রত্যক্ষতা এবং ছড়ার ছন্দে বাহিত লৌকিক চারুত্বের সঙ্গে প্রসাদী সুরের সহজ কারুকার্য এবং সর্বজনীনতার বিষয়টিও একত্র বিবেচ্য। ভাব ও রূপবন্ধের এই ঘনিষ্ঠতার জন্যই আজও রামপ্রসাদ বাঙ্‌লায় জীবিত কবি। রামপ্রসাদের ভাবানুষঙ্গ অনুসরণ ক'রে যাঁরা লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে কমলাকান্ত কিন্তু ভিন্নরীতির। তিনি সাহিত্যিক ভাষা এবং গতানুগতিক অলংকরণের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এই শ্রেণীর দাশরথি একেবারে স্বকীয়। তাঁর শ্লেষ ও যমক প্রয়োগ একালের সব কবিকেই ছাড়িয়ে গেছে এবং উপমান সমাহরণে তাঁর জুড়ি নেই। ডক্‌টর দীনেশচন্দ্র সেন ঠিকই মন্তব্য করেছেন যে, পরিত্রাহি চীৎকার না করলে কবির উপমা থামবার নয়। তাঁর সমকালীন ভাবশিষ্য হলেন ঈশ্বরগুপ্ত, শুধু বাক্‌রীতিতেই নয়, ব্যঙ্গপ্রবণতার দিক থেকেও।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ভারতচন্দ্রের পূর্বেই অলংকৃত বাগ্‌ভঙ্গির বহুল প্রসার বাঙলায় ঘটেছিল। বৈষ্ণব কবিরা শুধু শব্দালংকার-অর্থালংকারেরই বিচিত্র পরিচয় রেখে যাননি, সংস্কৃত-প্রাকৃত ছন্দ নিয়েও নাড়াচাড়া করেছিলেন। গোবিন্দদাসের পদে সমাসবদ্ধ শব্দাবলী পরোক্ষে বাঙ্‌লার প্রকাশশক্তি বহুদূর বাড়িয়েছিল। গোবিন্দদাসের তোটক ছন্দে রচনার নিদর্শন—

> ধনি কানড় ছান্দে বাঁধে কবরী।
> নব মালতিমাল তঁহি উপরী॥
> ধনি সিন্দুরবিন্দু ললাটে বনী।
> অলকা ঝলকে তঁহি নীলমণি॥ ইত্যাদি।

আখ্যান কাব্যে অলংকৃত শৈলীর পূর্ণ পরিচয় দিয়েছিলেন আলাওল এবং দ্বিজ রামদেব। এঁরা দুজনেই সমকালীন এবং সমতট অঞ্চলের লোক। একটি প্রহেলিকার পদ পদ্মাবতীকাব্য এবং

অভয়ামঙ্গল দু'জায়গাতেই দেখা যাচ্ছে।* কিন্তু আলাওল তাঁর অলংকৃত বাগ্‌ভঙ্গির জন্যে ঠিক মৌলিকতা দাবী করতে পারেন না। যে জায়সীর কাব্যের তিনি অনুবাদক সেই মূল কাব্যেই সব অলংকার-প্রয়োগ রয়েছে। আলাওল তার বিশ্বস্তভাবে অনুবাদ করেছেন মাত্র। প্রসঙ্গক্রমে আমরা সংক্ষেপে জায়সী থেকে আলাওলের পার্থক্য এবং উভয়ের একত্ব কোথায় তা নির্দেশ করছি। দুবিবী সংস্করণ পদ্মাবতী কাব্য এবং নাগরী প্রচারিণী সভা থেকে মুদ্রিত পণ্ডিত রামচন্দ্র শুক্লের সম্পাদিত পদুমাবৎ এক্ষেত্রে অনুসরণীয় হয়েছে।

আলাওল

পদ্মাবতীর স্তুতিখণ্ড বা সৃষ্টিখণ্ড পদুমাবতের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ। কোরান ও অন্যান্য ইসলামি কেতাব অনুসারে সৃষ্টি বর্ণনের সঙ্গে উপনিষদ ও ভারতীয় রহস্যবাদের মিলন জায়সীই করেছেন। মাগনঠাকুরের রূপের বর্ণনা ও মাগন নামের ব্যাখ্যা আলাওলের স্বকীয়। কাব্য ও বাক্য সম্বন্ধে আলাওলের নানাস্থানে উক্তি (এই গ্রন্থের প্রারম্ভে অংশবিশেষ উদ্ধৃত) আলাওল সংস্কৃত কবি ও আলংকারিকদের অনুসরণে করেছেন। তা ছাড়া নমস্ক্রিয়া এবং বস্তুনির্দেশও প্রাচীন প্রাচ্য আদর্শ অনুসারেই বর্ণনা করেছেন। যে-যুক্তি অবলম্বনে কিছু কিছু নূতন বিষয় বিন্যাস ক'রে তিনি নিজ কাব্যের উৎকর্ষ বিধান করতে চেয়েছেন তা এইরকম—

কাব্যকলা সকল সুগন্ধি ভরি পূর।
দূরেত নিকট হয় নিকটেত দূর॥
নিকটেত দূব যেন পুষ্পেতে কলিকা।
দূরেও নিকট মধুমাঝে পিপীলিকা॥
বনখণ্ডে থাকে অলি কমলেতে বশ।
নিয়ড়ে থাকিয়া ভেকে না জানয় রস॥
এই সূত্রে কবি মহাম্মদে করি ভক্তি।
স্থানে স্থানে প্রকাশিব নিজমনউক্তি॥

* ভুবন দ্বিগুণ করি তাহাতে তপন পুরি তার আধা করিমু যে পান—ইত্যাদি।

সপ্তসিন্ধুর বর্ণনা, বিরহের দশ দশা এবং দশমী দশায় রাজা রত্নসেনের বিরহবিকার বর্ণনা, রত্নসেনের যোগী হওয়ার প্রসঙ্গে যোগমার্গের বর্ণনা, নাথপন্থের বিবরণ, রত্নসেন পদ্মাবতীর বিবাহের পূর্বে রত্নসেনের পরীক্ষার ঘটনা, যেমন অশ্বচালন, ধনুর্বাণ-সংযোগ, হস্তিচালনা, চৌগান খেলা, পিঙ্গল ছন্দ, বৈষ্ণব অলংকার ও রস এবং সংগীতদামোদর অনুসরণে শব্দশাস্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের বিচার এসব জায়সীতে নাই। কিন্তু আলংকারিক বর্ণনার অংশগুলিতে অনুবাদক কর্তৃক মূলের অনুসরণ সুস্পষ্ট। আলাওল অবশ্য কোথাও কোথাও জায়সীর বর্ণনা আগে পরে সাজিয়ে নিয়েছেন। জায়সীতে আছে আলাওলে নেই এবং আলাওলে আছে জায়সীতে নেই অলংকারময় এরকম অংশগুলি সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে কিছু বলার উপায় নাই, কারণ, আলাওলের ব্যবহৃত পুঁথির পরিচয় পাওয়া যায় না। নিচে পদুমাবৎ ও পদ্মাবতীর রূপ-বর্ণনা থেকে কিয়দংশ উদ্ধার ক'রে আমরা আলাওলের অনুবাদের প্রকৃতি দেখাতে চাই—

পদুমাবৎ—

বরনৌ মাঙ্গ সীস উপরাহীঁ।
সেন্দুর অবহি চঢ়া জেহি নাহীঁ॥
বিনু সেন্দুর অস জানহু দীআ।
উজিয়র পন্থ রয়্‌নি মহঁ কীআ॥
কঞ্চন রেখ কসৌটী কসী।
জনু ঘন মহঁ দামিনী পরগসী॥
সুরজ কিরিন জনু গগন বিসেখী।
জমুনা মাহঁ সুরসরী দেখী॥
খাঁড়য়্‌ ধার রুহির জনু ভরা।
করবত লেই বেণীপর ধরা॥
তেহি পর পূরি ধরে জো মোতী।
জমুনা মাঝ গঙ্গ কয়্‌ সোতী॥
করবত তপা লেহি হোই চূরু।
মকু সো রুহির লেই দেই সেঁদুরু॥

কনক দুআদস বানি হোই
চহ সোহাগ ওহ মাঁগ।
সেবা করহি নখত সব
উবয় গগন জস চাঁদ॥

কহৌঁ লিলার দুইজ কয় জোতী।
দুইজহি জোতী কহাঁ জগ ওতী॥
সহস কিরিন জো স্বরুজ দিপাঈ।
দেখি লিলার সোউ ছপি জাঈ॥
কা সরিবর তেহি দে উমপন্থু।
চাঁদ কলঙ্কী বহ নিকলঙ্কু॥
ঔ চাঁদহি পুনি রাহু গরাসা।
বহ বিনু রাহু সদা পরগাসা॥
তেহি লিলার পর তিলক বইঠা।
দুইজ পাঠ জানহু ধ্রুব দীঠা॥
কনক পাট জনু বইঠা রাজা।
সবয় সিঁগার অব লেই সাজা॥
ওহি আগে থির রহা ন কোউ।
দহঁ কা কহঁ অস জুরয় সংজোগূ॥

খরগ ধনুক চক বাণ দুই জগ
ভাস তিন্‌হ নাবঁ।
সুনি কয় পরা মুরছি কয়
ভোকহ হএ কুঢাবঁ॥

ভৌ হঁয় শ্যাম ধনুক জনু তামা।
জা সহুঁ হের মার বিষবাণা॥
হনয় ধুনয় উন্‌হ ভৌঁহনি চঢ়ে।
কেই হাতিয়ার কাল অস গঢ়ে॥
উহয় ধনুক কিরস্নন পর অহা।
উহয় ধনুক রাঘৌ কর গহা॥
ওহি ধনুক রাবণ সংঘারা।
ওহি ধনুক কংসাসুর মারা॥

ওহি ধনুক বেধা হুত রাহু।
মারা ওহি সহস্রাবাহু ॥
উহয় ধনুক মঁয় তাপহ চীন্হা।
ধানুক আপ বেঝ জগ কীন্হা ॥
উন্হ ভোঁহনি সরি কেউ ন জীতা।
অছরী ছপীঁ ছপীঁ গোপীতা ॥

-পদ্মাবতী —

তার মধ্যে সীমন্ত খড়্গের ধার জিনি।
বলাহক মধ্যে যেন স্থির সৌদামিনী ॥
স্বর্গ হইতে আসিতে যাইতে মনোরথ।
সৃজিল অরণ্য মধ্যে মহা সূক্ষ্ম পথ ॥
সেই পথে বাটোয়ার বৈসে অনুদিন।
কুটিল অলেকা পাশে ব্যক্ত রক্তচিন ॥
কিম্বা কসটীর মাঝে স্বর্ণরেখাকার।
যমুনার মাঝে কিম্বা সুরেশ্বরী ধার ॥
জন্মান্তের বাঞ্ছা সিদ্ধি হইতে সহসাত।
ত্রিবলি উপরে যেন ধরিছে করাত ॥
কিম্বা মুখচন্দ্র আঁখি অরুণ দেখিয়া।
ত্রাসে ফাটিয়াছে কিবা তিমিরের হিয়া ॥
কার শক্তি আছে সেই পন্থে যাইবার।
রুধির মিশ্রিত যেন তীক্ষ্ণ অসিধার ॥
কদাচিৎ কেহ যদি যায় গম্য আশে।
মন বন্দী হয় তার অলকার ফাঁসে ॥
ভাগ্যের উদয়স্থলী ললাট সুন্দর।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র জিনি অতি মনোহর ॥
বালক চন্দ্রিমা অঙ্গ বাড়ে দিনে দিন।
মহান ললাট অতি ভাগ্যে বিধি চিন ॥
কি মতে বলিব ভানু তুলনা সে অঙ্গ।
সকলঙ্ক চন্দ্রিমা ললাট নিষ্কলঙ্ক ॥
কহু রাহু করে চন্দ্রে আলোপ গরাস।
মহান ললাট চন্দ্র সতত প্রকাশ ॥

ক্ষেণেক আলোপ চন্দ্র ক্ষেণেকে বিদিত।
প্রসিদ্ধ ললাট চন্দ্র সদা প্রকাশিত॥
মৃগমদ তিলক সিন্দুর চারি পাশ।
চন্দ্রিমা উপরে রাহু মিহিরা গরাস॥
স্বেদবিন্দু কপালেতে উগয় যখন।
মুকুতা আসিল কিবা ভ্রাতৃ-সম্ভাষণ॥
যাহার ললাট পূর্ণ ভাগ্যের উদয়।
সেই ললাটেতে হইব সংযোগ নিশ্চয়॥
কামের কোদণ্ড ভুরু অলেকা সন্ধান।
যাহারে হানয় বালা লয় যে পরাণ॥
ভুরুভঙ্গি দেখি কাম হইল অতনু।
লজ্জা পাই তেজিল কুসুমশরধনু॥
ভুরুচাপ গুণাঞ্জন বিকাশ কটাক্ষ।
ত্রিভুবন শাসিল করিয়া সেই লক্ষ্য॥

আমরা আলাওলের অলংকরণ-রীতি সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা এই জন্যে করলাম যে, আমাদের ধারণা অনুযায়ী আখ্যান কাব্যে রূপবর্ণনাদিতে অলংকৃত বাক্য গঠনের রীতি এসেছিল (১) হিন্দি সাহিত্য থেকে (২) সংস্কৃত সাহিত্য থেকে। এই দুই থেকে এবং ফারসি সাহিত্য থেকে ধর্মসম্পর্কহীন প্রণয়মূলক কাব্যরচনার প্রবৃত্তিও এসেছিল। "বিদ্যাসুন্দর" কাহিনীর আবির্ভাব বাঙ্‌লা কাব্যের দিক্‌-পরিবর্তনকেই বিশেষ ভাবে সূচিত করছে। এই সব মিলে সপ্তদশ শতকেই একদিক থেকে ধর্মকেন্দ্রিকতার প্রায় বিদায় ধ্বনিত হ'ল এবং ভাবের কথা অথবা জীবনানুরাগের আন্তরিকতার স্থানে আর্টের সৌন্দর্যই কবি এবং শ্রোতার প্রধান অভিলাষের বস্তু হয়ে দাঁড়াল। এ বিষয়ে উন্নত প্রতিনিধিস্থানীয় কবি হলেন ভারতচন্দ্র। দেবীর উপর ভক্তি তাঁর যে ছিল না এমন নয়, মানুষের জীবনের দ্বন্দ্বসংঘাত সম্বন্ধে তিনি যে একেবারে উদাসীন ছিলেন এমনও নয়, কিন্তু তাঁর আন্তরিকতা ছিল কাব্যের বিপ্লবী নব-ভাবুকতার সঙ্গে, রূপবন্ধের সঙ্গে, তির্যক বাচনভঙ্গির সঙ্গে। এই

জন্যেই তিনি অন্নদামঙ্গলের মধ্যে বিদ্যাসুন্দর প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়েছেন। এই কারণেই তাঁর মঙ্গলকাব্যাংশের বস্তুবর্ণন বা চরিত্রের মূল উপাদান কবিকঙ্কণ থেকে স্বতন্ত্র নয়। তাঁর রূপানুগত্যের আধার হিসেবে যে-পরিমাণে মঙ্গলকাব্য গ্রহণীয় ঠিক সেই পরিমাণেই তিনি এর আখ্যায়িকা ও বর্ণনবিভাগ গ্রহণ করেছেন। সহৃদয় পাঠকেরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, বিদ্যাসুন্দরোপাখ্যান শেষ হবার পর মানসিংহের অধ্যায় আর তেমন জমে নি। এতে গুণরীতির সেই চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য নেই যাতে পাঠককে অভিভূত ক'রে রেখে দেয়। বলিষ্ঠ ও সুসংগত বাঙ্‌লা কবিতার ভাষা অথবা 'good prose'-এর লক্ষণ যদিও এ অংশে আছে, তার অধিক চারুত্ব ক্বচিৎ আছে, আতিশয্য নেই। ভারতচন্দ্র লৌকিক ইতিবৃত্তের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক প্লট মিশ্রিত ক'রে কোন-প্রকারে তাঁর প্রতিশ্রুত রচনা শেষ করেছেন। তবু ভারতচন্দ্র এই রীতিনিষ্ঠ কাব্যের ভাষানির্মাণ সম্পর্কে পথিকৃৎ হওয়ার দাবি করতে পারেন না, যদি কেউ পারেন তিনি আলাওল, কিছু বৈষ্ণব পদরচনা, আর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত যুগ-রুচি। বাঙ্‌লায় 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা তাঁর শতাব্দী-পূর্বেই প্রারব্ধ হয়েছিল।

ভারতচন্দ্র

ভারতচন্দ্র তাঁর গ্রন্থমধ্যে তাঁর রচনা সম্বন্ধে আপাতদৃষ্টে দুটি পরস্পরবিরোধী উক্তি করেছেন। একটি হ'ল 'যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে।' আর একটি 'না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল। অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥' এর দ্বিতীয়টিই যথার্থভাবে কবির আন্তরিক অভিপ্রেত। অপ্রচলিত সংস্কৃত বা প্রচলিত তদ্ভব শব্দের স্থানে ফারসি শব্দ ব্যবহার ক'রে তিনি কাব্যের দ্রুতি এবং দীপ্তিগুণ বর্ধিত করতে চেয়েছিলেন। ছন্দোগত অনুপ্রাস রক্ষার্থেও ফারসি শব্দের প্রয়োজন ছিল। এক্ষেত্রে—যে হৌক সে হৌক ভাষা—ইত্যাদি বিবৃতি তিনি ঐ ফারসি শব্দ ব্যবহারের সমর্থনেই দিচ্ছেন। বলা বাহুল্য, ভারতচন্দ্র-ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দের অনেকগুলিই তখন সাধারণ্যে কথিত অথবা জ্ঞাত ছিল, নতুবা

খুব অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহারে তিনি নিশ্চয়ই দ্বিধা বোধ করতেন। আসলে ভারতচন্দ্র সংস্কৃতজ্ঞ হয়েও সংস্কৃত বচনভঙ্গির আভিজাত্য মানেন নি, প্রচলিত ভাষাকেই মর্যাদা দিয়ে কাব্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। সংস্কৃতের অলংকরণাদি লৌকিক ভাষাতেই সিদ্ধ করেছেন। ভারতচন্দ্রের উপর যাঁরা সংস্কৃতের প্রভাব নির্দেশ করতে যত্নবান্ হন তাঁরা তাঁর এই লোকভাষাসিদ্ধির দিকটি অনুধাবন করেন না। সমাস-প্রত্যয়-যুক্ত সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করলে ভাষার প্রসাদগুণ রক্ষা করা সম্ভব হ'ত না।

মনে রাখতে হবে ভারতচন্দ্র ক্লাসিক্যাল মনোভাবের কবি ছিলেন না। তিনি মানবীয় প্রণয়ের নবকাব্য নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। এই ভাবনার উদ্দীপনে বৈষ্ণব কাব্য সহায়তা করেছিল, মূল ভাবনাটি সৃষ্ট হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের নব মানবীয়তায় এবং তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বে। ক্লাসিক্যাল এবং রোম্যান্‌টিক এই দুটি শব্দ সাহিত্য বিচারে সর্বদা প্রয়োজনীয় হ'লেও আমরা এগুলির ব্যবহার সম্বন্ধে সর্বদা খুব সজাগ থাকি না। ভারতচন্দ্রের মনোভঙ্গি বিশ্লেষণ ক'রে এই সিদ্ধান্তই সমীচীন যে, প্রচলিত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধিকে যে-মানসিকতা উল্লঙ্ঘন করবার জন্য ব্যগ্র, আমাদের সেই কল্পনাপ্রবণ স্বপ্নচারী মনোভাবেরই প্রকাশক তিনি। রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে সংস্কৃতের অলংকরণভঙ্গি আশ্রয় করলেও সেইসব স্থান বচনচতুর বাক্যরচনা মাত্র হয়েছে। তাছাড়া 'বিদ্যা'র রূপবর্ণনার ভঙ্গি এবং বিস্তারটুকুও কবির কল্পলোককেই প্রকাশ করে। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের মূলে বিল্‌হণের যে-চৌরপঞ্চাশিকা বা সংস্কৃত 'বিদ্যাসুন্দর' রয়েছে তাও রোম্যান্‌টিক কাব্য। সংস্কৃতে নবম-দশম শতাব্দী থেকে প্রণয়বিষয়ে যেসব শতক, পঞ্চাশৎক, একক কবিতাবলী রচিত হয়েছে সেগুলি নবীন ভাবুকতার দিক থেকে যেমন গ্রহণীয়, রূপবন্ধের দিক থেকে তেমন নয়। সেগুলির রূপবন্ধে সংযত ও সীমিত বাক্‌প্রয়োগ বিরল। "পদ্মাবতী"র কবিও 'প্রেমকবি' 'প্রভুর ভাবক'। সুতরাং সংস্কৃতানুসারী অলংকরণ-প্রাচুর্য থাকলেও রায়গুণাকরের কাব্যটি রোম্যান্‌টিক

প্রণয়ধর্মী। লৌকিক বাঙ্‌লা ভাষার প্রতি ভারতচন্দ্রের শ্রদ্ধাও তাঁর নব্য মনোভঙ্গির সূচক। প্রবাদ-প্রবচনের মত কবির বহু লোকসিদ্ধ কথা রয়েছে যা সকলের জানা। আমরা সংস্কৃতানুসারী অলংকরণ থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার ক'রে দেখাতে চাই যে কবি প্রচলিত এবং তদ্ভব শব্দ দিয়েই তাঁর সৌন্দর্য নির্বাহ করেছেন—

ভুরু দেখি ফুলধনু ধনু ফেলাইয়া।
লুকায় মাজার মাঝে অনঙ্গ হইয়া॥

*　　*　　*

বিননিয়া চিকনিয়া বিনোদ কবরী।
ধরাতলে ধায় ধরিবারে বিষধরী॥
চক্ষে জিনি মৃগ ভালে মৃগমদবিন্দু।
মৃগ কোলে করিয়া কলঙ্কী হইল ইন্দু॥

*　　*　　*

রতন কাঁচুলি শাড়ী বিজুলী চমকে।
মণিময় আভরণ চমকে ঝমকে॥
কথায় পঞ্চম স্বর শিখিবার আশে।
ঝাঁকে ঝাঁকে কোকিল কোকিলা চারিপাশে॥

*　　*　　*

চক্ষুর চলন দেখি শিখিতে চলনি।
ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন খঞ্জনী॥

পাঠক লক্ষ্য করবেন এর অতৎসমগুলি তুলে দিয়ে যথাসম্ভব তৎসম শব্দ বসিয়ে ভাষাকে প্রাচীন করার প্রয়াস ভারতচন্দ্র করেন নি। লৌকিক ভাষাতে কথা বলাই ভারতচন্দ্রের স্বভাব এবং এ বিষয়ে তিনি কবিকঙ্কণ মুকুন্দকেও স্থানে স্থানে ছাড়িয়ে গেছেন। বস্তুতঃ রোম্যান্‌টিকতার সঙ্গে বাস্তবতার নানা স্থানে বিরোধ থাকলেও ভাষা-ব্যবহারে বোধ হয় বিরোধ নেই। ভাষাভঙ্গির ক্ষেত্রে রোম্যান্‌টিক শ্রেণীর কবিরা স্বচ্ছন্দচারী। এই কবি বৈষ্ণব পদের অনুসরণে কয়েকটি গীতের সন্নিবেশও নিজ গ্রন্থে করেছেন। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, অনুকরণ ব'লেই সেগুলি কাব্যের আন্তরিকতাহীন অলংকরণ

মাত্র হয়েছে। "ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে" প্রভৃতি রূপ এবং অরূপ দুদিক থেকেই ব্যর্থ।

ভারতচন্দ্রের ছন্দ। ভারতচন্দ্র অক্ষরমাত্রিক এবং মাত্রাবৃত্ত উভয় রীতির ছন্দেই সুদক্ষ। তা ছাড়া ঝোঁকযুক্ত চতুর্মাত্রিক পর্বের ছন্দের ব্যবহারও ভাবের সঙ্গে সংগতি রেখে করেছেন। মিল যোজনায় তিনি পূর্ববর্তী কবিদের থেকে দক্ষতর, মাত্রাবৃত্তে যৌগিক অক্ষরকে নিশ্চিত ২ মাত্রার মূল্যদানে তিনি অধিকতর সচেতন। মাত্রাবৃত্তে প্রতিপর্বে দীর্ঘ মাত্রা সন্নিবেশ বিষয়ে সামঞ্জস্য ও সৌষ্ঠবের দিকে তিনি সর্বাধিক মনোযোগী। তাঁর—

(কত) নিশান ফরফর নিনাদ ধর ধর
কামান গরগর গাজে।
(সব) জুবান রজপুত পাঠান মজবুত
কামান শরযুত সাজে॥

প্রভৃতি এই সৌষ্ঠব-সচেতনতার উদাহরণ। ভারতচন্দ্র নব্যক্লাসিক্যাল রীতির এক অতি সুদক্ষ আর্টিস্ট্। বাঙ্‌লা স্বর ও ব্যঞ্জন তাঁর হাতে যেন চৈতন্য লাভ করেছে। কলাগুণে তাঁর যে অধিকার তাঁর তিরোভাবের শতাব্দীমধ্যে বাঙ্‌লায় তা নেই। পরবর্তী একমাত্র রবীন্দ্রনাথে ঐ কলাগুণ উচ্চতম ভাবাভিব্যক্তির সঙ্গে একাত্ম হয়ে অবশ্য আরও সার্থক হয়েছে। কিন্তু, ভারতচন্দ্রের পর কবিতা লিখে যশ অর্জন করা দুরূহ, হেমচন্দ্রের এরকম উক্তি অসার্থক নয়। মধুসূদনই বাঙ্‌লার রুচি ভিন্ন পথে চালিত করেছিলেন এবং বস্তুতঃ বাঙ্‌লা কাব্যে তাঁর স্বীকৃতি পাবার পর থেকে অর্থাৎ আনুমানিক ১৮৭০-৭৫ এর পর থেকে রায়গুণাকরের সমাদর কমতে থাকে।

রীতিগত সৌন্দর্যসর্বস্বতার জন্যই ভারতচন্দ্র সংস্কৃত-প্রাকৃতের কয়েকটি ছন্দ বাঙ্‌লা ভাষায় খুব অনায়াসেই ব্যবহার করেছিলেন। অবশ্য তোটকাদি ছন্দের ব্যবহার বৈষ্ণব কবিরা পূর্বেই করেছিলেন, কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত এত অনায়াসে নয়। সে যাই হোক, তাঁর সংস্কৃত ছন্দের ব্যবহার সম্বন্ধে এই কথাটিই বিশেষভাবে স্মর্তব্য যে

তিনি বাছা বাছা কয়েকটি ছন্দোরূপেরই ব্যবহার দেখিয়েছেন। তোটক, তূণক এবং ভুজঙ্গপ্রয়াত এমন ধরনের ছন্দ যে এগুলির যতিবিভাগ এবং দীর্ঘ-হ্রস্বের প্যাটার্‌ন্‌ বাঙ্‌লা যতি-মূলক উচ্চারণ পদ্ধতির খুব দূরবর্তী নয়। তিনি বলদেব পালিত বা ভুবনমোহন রায়চৌধুরীর মত বাঙ্‌লা অক্ষরে তাবৎ সংস্কৃত ছন্দের প্রয়োগ দেখাতে যান নি। সত্যেন্দ্রনাথের মত মালিনী, শিখরিণী, ত্রিষ্টুভ্‌ মন্দাক্রান্তা নিয়ে পরীক্ষামূলক গবেষণায় নিরত হন নি। বলা বাহুল্য, তোটক, তূণক প্রভৃতি মাত্রাবৃত্ত প্রাকৃতের ছন্দ। পরে সংস্কৃতের অঙ্গে এগুলিকে প্রযুক্ত করা হয়েছে। আমি ঐ রীতিগুলির খাঁটি বাঙ্‌লা রূপান্তর দেখাচ্ছি—

∘∘ ‖ ∘∘ ‖ | ∘∘ ‖ ∘∘ ‖
মূল তোটক—ক্ষম হে পতি হে | বঁধু হে প্রিয় হে =৮+৮

∘∘ ‖ ∘∘ ‖ | ∘∘ ‖ ∘ ∘ ‖
নব যৌবন জো | রের যোগ্য নহে =৮+৮

∘∘ ∘ ∘ ∘ ∘ | ∘∘ ∘ ∘ ∘ ∘
বাঙ্‌লা রূপান্তর—ক্ষম হে : পতি হে | বঁধু হে : প্রিয় হে =৬+৬

∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ | ‖ ∘ ∘∘ ∘
(নব) যৌবন্‌ : জোরের | যো গ্য : নহে যে =৬+৬

∘∘ ∘ ∘ ∘ ∘ | ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘
তেমনি— রস লাভ হবে | রহিয়া ফুটিলে =৬+৬

∘∘ ∘ ∘∘ ∘ | ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘
বল কি হইবে | কলিকা দলিলে =৬+৬

মাত্রাবৃত্ত থেকে অক্ষরমাত্রিকে রূপান্তরিত। কিন্তু যতিস্থান ঠিকই আছে।

∘ ‖ ‖ ∘ ‖ ‖ | ∘ ‖ ‖ ∘ ‖ ‖
মূল ভুজঙ্গপ্রয়াত— ভু জ ঙ্গ প্র য়া তে | ক হে ভা র তী দে =১০+১০

∘ ‖ ‖ ∘ ‖ ‖ | ∘ ‖ ‖ ∘ ‖ ‖
স তী দে স তী দে | স তী দে স তী দে =১০+১০

দীর্ঘীকরণজাত অস্বাভাবিকতা বাদ দিয়ে বাঙ্‌লা অক্ষরমাত্রিকে রূপান্তর—

ভু জ ঙ্গ : প্র য়া তে | ক হে ভা : র তী দে =৬+৬

স তী দে : স তী দে | স তী দে : স তী দে =৬+৬

যতিপাতের এই মিলটুকু থাকায় এবং দীর্ঘীকরণকে অনিবার্য বোঝা-পড়া এই রকম মনে থাকায় এসব ছন্দ বাঙ্‌লায় স্বল্পকৃত্রিমতার মধ্যে হয়ত আজও চলে যায়। কিন্তু শিখরিণী-স্রগ্ধরা-বসন্ততিলকাদি যে চলবে না একথা আর্টিস্‌ট্ ভারতচন্দ্র নিঃশেষে বুঝেছিলেন। আধুনিক সত্যেন্দ্রনাথ হয়ত বা তেমন বোঝেন নি।

তোটক ছন্দে সম্ভোগ-শৃঙ্গার বর্ণনা ক'রে ভারতচন্দ্র কৌশলে আদিরসের কদর্যতাকে আবৃত করেছেন ("কাব্য-নির্ণয়"-কার এবং কোনও কোনও আধুনিকের মন্তব্য দ্রষ্টব্য) একথা যাঁরা বলেন তাঁরা রায়গুণাকরকে চেনেন না। কারণ রায়গুণাকর এসব বিষয়ে খুব সুস্থ মনের অধিকারী ছিলেন। বিপরীত-বিহারে তাহ'লে অক্ষর-মাত্রিকের ত্রিপদী ব্যবহার করলেন কেন? আমরা মনে করি, ভারতচন্দ্র কবি হিসাবে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন, তিনি শুধু রাজসভার মনোরঞ্জনের জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর কাব্যে ঐ সব অধ্যায় জুড়ে দেবেন, এমন কথাও নির্ভরযোগ্য নয়। মনোরঞ্জন নয়, কৌশলে বর্ধমানরাজের নিন্দন হয়ত কৃষ্ণনগর-রাজসভার অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু থাক্ সে কথা, আমরা রূপ-রীতির প্রদর্শক মাত্র। উল্লেখ্য এই যে, ঐ তোটক ছন্দেই ধর্মীয় এবং দেশাত্মবোধক কবিতাও রচিত হয়েছে ("ব্রজ-নন্দকি নন্দন নীলমণী" "গুরুদেব দয়া কর দীন জনে" "কত কাল পরে বল ভারত রে" প্রভৃতি স্মরণীয়)।

কবি হিসেবে মধুসূদনের আবির্ভাব এবং ভারতচন্দ্রের তিরোভাবের মধ্যে ঠিক একশ বছরের ব্যবধান। এর মধ্যে রূপ ও রীতি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি কিছুই হয়নি, বরং অনর্থক যমক-শ্লেষে কবিতার ভাষায় দুর্গতি এসেছিল যথেষ্ট। কবিওয়ালা থেকে

ঈশ্বরগুপ্ত পর্যন্ত সেই মহড়া, চিতেন, চাপান-উতোরের পালোয়ানি কসরত, শ্লীল ও অশ্লীলের ভেদজ্ঞানহীন সমবায়।

ভারতচন্দ্রের পর

রঙ্গলালকেও রীতির দিক থেকে গুণী বলা চলে না, তিনি কাব্যে যদিচ রুচির কিছু পরিবর্তন এনেছিলেন, বক্রোক্তির বিষয়ে অভিনিবেশের অভাবে তিনি সরল বর্ণয়িতামাত্র হয়ে রইলেন। রঙ্গলালকে সমাচ্ছন্ন ক'রে সেকালে ভারতচন্দ্রই দীপ্যমান। ঈশ্বরগুপ্ত সাময়িক উত্তেজনার বিষয়কে আশ্রয় ক'রে কিছুকাল বস্তুপ্রবণতার আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু যাঁরা মনোযোগ সহকারে কিছু পড়তেন ও শুনতেন অন্নদামঙ্গলই তাঁদের অবলম্বন ছিল।

মধুসূদন সম্পর্কে প্রথম লক্ষণীয় তাঁর কাব্যরচনার উদ্‌যোগ এবং অধ্যবসায়। ছন্দঃসরস্বতী তাঁর কাছে জ্যোতিঃরূপে সহসা আবির্ভূত হয় নি। অমিত্রচ্ছন্দের সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য যে-কৌশলের উপর নির্ভরশীল, শব্দগ্রন্থন এবং বাক্যবিন্যাসের সেই বিশেষ রীতিটি আয়ত্ত করতে তাঁর সময় লেগেছিল। য়ুরোপীয় কাব্য ও

মধুসূদন

শাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং অনুশীলন থেকে নিবৃত্ত হয়ে মাতৃভাষার সেবাব্রত গ্রহণ এবং উদ্‌যাপনের মধ্যে যে-অধ্যবসায় এবং আত্মপ্রত্যয়ের স্বাক্ষর তিনি রেখে গিয়েছেন তার সাদৃশ্য কোনও দেশের সাহিত্যেই সুলভ নয়। কিন্তু মধুসূদন যে দ্রুত সিদ্ধি অর্জন করলেন তার পিছনে দুটি কারণ অনুধাবনীয়—(১) কবির রামায়ণাদি প্রাচীন বাঙ্‌লা সাহিত্যের সঙ্গে শ্রুতিগত গভীর পরিচয়, (২) সেকালের উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের এবং সংস্কৃতির কর্ণধারদের মধ্যে মাতৃভাষায় রচনার জন্য আগ্রহ ও উদ্দীপনা। প্রথম কারণটি মধুসূদনের কবিজীবনের মূলে নিহিত হয়েছিল। ১৮০২ খ্রীঃ প্রকাশিত শ্রীরামপুরী রামায়ণের পাঠ মধুসূদন বাল্যে শুনেছিলেন এবং নিশ্চয় নিজেও পড়েছিলেন। ঐ রামায়ণে 'কৃত্তিবাস' এর পাঠ 'কীর্তিবাস'। মধুসূদন সর্বত্র 'কীর্তিবাস' শব্দই ব্যবহার করেছেন। মেঘনাদবধ কাব্যে মধুসূদন রাবণের ও রামের চরিত্রে যে পরিবর্তন

এনেছিলেন তার জন্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ অথবা বাঙ্‌লা রামায়ণ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ দায়ী ব'লে আমাদের মনে হয়েছে। বাঙ্‌লা রামায়ণেই রাবণ তাঁর রাক্ষসত্ব পরিত্যাগ ক'রে মানী রাজার রূপ পরিগ্রহ করেছেন। মেঘনাদের মৃত্যুশোকে বাঙালি রামায়ণকারেরা কম দুঃখিত হন নি, আর শরাহত রাবণের কাছে রামচন্দ্র রাজনীতি শিক্ষা করতে যাচ্ছেন, বাঙালি রামায়ণকারেরা রামচন্দ্রের কপালে এও লিখে গিয়েছেন! রামপক্ষেও দেখা যায়, তিনি কোমল রাম, দয়াল রাম, প্রভু রাম। এসব বিষয় বহুপূর্বে ডক্‌টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে বলেছেন। মধুস্দনের নব কাব্য যখন বের হ'ল তখন এর বর্ণনা, ছন্দ, ভাষা সব মিলে আমাদের কাছে কাব্যটিকে উগ্রভাবে আধুনিক ব'লে প্রতীত করেছিল এবং মধুস্দন বিজাতীয় ভাবসম্পন্ন কবি এই ধারণাই আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। আজকের দিনের অপেক্ষাকৃত তটস্থ বিচারবুদ্ধিতে দেখা যাচ্ছে, মধুস্দন বাঙালির চিত্তে যে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন তার কারণ তিনি জাতীয় ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করেন নি। আজকের আমরা সেই মধ্যযুগের স্মৃতিবাহী আমরা এবং সেই অবস্থায় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রবর্তী আমরাও। দার্শনিক বের্গসঁর মনন অনুসরণ করে বলা যায়, আমাদের জাতীয় চরিত্রে পূর্ব-পূর্ব স্মৃতির অনুসরণ এবং পরিবর্তনের জন্য অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষা দুইই ক্রিয়াশীল হয়েছে। মধুস্দন এই ঐতিহ্যকে যদি গুরুতরভাবে অতিক্রম করতেন তাহ'লে ক্ষণকালের মধ্যেই তাঁর কবিকৃতির শেষ বিচার সমাধা ক'রে আমরা ভাবী কালের প্রতীক্ষায় থাকতাম।

রাবণ চরিত্রের নির্মাণের মূলে শৈব চাঁদসদাগরের উন্নত ব্যক্তিত্বের প্রভাব পড়াও বিচিত্র নয়। এসব মধুস্দনের সংস্কারসিদ্ধ প্রায়-অচেতন মনের অনিবার্য সৃষ্টি। এরই সঙ্গে তাঁর সচেতন মন মিল্‌টনের স্যাটান, ভার্জিলের ঈনীড্‌, হোমারের হেক্‌টর এবং দেবদেবী, ট্যাসোর কাব্যের ক্লোরিণ্ডা প্রভৃতি চরিত্র এবং বাঙ্‌লা মঙ্গলকাব্য, সংস্কৃত পুরাণ এবং কালিদাসের কাব্যাদি থেকে বিচিত্র

বর্ণনার বিষয় সংগ্রহ ক'রে তাঁর মহাকাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করেছিল। সে কথা প্রারম্ভে কবি স্বয়ং বলেছেন। আমাদের বক্তব্য এই যে, ঐ সব সমাহরণ তাঁর কাব্যগত বক্রোক্তির মধ্যে কোথাও সৌন্দর্য-সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে, কোথাও হয়নি, অতিরিক্ত সচেতনতার ফলে যা হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থান্তরে করবার ইচ্ছা রইল।

উপরে বিবৃত দ্বিতীয় কারণটির ব্যাখ্যা স্বরূপ রঙ্গালয়ের জন্য আগ্রহ এবং উদ্‌যোগ, কবির বাল্যসুহৃদ্ ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং রাজনারায়ণ বসুর বাঙ্‌লা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা, সর্বজনবরেণ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কীর্তি, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অনুরাগ এবং আরও বহু সৃষ্টি, বক্তৃতা ও মন্তব্য স্মরণীয়। বেথুন সাহেবের উপদেশ বাঙ্‌লায় নব-অভ্যুদিত এই সাহিত্যিক আবহাওয়াকে লক্ষ্য ক'রেই প্রেরিত হয়েছিল। এদিকে মধুসূদন যদিও ক্ষণিক উত্তেজনার মুখে দেশত্যাগী হয়েছিলেন, দেশের এই আবহাওয়ার মধ্যে ফিরে আসবার জন্যেই অন্তরে প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

মেঘনাদবধের ভাষায় কিছু ত্রুটি আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু গুণের তুলনায় তা যৎসামান্য ব'লেই প্রতীত হবে। অসমসাহসিক কার্যে উদ্‌যোগী হয়ে যিনি কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তাঁর কৃতিত্বই বিস্ময়কর, অসাফল্য নয়। তাঁর যাবতীয় দোষের মধ্যে যদি কিছু স্মরণীয় হয়, তা'হলে পঙ্‌ক্তির শতকরা একটি হিসেবে বাক্যের জটিলতা দোষ আর মাত্র দুচারটি স্থানে শব্দের গ্রাম্যতা-দোষ, যেমন—

> অঙ্গদ, করভসম নব বলে বলী,
> কিম্বা বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক
> ভূষিত, হিমান্তে অহি ভ্রমে উর্ধ্বফণা—
> ত্রিশূল-সদৃশ জিহ্বা লুলি অবলেপে।

এখানে যথাযথ উপমানের অনুসন্ধানই বাক্যের এই গোলযোগের কারণ। মধুসূদন যদিও উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁকে ভাবানুযায়ী শব্দ আহরণ করতে হবে এবং কেবল তদ্ভব বাঙ্‌লা ব্যবহারের অনৌচিত্য

সম্পর্কে তিনি একদা এমন কঠিন মন্তব্য করেছিলেন যে—it is the language of the fishermen, unless you import largely from Sanskrit, তবু দুএকটি ক্ষেত্রে অতি-প্রচলিত এবং slang শব্দের ব্যবহার কর্ণপীড়াদায়ক হয়েছে। যেমন—"খেদান মশকবৃন্দে" "টানিল হুড়ুকা ধরি হড়হড় করি" "মোর কিরে প্রাণেশ্বর" ইত্যাদি। তাঁর অনুপ্রাস ব্যবহার যদিচ অনেক ক্ষেত্রেই মধুর এবং সার্থকও, তবু "কিভাবে ভাবিনি আজি ভেটিবে ভবেশে" অথবা "বরজে শজারু পশি বারুইর যথা" ইত্যাদি ঈশ্বরগুপ্ত-পদ্ধতির নিরর্থক তরলতার বিষয়ই প্রকাশ করে।

"মধুসূদনীয় অলংকার" ব'লে বিশেষ কোনও পদ্ধতির অলংকার নেই। উপমাশ্রেণীর অলংকার, যথা উপমা, প্রতিবস্তূপমা, দৃষ্টান্ত, উৎপ্রেক্ষা, রূপক প্রভৃতি মধুসূদন পূর্ববর্তী মহাকবিদের মতই গঠন করেছেন, ভঙ্গিটি তাঁর নিজস্ব। বলা যেতে পারে, স্থানে স্থানে তাঁর উপমানাদির নির্মাণ বিস্ময়করভাবে মৌলিক হয়েছে, বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যে কোন্‌খানে অলংকারের অতিশয় প্রত্যাশিত সৌন্দর্যের সঞ্চার করবে এ তাঁর জানা ছিল, তাঁর গোচরে ছিল স্বর্গমর্ত্যের উদাত্ত এবং প্রসিদ্ধ বস্তু, যা দিয়ে তিনি উপমান নির্মাণ করছেন, যেমন ধরা যাক নিম্নলিখিত 'দৃষ্টান্তে'র মধ্যে—

সভয় হইল আজি ভয়শূন্য হিয়া !
প্রচণ্ড উত্তাপে পিণ্ড, হায়রে, গলিল !
গ্রাসিল মিহিরে রাহু, সহসা আঁধারি
তেজঃপুঞ্জ ! অম্বুনাথে নিদাঘ শুষিল !
পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে !

সূর্যের রাহুগ্রাস, সমুদ্রের শুষ্ক হওয়া এসব উপমান সাধারণ নয়। তেমনি নলের দেহে কলির প্রবেশ একটি অসামান্য প্রসিদ্ধ ঘটনা। মিহির, অম্বুনাথ এবং নলের সঙ্গে মেঘনাদের উপমাও সৌন্দর্যবহ, আর সেই সঙ্গে 'pity' এবং 'terror' ব্যঞ্জিত করার দিক থেকেও অতুলনীয়। আর এই সব উপমান অনায়াসে এসেছে ব'লে

মহাকাব্যোচিত সরলতাও এতে ব্যক্ত হয়েছে। শুধু উপযুক্ত শব্দের গ্রন্থনেই উপমা মহাকাব্যিক মর্যাদা লাভ করেছে নিম্নলিখিতরূপ উদাহরণে—

কিম্বা নদীগর্ভে যথা
অবগাহকেরে দূরে নিরখিয়া, বেগে
যমচক্ররূপী নক্র ধায় তার পানে
অদৃশ্যে, লক্ষ্মণ শূর, বধিতে রাক্ষসে,
সহ মিত্র বিভীষণ, চলিলা সত্বরে।

মধুসূদনে এরকম উদাত্ত গম্ভীর ভাবের উদ্দীপক অলংকার নির্মাণ প্রচুর। একটি সাঙ্গরূপক দেখা যাক। মন্দোদরী সকাশে মেঘনাদ ও প্রমীলা। বিদায়দৃশ্য, সুতরাং উপমানাদির মধ্যে তথা ভাষার মধ্যে অর্থাৎ বর্ণ ও শব্দের ব্যবহারে করুণ-কোমল সৌন্দর্যের রক্ষণ লক্ষণীয়—

শরদিন্দু পুত্র ; বধূ শারদ-কৌমুদী ;
তারা-কিরীটিনী-নিশি-সদৃশী আপনি
রাক্ষস-কুল-ঈশ্বরী ! অশ্রুবারিধারা
শিশির, কপোল-পর্ণে পড়িয়া শোভিল !

সাঙ্গরূপক মাঝখানে 'সদৃশী' শব্দের যোগে খণ্ডিত হ'লেও স্বাভাবিকই হয়েছে। আনুপূর্বিকভাবে অলংকার রক্ষা তো সুকবির ধর্ম নয়। হোমারীয় উপমার মত বিস্তার-বৈচিত্র্যও মধুসূদন ক্বচিৎ দেখিয়েছেন, যেমন—"যথা দেবতেজে জন্মি দানবনাশিনী চণ্ডী" ইত্যাদি সপ্তমসর্গ। কিন্তু সংক্ষিপ্ত দু'একটি পঙ্‌ক্তিতেই প্রায়শ অলংকার বক্তব্যের পরিপক্বতার সহায়ক হয়েছে, যেমন, "মুকুতামণ্ডিত বুকে নয়ন বর্ষিল উজ্জ্বলতর মুকুতা" "আক্রমিলে হুতাশন কে ঘুমায় ঘরে ?" "প্রাক্তনের গতি, হায়, কার সাধ্য রোধে ?" ইত্যাদি। নিম্নলিখিত অংশটি শুধু রূপকের মাল্যগ্রন্থন হিসেবেই উল্লেখ্য নয়, climax-এর দিক দিয়েও স্মরণীয় সৌন্দর্য সঞ্চার করেছে—

মূর্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দয় দেশে!
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম! ভুজঙ্গিনী-রূপী
এ কাল কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি!

মধুসূদনের কাব্য যেভাবে প্রস্তুত তাতে নামধাতু বা আভিধানিক শব্দের প্রয়োগ তেমন দূষণীয় নয়, বরঞ্চ কোথাও কোথাও কাব্যের সৌন্দর্যবৃদ্ধিই করেছে। তা ছাড়া লক্ষণীয় এই যে, অপরিচিত শব্দ কবি এমন কৌশলে কাব্যের মধ্যে ব্যবহার করেছেন যে, একটু ধৈর্য ধারণ করলেই বাক্যার্থবোধের সঙ্গে ঐ শব্দটির অর্থও প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যেমন, যুদ্ধের বর্ণনায় "উড়িল কলম্বকুল অম্বরপ্রদেশে" অথবা "ইরম্মদে ধাঁধি বিশ্ব গর্জিল অশনি"—এখানে প্রসিদ্ধ পদের সঙ্গে সন্নিবিষ্ট হয়ে "কলম্ব" এবং "ইরম্মদ" আপনার অর্থ আপনিই প্রকাশ করছে। এ বিষয়ে একটি মজার কাহিনী উল্লেখ্য। কশ্চিৎ নবীন অধ্যাপক মেঘনাদবধের প্রথম সর্গ পড়াচ্ছিলেন। বীরবাহুর বীরত্ব-বর্ণন প্রসঙ্গে যুদ্ধের চিত্রে যেখানে রয়েছে "অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্যক্ষ" ইত্যাদি সেই স্থানটিতে একটু আগের থেকেই তাঁর চোখ পড়ে গেছে। বলা বাহুল্য 'হর্যক্ষ' শব্দের অর্থ তাঁর জানা ছিল না, আর সেদিন তিনি পূর্বাহ্ণে পড়েও আসতে পারেন নি। এ অংশটি এমন যে হর্যক্ষ শব্দের অর্থ নির্দেশ না ক'রে পাশ কাটিয়ে মোটামুটি একটা ব্যাখ্যা দিয়ে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। দেড়শো ছেলের মধ্যে কেউ না কেউ হর্যক্ষ শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করবেই। তখন উপায়ান্তর না দেখে তিনি আর না এগিয়ে বীররস এবং মধুসূদন সম্পর্কে উদাত্তকণ্ঠে বোঝাতে আরম্ভ করলেন। এরপর তাঁর কথাতেই বলি "কিন্তু এই ভাবেই বা কতক্ষণ চলা যায়? ঘণ্টা তো অনেক দূর। তা ছাড়া মুখে বক্তৃতা ক'রে গেলেও চোখ মাঝে মাঝে বইয়ের পাতার সেই অংশটাতেই গিয়ে নিবদ্ধ হচ্ছে যেখানে ঐ শব্দটা রয়েছে। আমি ঘামতে লাগলাম। আমার মনে হ'ল হর্যক্ষ বীরবাহুকে ছেড়ে আমাকেই আক্রমণ করতে ছুটে আসছে। দর্পহারী মধুসূদন! তোমাকে অবহেলা করার দর্প তুমি এই ভাবেই চূর্ণ করলে! কিন্তু

সহসা আশ্চর্যভাবে পটপরিবর্তন হ'ল! দর্পহারী ভয়ত্রাতারূপে দেখা দিলেন। ঐ অংশে মনোযোগ পড়তে পড়তেই নজরে পড়ল পরের পঙ্‌ক্তির 'কড়মড়ি ভীমদন্ত পড়ে লম্ফ দিয়া বৃষস্কন্ধে'। তখন সন্দেহই রইল না যে ঐ অপরিচিত জীবটি সিংহ। অবশ্য ব্যাঘ্রও যে ঐ সব কাজ না করে তা নয়, তবু সিংহের উপমানই যথার্থতর মনে হল। মধুসূদন নিজেই যখন আমাকে বাঁচালেন তখন আর আমাকে পায় কে? আমি দ্বিগুণতর বেগে প্রবলতর মুষ্টি আস্ফালন সহকারে ব্যাখ্যা করতে লাগলাম।"

মধুসূদন কবি হিসেবে অচেতন এবং সচেতন দুইই ছিলেন। তাঁর অচেতন সত্তা ছন্দঃপ্রবাহের সঙ্গে শব্দতরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত ক'রে অবিরাম ফেনায়িত হয়ে অগ্রসর হয়েছে। আর তিনি সজ্ঞানে তরঙ্গভঙ্গিকে সমঞ্জস রেখায় বিন্যস্ত ক'রে এর মধ্যে আবর্তাদির সৌন্দর্য নিহিত ক'রে চলেছেন।

এখন তাঁর ছন্দঃ সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ। মধুসূদনের মহাকাব্য-সঞ্চারী মন একটি যোগ্য সুর ও ভাষাগত মাধ্যমের সন্ধান করছিল। পয়ার-ত্রিপদীর নিরূপিত অর্থনিরপেক্ষ যতিবন্ধন ও অন্ত্যানুপ্রাসের তরলতা তাঁর কাছে বিসদৃশ বোধ হয়েছিল। মিল্‌টনের Blank Verse তাঁকে বাঙ্‌লায় অনুরূপ অমিত্র বন্ধনের জন্যে লোভাতুর করেছিল। বাঙ্‌লায় আখ্যানকাব্যে সর্বাধিক প্রচলিত পয়ারকে গ্রহণ ক'রে অমিত্রাক্ষর করলে কিরকম হয় সে বিষয়ে পরীক্ষামূলক রচনা তিনি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের কাছে উপস্থাপিত করেন। ক্রমে পদ্মাবতী নাটকে এবং তিলোত্তমাসম্ভবে এর ব্যবহার করেছিলেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে ছেদ যতি অর্ধযতি

প্রাথমিক পরীক্ষামূলকতার পর এই ব্যাপারটি তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে পয়ারাদিতে যেমন, তেমনিভাবে, যতিকে শব্দার্থের উপর নিঃশেষে প্রাধান্য বিস্তার করতে দিলে অভিপ্রেত ভাবপ্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখা যাবে না। প্রচলিত অক্ষরমাত্রিকে অর্ধযতি তো বটেই এমন কি পূর্ণযতিও স্থানে স্থানে শব্দের মধ্যে প'ড়ে ভাবকে বিঘ্নিত

করেছে। যতি (যার দ্বারা সামঞ্জস্যপূর্ণ অতিনিরূপিত ছন্দোবোধ জন্মায়) এইভাবে একচ্ছত্র আধিপত্য পেয়ে এসেছে শব্দার্থের মহিমা রক্ষা না ক'রেই। গীতিকাব্যোচিত করুণ কোমল ভাবের ব্যঞ্জনার পক্ষে ছন্দের ভাবনিরপেক্ষ স্বরাজ সুফলপ্রসূ হতে পারে। কিন্তু অর্থনির্ভর মহাকাব্যের পক্ষে তা ব্যর্থ ব'লে তাঁর কাছে প্রতীত হ'ল। পয়ারের সুরগ্রন্থন ছিল এই—

কাননে কু ॥ সুম কলি । সকলি ফু ॥ টিল।

অমিত্রচ্ছন্দে দাঁড়াল এই—

কাননে ॥ কুসুম ॥ কলি । সকলি ॥ ফুটিল।

যাঁরা যাবতীয় অক্ষরমাত্রিকে শব্দভিত্তিক অর্ধযতি বণ্টন ক'রে থাকেন তাঁরা পদ্যচ্ছন্দে সুর ও তালের স্বরাজ্য অনুধাবন করেন না। ইংরেজি বা অমিত্রাক্ষর দৃষ্টেই এরকম পরামর্শ দেন। বস্তুতঃ এই পরিবর্তন মধুসূদনেরই কীর্তি এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের উপর নির্ভরশীল গৈরিশ ছন্দ, রবীন্দ্রনাথের মিত্রাক্ষর-অমিতাক্ষর, বলাকার ছন্দ, গদ্যচ্ছন্দ সকলেরই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু খাঁটি পয়ার-ত্রিপদীর নয়। সেখানে যদি অর্ধযতি কোথাও শব্দের শেষে পড়ে থাকে থাকুক, কিন্তু তা নিয়ম নয়, অনায়াসে শব্দের মাঝেও পড়তে পারে। কিন্তু অমিত্রাক্ষরে শব্দের মাঝে না পড়াই নিয়ম। অথচ মধুসূদনের "ব্রজাঙ্গনা" পড়ুন, শব্দের মাঝে যতিপতন প্রায়শই অনুভব করবেন।

মধুসূদন যতি ত্যাগ করেন নি, অর্ধযতিও নয় পূর্ণযতিও নয়, কিন্তু যতির স্বরূপ বদলে দিয়েছিলেন, তার সুরানুগত্য খর্ব করেছিলেন। অনেক স্থানেই ছেদের সামীপ্যের জন্য তাঁর যতির পূর্ণ মূল্যের লাঘব ঘটেছে। উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে, নিম্নলিখিত স্থানে ছেদ যতির বশবর্তী হয়েছে ব'লে যতির প্রায় পূর্ণমূল্য আমরা পাচ্ছি—

সাজ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,

অথবা,

নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি!

কিন্তু নিম্নলিখিতরূপ উদাহরণে ষষ্ঠ ও অষ্টম অক্ষরের পরবর্তী যতির মানমূল্য একেবারে গৌণ হয়ে পড়েছে—

ইচ্ছা করে, ত্যজি
রাজ্যসুখ, যাই চলি হেন বনবাসে !

দ্বিতীয় চরণের শেষে অবশ্য ছেদ ও যতি মিলে যাওয়ায় সুর ও অর্থের সহাবস্থান ঘটেছে। মোট কথা, ছেদবিধানের স্বাধীনতা অর্থাৎ অর্থানুযায়ী বিরামের প্রাধান্যই অমিত্রাক্ষর বা অমিতাক্ষরের কঠিন সৌন্দর্যের প্রাণবস্তু, এইভাবেই মধুসূদন সুরকে অতিক্রম ক'রে ভাবের মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন। অথবা এমনও বলা যায়, সুরকে ও ভাবকে এক অভিনব সৌন্দর্যের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। "তিলোত্তমা-সম্ভবে" কবি ছেদের এই মুক্তির দিকটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হতে পারেন নি, পঙ্‌ক্তিমধ্যে তিন অক্ষরের শব্দ এবং দুই অক্ষরের শব্দের বিন্যাসের অমোঘ নিয়মটি (পূর্বে দ্রষ্টব্য) সম্বন্ধেও অবহিত হতে পারেন নি। আর হেমচন্দ্র অমিত্র অক্ষর স্থাপন করলেও পয়ারের সুর (ঐ যতিপ্রাধান্য) লঙ্ঘন করেন নি। তিলোত্তমা-সম্ভবে অমিত্রচ্ছন্দ দুর্বল, মেঘনাদেও কচিৎ ত্রুটিযুক্ত, একমাত্র বীরাঙ্গনা কাব্যই এবিষয়ে ত্রুটিহীন। প্রশ্ন এই যে, এই ছন্দোরীতিতে চরণের যে-কোনও সংখ্যক অক্ষরের পর ছেদ-বিন্যাস কি চলবে ? এর উত্তরে বলা যায় যে, না।—এক অক্ষরের পর এবং সাত অক্ষরের পর ছেদ পড়তে পারে না, এবং যেহেতু চরণের প্রারম্ভে তিন-অক্ষর শব্দ এবং দু-অক্ষর শব্দের পাশাপাশি অবস্থানে সুরবিরোধ ঘটে সেইহেতু পঞ্চমাক্ষরের পর যতিও বিরলদৃষ্ট। অমিত্রচ্ছন্দের এই শব্দ-সামঞ্জস্য ও ছেদবিধির নিয়মটি স্খলিত হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত তিলোত্তমায় যথেষ্ট, মেঘনাদে কচিৎ। যেমন—

তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়
ডোবে শোক সাগরে, মৃণাল যথা জলে,

অর্থাৎ মধুসূদনের ছেদ পড়বে ২, ৩, ৪, ৬, ৮ ইত্যাদির পর।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঐ ধরনের সমিল ছন্দে অযুগ্মাক্ষরের হাঙ্গামায় না গিয়ে সর্বত্র যুগ্ম অক্ষরের পরই ছেদ স্থাপন করেছেন।

হেমচন্দ্র মধুসূদনের এই ভাবপ্রাধান্যের রীতি আত্মস্থ করতে পারেন নি। চরণান্তিক অমিত্রতা যদ্যপি অবলম্বন করেছেন, যতি এবং অর্ধযতির পূর্বতন মূল্যমান সর্বতোভাবে রক্ষা করেছেন। পয়ারের মতই তাঁর ভাবচ্ছেদ যতির কাছে গৌণ হয়েছে। হেমচন্দ্র তাঁর মহাকাব্যে বিচিত্র মনোভাব ও প্রসঙ্গের অবতারণায় ছন্দো-বৈচিত্র্য প্রয়োজনীয় বোধ করেছেন। তাঁর মহাকাব্য বিভিন্ন রসের উপস্থাপনে, বিশেষতঃ বীররসের সমুচিত ব্যবহারে, তদনুযায়ী চরিত্রের গঠনে, স্থান ও কালের উপযোগী নানা বিষয় ও বস্তুর বর্ণনে এবং সর্বোপরি জাতীয় স্বাধীনতা বিষয়ক মনোভাবের উদ্দীপনে বাহ্যতঃ খুবই উপযোগী মহাকাব্য, যদিও কাব্যাংশে বৃত্রসংহার মেঘনাদবধ থেকে নিম্নমানের। হেমচন্দ্র বৃত্তনির্মাণে মধুসূদনের অনুসরণ করেছেন, আবার চরিত্রাদির নির্মাণে মধুসূদন যেখানে যেখানে তাঁর কাছে অচল ব'লে মনে হয়েছে সেখানে ভিন্নপথ অবলম্বন করেছেন। কিন্তু রূপকার হিসেবে হেমচন্দ্রের কৃতিত্ব মহাকাব্যনির্মাণে নয়, খণ্ডকবিতা বা গীতিকবিতায় পয়ার-ত্রিপদীকে আশ্রয় ক'রে বিচিত্র ভঙ্গির স্তবক নির্মাণে। পদ্মের মৃণাল, লজ্জাবতী লতা, পরশমণি প্রভৃতি কবিতায় তিনি ছয় সাত থেকে বারো পর্যন্ত চরণে ত্রিপদী-চৌপদীর নানা প্রকার মিশ্রণে স্তবক বন্ধন করেছেন। হেমচন্দ্রের আন্তরিক অনুরাগ এবং যাবতীয় কবিত্বও তাঁর ঐ কবিতাবলীতেই প্রকাশিত। মধুসূদন তাঁর ব্রজাঙ্গনায় যদ্যপি স্তবকনির্মাণের পরিচয় রেখে গেছেন, এই নিয়ে পরীক্ষামূলক যাবতীয় বৈচিত্র্যের উদ্ভব ঠিক পরের ঘটনা। একালের ছন্দঃকুসুম, নিবাতকবচবধ, রাবণবধ প্রভৃতি পুস্তকে সংস্কৃত বাঙ্‌লা বিচিত্র ছন্দোরূপ নিয়ে কবিরা উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

হেমচন্দ্র

হেমচন্দ্র যে ছন্দ-সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না অন্য একটি

ব্যাপারও তা প্রমাণ করে। ঘটনাটি হ'ল দীর্ঘমাত্রার অক্ষর ব্যবহারের প্রয়াস। সেকালে সংস্কৃত ছন্দের অনুসরণে বাঙ্‌লায় দীর্ঘমাত্রার প্রচলন ঘটাবার প্রয়াস করছিলেন অনেকেই। হেমচন্দ্র খাঁটি বাঙ্‌লা ছন্দের মধ্যেই দীর্ঘস্বর দু'একটির দীর্ঘ উচ্চারিত হওয়ার সামর্থ্য পরীক্ষা করেছেন—প্রথম 'ছায়াময়ী'তে অক্ষরমাত্রিক রীতির মধ্যেই ('ভীতবদনা পৃথিবী হেরিছে ঘোর অন্ধকারে মিশি' ইত্যাদি 'ছায়াময়ী'র প্রারম্ভ) এবং পরে 'দশমহাবিদ্যা'য় অক্ষরমাত্রিক এবং মাত্রাবৃত্ত উভয় রীতিতেই। এ সম্পর্কে কবি বলেছেন—"আপাততঃ দুই একটিকে কোন কোন সংস্কৃত ছন্দের অনুরূপ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহাদের গঠনপ্রণালী এবং লক্ষণ অন্যরূপ" ('দশমহাবিদ্যা'র বিজ্ঞাপন)। কিন্তু পাঠকের কাছে এত ব্যাখ্যার কোনও প্রয়োজনীয়তা ছিল না, কারণ, প্রাচীন বাঙ্‌লায় পদাবলীর মধ্যেই এর দৃষ্টান্ত সুপ্রচুর। আসলে সেকালে লেখক এবং পাঠক উভয়েই আধুনিকতার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি ছিলেন। প্রাচীন বাঙ্‌লা সাহিত্য এবং বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি আমাদের অনুরাগ নেহাতই একালের অর্থাৎ প্রায় বিংশ শতকের ব্যাপার। কবি হিসেবে হেমচন্দ্র রীতিমত্তার প্রতি আগ্রহ কম দেখান নি। তাঁর মহাকাব্যে যেমন খণ্ডকাব্যেও তেমনি নূতনতর ছন্দোরীতি প্রকটনের দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন। অক্ষরমাত্রিক ছন্দে হ'লেও মিলবিন্যাসে এবং মিল-নিয়মিত স্তবক যোজনায় তাঁর কবিতাবলী বন্ধ-নৈপুণ্যের সাক্ষ্য বহন করে। তাঁর অন্য এক বৈশিষ্ট্য ঈশ্বর-গুপ্তীয় ব্যঙ্গাত্মক রীতিতে ছড়ার ছন্দে সাময়িক আকর্ষণীয় বিষয় নিয়ে লেখা কবিতায়। যেমন, নেভার-নেভার, বাজিমাত, হায় কি হোলো প্রভৃতি। মোটের উপর হেমচন্দ্র সুকবি ছিলেন এবং ভাষণে গদ্যধর্মী হলেও অকৃত্রিম কবিত্বের কিছু নিদর্শন অবশ্যই রেখে গেছেন।

আধুনিক বাঙ্‌লায় লিরিক্ কবিতার প্রারম্ভ ঠিক কার রচনা থেকে এ নির্ণয় করা সুসাধ্য নয়। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর

প্রথম ক্ষুদ্র কাব্য চিন্তাতরঙ্গিণীর (ইং ১৮৬১-এর গোড়ার দিকে লেখা) ভূমিকায় লিখেছেন "উথলিত অন্তঃকরণের ভাবনিকর" এতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আবার আত্মজীবনীতে নবীনচন্দ্র সেন দাবি করেছেন যে ইং ১৮৬৬-এর সময় এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতা "কোনও এক বিধবা কামিনীর প্রতি" বাঙ্‌লা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম খণ্ডকবিতা এবং "অবকাশরঞ্জিনী"র স্বদেশপ্রেম বিষয়ক তাঁর উচ্ছ্বাসগুলি প্রথম গীতিকাব্যধর্মী রচনা। তিনি মধুসূদনের চতুর্দশপদীকে গীতিকাব্য ব'লে স্বীকার করেছেন, কিন্তু তাঁর স্মৃতিতে, তখনও চতুর্দশপদী কবিতা সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়নি। আমরা জানি, ১৮৬৫তে মধুসূদনের চতুর্দশপদীগুলি ফ্রান্সে লেখা হয়, এর প্রথম কবিতা (প্রথম পাঠের "হে বঙ্গ ! ভাণ্ডারে তব") চার পাঁচ বছর আগেকার লেখা। বিহারীলালের "সংগীতশতক"কে অথবা "বন্ধুবিয়োগ"কে (১৮৬০-৬২) ধরলে তাঁর রচনাকেই প্রথম আধুনিক গীতিকবিতার মর্যাদা দিতে হয়। যাই হোক, মহাকাব্যের অধ্যায় প্রারব্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গীতি-কবিতা রচনার প্রেরণাও যে এসেছে এইটিই লক্ষণীয় বিষয়, এর ভিত্তি আমাদের জাতীয় স্বভাবের মধ্যে। কিন্তু একালের অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষার্ধের গীতিকাব্য, অন্ততঃ মধুসূদন-হেম-নবীনের রচনা যে পাশ্চাত্ত্য-প্রেরণা-সঞ্জাত তাতে সন্দেহ নেই। বিহারীলাল বরঞ্চ স্বাধীন প্রকৃতির ছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর আশ্চর্য গীতিময়তা, সূক্ষ্ম ভাবাতিরেক এঁদের অগোচরেই ছিল এবং যতক্ষণ না রবীন্দ্রের সর্বগ্রাসী প্রতিভা ইংরেজি-বাঙ্‌লা-সংস্কৃতের সূক্ষ্ম ও সৌন্দর্যময় কাব্য-ঐতিহ্য আত্মসাৎ করেছে ততক্ষণ পদাবলীর অতীন্দ্রিয়তা এবং তদুপযোগী ভাষাগ্রন্থন অবজ্ঞাতই ছিল। নবীনচন্দ্র পদাবলীর প্রেমভাবুকতার দ্বারা স্পৃষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর 'ত্রয়ী'তে যে-ভাবুকতা তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তা পশ্চিমাগত গণতান্ত্রিক। অথবা, মহাকাব্যের রচনায় যে-বিবাদী গীতিভাবুকতা তাঁকে বিপথগামী করেছিল তার মূল ইংরেজি কাব্যের মধ্যেই নিহিত।

গীতিকাব্যের প্রারম্ভ

নবীনচন্দ্র ছন্দোরীতিতে মধুসূদনের এবং প্রচলিত অক্ষরমাত্রিক পদ্ধতিরই অনুবর্তী। নূতন কোনও রীতি নিয়ে পরীক্ষা করার শখও তাঁর হয়নি, আবেগময় ভাবুকতার দিক থেকে তিনি এতই আন্তরিকতাপূর্ণ ছিলেন!

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং অক্ষয়কুমার বড়াল প্রভৃতি কয়েকজনকে বিহারীলালের অনুগামী বলা হয়েছে। বস্তুতঃ এঁরা ছন্দ বা বচনভঙ্গির দিক থেকেও নূতন কোনও রীতির প্রবর্তক নন,

অক্ষয়কুমার বড়াল

যদিও এর মধ্যে অক্ষয়কুমার বড়ালকে অনেকটা সংযত সংহত বাক্যরীতির অধিকারী রূপে দেখা যায়। এদিক থেকে তিনি নবীনচন্দ্র এবং বিহারীলালের বিপরীতধর্মা, যেহেতু জ্বালাময় আবেগ-উচ্ছ্বাসের বশীকরণই তাঁর কবিস্বভাব। অথচ তাঁর কবিতা পড়লেই মনে হয় এই ভাষা, এই সমাস-ব্যাস-যুক্ত শব্দ-গ্রন্থনই তাঁর কবিতার উপযোগী একমাত্র ভাষা—খুব ভালো গদ্যের ভাষা, যেখানে শব্দ এবং অর্থ কেউ কাউকে অতিক্রম ক'রে যেতে পারে না। 'এষা' কাব্যেই যদিচ তাঁর কাব্যসিদ্ধির সর্বোৎকৃষ্ট প্রকাশ এবং যদিও বাঙ্‌লায় বিরহের কাব্য হিসেবে 'এষা'কে অতিক্রম করতে পারে এমন সাধ্য কোনও কবিতাগ্রন্থেরই নাই, তবু 'এষা'র পূর্বেকার রচনাতেও 'জাতকবি' বড়ালের সমস্ত কবিত্বগুণই পরিস্ফুট। অক্ষয়কুমার দার্শনিক কদাপি নন, গভীর অনুভব অথচ ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের মত যথাযথ এবং পরিমিত ভাষণই তাঁকে দার্শনিকভ্রমের জন্মদাতা করেছে। আর তিনি প্রথম থেকেই নির্বিন্নতা ও বিষাদের মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন ব'লে দুঃখবাদী আখ্যায় অভিহিত হয়েছেন। ধ্রুপদী রচনারীতির অনুগামী ছিলেন ব'লে বড়াল কবি মাত্রাবৃত্ত ঢঙে কোনো কবিতা রচনা করেন নি।

এই কবি-গোষ্ঠীর মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেনের কৃতিই বিশেষভাবে উল্লেখ্য, প্রীতির দিক থেকে যেমনই হোক, রীতির দিক থেকে নিশ্চিতই। তিনি অতি সামান্যভাবে, বিষয়বস্তুতে কোথাও কোথাও মাত্র, রবীন্দ্রের কাব্যানুভব অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভঙ্গি

মধুসূদনীয় হয়েও তাঁর একান্ত নিজস্ব। নৈসর্গিক বস্তুতে মানুষের ব্যবহার আরোপ ক'রে বর্ণনা করায় তাঁর জুড়ি নেই। তাঁর বর্ণনায় personification এত অবশ্যম্ভাবী এবং এমন চমকপ্রদ যে ঠিক এই লক্ষণটি দিয়েই তাঁর কবিপ্রকৃতি চিহ্নিত করা যায়।

দেবেন্দ্রনাথ সেন

এ ছাড়া তিনি বাঙ্‌লার প্রধানতম ফুলের কবি, তাঁর পরই সত্যেন্দ্রনাথের স্থান। ভাষাভঙ্গির দিক থেকে তিনি মধুসূদন-হেম-নবীনের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন. রবীন্দ্র-সংস্পর্শে থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রের সংকেত ও ধ্বনির ঐশ্বর্য তাঁকে অভিভূত করতে পারেনি। তবু তাঁর অলংকৃত বাক্য অতিপরিচয়ের গ্লানি থেকে মুক্ত, তাঁর সৌন্দর্য-বিবৃতি প্রতিপদে বিস্ময়ের চিহ্ন বহন করে। "দ্রৌপদীর শাড়ীসম সচন্দ্রা যামিনী" "আধ গ্লাস জল যেন নিদাঘের কালে" প্রভৃতি বক্রোক্তি-ভঙ্গিমা কাব্যে তাঁর অনায়াস অথচ বিশেষ সিদ্ধিরই পরিচয় দেয়। "ভস্ম হইল চৈত্রমাস! হয়ে অনাথিনী, মুছিলা সিন্দূরবিন্দু বাসন্তী যামিনী!" প্রভৃতিতে বসন্তশেষের ও গ্রীষ্মারম্ভের যে ব্যঞ্জনাচিত্র দেওয়া হয়েছে তা অন্যকবিদুর্লভ। কবি চিত্তরঞ্জন দাশ দেবেন্দ্রনাথের প্রশস্তি উচ্চারণ করেছিলেন—"সুখভরা শান্তিভরা স্বপ্নভরা সবি', ব্যঙ্গভরা বাক্য আর রঙ্গভরা হাসি।" কিন্তু তাঁর স্বপ্ন রবীন্দ্রস্বপ্নচারণ থেকে পৃথক্ শ্রেণীর। দেবেন্দ্রনাথ সেন "রূপের পূজারী" ছিলেন, আর সে রূপ নারীর, ঋতুর, ফুলের। আর দোপাটি, ডালিমফুল, কুড়চি, অপরাজিতা তাঁকে যেমন আকর্ষণ করেছিল, গন্ধে ও সৌন্দর্যে বিখ্যাত ফুলগুলি তেমন নয়। মোটের উপর দেবেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত বাস্তব প্রেমে বিশেষতঃ দাম্পত্য প্রেমে রসিক এবং পরিচিত পরিবেশের মানবচিত্রময় বিস্ময়ের অনুরাগী।

বাঙ্‌লায় কবির সংখ্যা সহস্র, সুকবির সংখ্যা শতাধিক। রবীন্দ্র-সমকালে উনিশ শতকের শেষের দিকে যাঁদের আবির্ভাব তাঁদের অধিকাংশই রবীন্দ্র-সরণিতে পদক্ষেপ করেন নি। আমি রীতির দিক থেকে কথা বলছি। যদিও ভাবের দিক থেকেও কথাটি অনুরূপ সত্য। এঁদের অনেকেরই, এমন কি দুচারজন নারীকবিরও যদি

বিশিষ্ট ব্যক্তিস্বভাব-চিহ্নিত স্বকীয় স্টাইল রয়েছে, তবু যেহেতু কাব্য-ধারায় এঁরা উল্লেখযোগ্য কোনও সাধারণ রীতির পত্তন করেন নি, সেইহেতু আপাততঃ আমরা তাঁদের সম্বন্ধে সময়াতিপাত থেকে বিরত থাকছি। ভাষারীতিতে বিশ শতকের প্রথমের দিকে কতক পরিমাণে রবীন্দ্র-পথবর্তী মোহিতলাল, নজরুল, করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতির সমান্তরাল এক শ্রেণীর কবির পরিচয় আমরা জানি, যাঁরা বিষয়, ভাব ও ভঙ্গি তিন দিক থেকেই কিছু স্বাতন্ত্র্য নিয়ে চলার প্রয়াস করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পর এঁদের প্রকাশকৃতিত্বের সাধারণ পরিচয় দিয়ে আমরা এই আলোচনার উপসংহার করব।

কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ যখন কবিতা লেখা অভ্যাস করতে থাকেন তখন তাঁর ভাবাদর্শ নিয়ে সম্মুখে ছিলেন হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র এবং মুখ্যতঃ বিহারীলাল। এঁদের ভাষা প্রায় নিরলংকার, প্রচলিতশব্দ-নির্ভর এবং প্রসাদগুণযুক্ত। রবীন্দ্র-কৈশোরের অস্ফুট এবং গতানুগতিক ভাবনাগুলি বক্রোক্তিহীন প্রচলিত পদ্যের ভাষাতেই নিবদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথ

এর উপর ভাবাকুলতার উপযোগী ভাষার দৈন্যও একালের রচনায় কম পরিস্ফুট ছিল না। 'প্রভাত-সংগীতে' কবি যে নূতন আলোকে হৃদয়ের মুক্তি লাভ করেছিলেন সেকথা নিজে আমাদের জানিয়েছেন। প্রভাত-সংগীতের সবচেয়ে ভালো লেখা নিঃসন্দেহে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'। এর রচনামূলে কবির যে আন্তরিকতা তা প্রতি ছত্রে পরিস্ফুট। বায়রনের তুল্য আত্ম-প্রাধান্যে এবং প্রবল ও চঞ্চল আবেগে কবিতাটি আদ্যন্ত আকর্ষণীয়। কিন্তু ভাষারীতি লক্ষ্য করুন—'হেথায় হোথায় পাগলের প্রায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়' 'হেসে খলখল গেয়ে কলকল তালে তালে দিব তালি' ইত্যাদি। এতে শুধু অসংযমই নেই, অবাচকতাও আছে। ইঙ্গিতময় বাক্য এবং সংকেতময় কবিভাষা এখনও কবির দৃষ্টির বাইরেই আছে। তেমনি 'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি, জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি' সাধারণ অর্থের দিক

থেকে খুবই মহৎ হলেও একথা বলতে পারা যায় না যে কবিতা ভালো হয়েছে, অন্ততঃ কবিরবির কাছাকাছি এসেছে। ভাষার দিক থেকে বিহারীলালকে একেবারে প্রাণ-খোলা বলা যেতে পারে। ঘরোয়া কথাবার্তার শব্দকে কবিতার মধ্যে চালিয়ে দিতে বিহারীকবির জুড়ি নাই। তাঁর একালের শিষ্যের অধিক গুরু-অনুরাগের ফলেই কি নিম্নলিখিতরূপ পঙ্‌ক্তি নির্গত হয়নি—'শুনেছি আমারে ভালোই লাগে না, নাই বা লাগিল তোর···একবার তোরে দেখেছি যখন কেমনে এড়াবি মোরে···ভাঙা বাদ্যের মতন বাজিবে সাথে সাথে দিবানিশি'। কিন্তু যিনি অনন্যপরতন্ত্র ভাবের বাহক হবেন, অনন্য-সাধারণ ভাষাও তাঁকে নির্মাণ করতে হবে, অথবা ঐ ভাষাকে তাঁর লেখনীমুখে স্ফুরিত হতেই হবে।

কার্যতঃ কিছুকালের মধ্যেই কবি ভাষার আড়ষ্টতা এবং অতি-সামান্যতা অতিক্রম ক'রে যে সুনির্দিষ্ট কাব্যভাষার মধ্যে এসে পৌঁছেচেন 'কড়ি ও কোমল' তার প্রমাণ। কড়ি ও কোমলের সনেটগুলিতে বাক্য ও শব্দের গ্রন্থন এলোমেলো নয়, অবাচক এবং নিতান্ত কথ্য শব্দের মালিন্য নেই। সনেট রচনার প্রযত্নের জন্য ভাষায় এরূপ সংযম এবং সৌন্দর্যের আবির্ভাব বহুল পরিমাণে সম্ভব হতে পেরেছে। ইতিপূর্বে ব্রজবুলির মনোহারিত্বে কবি বিমুগ্ধ হলেও, সে-ভাষা এখনও তাঁর আত্মস্থ হয়নি, যেন পরবর্তী তীব্র কল্পনাময় কাব্যৈশ্বর্যের জন্য তাঁর অন্তরে রক্ষিত হচ্ছিল। 'কড়ি-ও-কোমলে'র বাক্যগ্রন্থন অনেকটা কবির মৌলিক ভাষাশক্তির নিদর্শন এবং পূর্বেকার রচনার তুলনায় কড়ি ও কোমলের ভাষাদৃষ্টে আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না। এখন থেকে কবি ক্রমশঃ বিহারীকবির শিষ্যত্ব ত্যাগ করেছেন। "কত দিবসের তুমি বিরহের ব্যথা, কত রজনীর তুমি প্রণয়ের লাজ" "যদি নিয়ে যায় ঐ শূন্য হয়ে পার আমার দুখানি পাখা কনকবরণ—হৃদয় চাতক হয়ে চাবে অশ্রুধার" "দৃষ্টি তার ফিরে এল, কোথা সে নয়ন। চুম্বন এসেছে তার কোথা সে অধর"—ইত্যাদিরূপ এই কাব্যের প্রায় সমস্ত রচনা তরুণ কবিকে বাঙ্‌লার নূতন কবি এবং

প্রথম শ্রেণীর কবি ব'লে পরিচিত করেছে। প্রসাদ এবং মাধুর্যই হ'ল এ ধরনের রচনার বৈশিষ্ট্য, আর এই দুটি গুণই বক্রতা-সমন্বিত হয়ে নানাভাবে রবীন্দ্রনাথকে শেষ পর্যন্ত অসামান্যতার পথে নিয়ে গেছে।

কড়ি- ও -কোমলের খণ্ড খণ্ড কবিতাগুলি সনেট-অনুসারী। এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, কবির প্রথম সার্থক গীতিকাব্য সনেটের বন্ধনের মধ্যেই স্ফুরিত হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এজন্য পেত্রার্ক বা অন্য কারো বিধিবদ্ধ অনুশাসন যে মান্য করেন নি, তার কারণ এ অধিকার তাঁর ছিল। কবিতাগুলির নৈপুণ্যই তার প্রমাণ। স্বল্প পরে 'সোনার তরী'তেই তিনি নির্দিষ্ট মিলের বন্ধন একেবারে অতিক্রম করেছেন এবং এর পর বন্ধন-অনুসারী রচনায় আর ফিরে যান নি। কড়ি- ও -কোমলের মহিমা কিন্তু কবির সনেট-নৈপুণ্যের জন্য নয়। সম্ভোগ-শৃঙ্গারের বিবিধ বিষয় ও ভাবকে ভাষার আশ্রয়ে কিরকম সৌন্দর্যময় ক'রে বর্ণনা করা যায় তারই মধ্যে। ঠিক এই ধরনের বিষয় নিয়ে এর পর কবিকে কচিৎ অগ্রসর হতে দেখা যায়, ফলতঃ কড়ি- ও -কোমল তাঁর ভাষাশক্তির যে প্রত্যক্ষ নিদর্শন ও প্রমাণ রেখেছে, অন্যত্র তা দুর্লভ। ঠিক এই সব বিষয় নিয়ে লেখা স্বদেশীয় ও বিদেশীয় অন্য বহু কবির রচনাতেই স্থূল বাসনা-বিক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে।

এই সনেট-পর্যায়ের পর 'মানসী'তে ভাষা বন্ধনমুক্ত হ'ল ভাব ও কল্পনার আশ্চর্য মুক্তির সঙ্গে। কবির অবরুদ্ধ আত্মভাবকুতা এতদিনে যেন মুক্তির পথ পেলে। এরই উপযুক্ত বাহন হিসেবে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রযুক্তি মানসীর কয়েকটি কবিতাকে গীতবৎ কোমল ক'রে তুলেছে। শুধু ছ'মাত্রার পর্বই নয়, পাঁচ এবং সাতমাত্রার পর যতি নিয়ে পরীক্ষামূলক গ্রন্থনও একালের। এর পূর্বে ব্রজবুলির অনুকরণে যা তিনি পেয়েছিলেন তা এতদিনে ফলপ্রসূ হ'ল। এই মাত্রাবৃত্ত ছন্দেই এক একটি স্তবকের মাঝখানের তিন চরণে পর-পর মিল যোজনার বৈচিত্র্যও 'মানসী' কালের এবং যতদূর মনে পড়ে "দুরন্ত আশা" কবিতাটিই এ ধরনের মিলযোজনার প্রথম কবিতা—

"ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি,
জীবনস্রোত আকাশে ঢালি,
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি"

এর পূর্বে এই তিন মধ্যবর্তী পঙ্‌ক্তির মধ্যে মাত্র দু'পঙ্‌ক্তিতে অন্ত্যানুপ্রাস যোজিত হয়েছে, তৃতীয় পঙ্‌ক্তিটি স্তবকের অন্যান্য দীর্ঘ পঙ্‌ক্তির মত মিলহীন হয়েই দাঁড়িয়ে আছে—

"সেই শুকতারা সেই চোখে চায়,
বাতাস কাহারে খুঁজিয়া বেড়ায়,
উষা না ফুটিতে হাসি ফুটে তার"

ঐ বিষয়ে দীর্ঘ কবিতা 'সোনার তরী'র "পুরস্কার"। এই মিলযোজনাই স্তবকের অন্যান্য চরণের ভিন্ন ধরনের মিলের মধ্যে স্থাপিত হয়ে কত সুমধুর এবং সার্থক ধ্বনিময় হয়েছে পরবর্তী রচনা—'কথা' কাব্যের "পূজারিনী" "অভিসার" প্রভৃতি তার সাক্ষ্য দেয়। মানসীর আর এক বৈশিষ্ট্য 'অমিত্রাক্ষরে'র ভিত্তিতে রচিত মিলযুক্ত প্রবহমান চরণ গ্রন্থনে। 'মেঘদূত' এবং 'অহল্যার প্রতি' এই দুটি উৎকৃষ্ট কবিতা এই ছন্দোরীতিতে লেখা। এরই অষ্টাদশাক্ষর-বৃত্তের পরিচয় পাওয়া গেল 'সোনার তরী'র 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায়। এই ছন্দোরীতির রচনায় মাধুর্যগুণের তেমন প্রকাশ নাই, প্রসাদগুণ অর্থাৎ সহজবোধ্যতার সঙ্গে ওজোগুণ অর্থাৎ বাক্যের গাঢ়বদ্ধতা—যার মধ্যে সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দের এবং যুক্তাক্ষরের আধিক্য থাকে—এমন গুণের সম্মিলন ঘটেছে।

বাঙ্‌লা, এমন কি অন্যান্য প্রাদেশিক আধুনিক ভাষায় তদ্ভব শব্দের প্রাচুর্য থাকায় এসব ভাষার প্রকৃতি স্বভাবতই কোমল হয়ে পড়েছে। ক্ষয়িত সংস্কৃত শব্দগুলি আকারে ছোট হয়েও পড়েছে। এরকম ভাষায় উদাত্তভাব প্রকাশ করা যায় না ব'লেই মধুসূদনকে সংঘাতময় তৎসম শব্দের এবং দীর্ঘ বাক্যের গঠন করতে হয়েছিল। এই জাতীয় রচনায় মধুসূদন এবং ভিন্ন দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রও

রবীন্দ্রনাথের পথপ্রদর্শক। একালের অতিকোমল রচনার নমুনা হ'ল 'শুধু আমারি জীবন মরিল ঝুরিয়া চিরজীবনের তিয়াসে' 'খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে নীরবে চোখে চোখে চায়' 'কমলফুল-বিমল শেজখানি নিলীন তাহে কোমল তনুলতা' প্রভৃতি। পরবর্তী কালে যখন সংস্কৃত শব্দ এবং অনুপ্রাসের উপর কবির অনুরাগ জন্মেছে তখন অতিকোমলতা এবং বাহ্য শ্রুতিসুখকরতাকে অতিক্রম ক'রে ধীরে ধীরে একটি অচপল মাধুর্য তাঁর কবিতায় বিস্তৃত হয়েছে এবং কারুশিল্পের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় সম্ভব করেছে।

রবীন্দ্র কাব্যসমুদ্রে স্বদেশীয় বিদেশীয় নানান্ ভাবধারা যেমন মিলিত হয়ে একটি সামঞ্জস্যময় একত্ব লাভ করেছে, তেমনি নানান্ স্টাইল মিশ্রিত হয়ে রবীন্দ্র-কাব্যরীতি গ'ড়ে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভাই এসবের ধারক এবং রক্ষক হয়েছে। মৌলিকশক্তি-সম্পন্ন না হ'লে কবি এমনভাবে স্বীকরণ করতে পারতেন না। এরকম মিলন-মিশ্রণের যথাযথ কালনির্ণয় সম্ভব না হ'লেও মোটামুটি একথা বলা যায় যে, মানসী-সোনারতরী-চিত্রা পর্বে উত্তম গীতিকাব্যের স্ফুরণক্ষণে পদাবলীর ভাষারীতি, কল্পনা-কথা-ক্ষণিকা-নৈবেদ্য পর্যায়ে সংস্কৃতের, এবং খেয়া থেকে আরম্ভ ক'রে বাউল-সংগীতের মর্মানুভবময় সহজ অথচ এক বিশেষ ঢঙের বাক্‌রীতির মিশ্রণ। এই রীতির প্রভাব 'গীতালি' 'ফাল্গুনী' রচনা পর্যন্ত চলেছে, বলাকার 'সবুজের অভিযানে'ও এর প্রত্যক্ষ স্পর্শ পাওয়া যাচ্ছে। তারপর কিছুকালের জন্য এই ত্রিবিধ রীতির মিশ্রণে এবং সংস্কৃতরীতির প্রাধান্যে মহুয়ার কাল পর্যন্ত লেখা কবিতায় কবির প্রকাশের প্রৌঢ়ত্ব দেখা গিয়েছে। পুনশ্চ, খাপছাড়া, প্রহাসিনী প্রভৃতি লেখায় ইংরেজি বাক্‌রীতির পরিচয় পাচ্ছি, যেমন পাচ্ছি একালের লেখা ছোটগল্পগুলিতে। গদ্যচ্ছন্দে রচনার সঙ্গে ইংরেজি বাক্যরীতির আবির্ভাব যেন মিলে মিলে যায়। কবির রচনারীতির মধ্যে এই পরিবর্তনের ধারাগুলি রবীন্দ্র-কাব্যের যে-কোন অনুরাগী পাঠকই ধরতে পারবেন।

রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রাসময়, ব্যঞ্জনধ্বনির কুশল প্রয়োগে মধুর ও

গম্ভীর সংস্কৃত শব্দবিন্যাসের পরীক্ষণ এবং সার্থকতা প্রভৃতি সম্বন্ধে গ্রন্থান্তরে কিছু বলা গেছে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, বহিরঙ্গ যে-শব্দ এবং যে-বাক্‌রীতিই কবিকে মুগ্ধ করুক না কেন, লৌকিক বাঙ্‌লার, মাতৃভাষার বিশেষ গুণ ও ধর্মের ভিত্তিতেই তা প্রতিষ্ঠিত। ইংরেজি বাক্‌রীতি তাঁর গদ্যকে যে-পরিমাণ প্রভাবিত ক'রে তুলেছে, কবিতাকে সে-পরিমাণ করেনি। **রবীন্দ্রনাথ বাইরের যে-কোন বিষয়ই গ্রহণ করুন না কেন বাঙ্‌লা বাক্যগ্রন্থন এবং সিদ্ধ প্রয়োগের মূলনীতি তিনি ক্বচিৎ লঙ্ঘন করেছেন** এবং সব মিলিয়ে মাতৃভাষার প্রকাশশক্তিকেই বাড়িয়ে তুলেছেন অসামান্যরূপে। আমি 'সঞ্চয়িতা' থেকে তাঁর কাব্যোন্মেষের সময়কার কয়েকটি বাক্যাংশ উদ্ধার করছি, যা থেকে বোঝা যাবে কাব্যনির্মাণে প্রচলিত বাঙ্‌লার সম্পদই তাঁকে মুখ্যভাবে চালিত করেছে—'বেলা যে পড়ে এল, জল্‌কে চল্‌' 'পথ চেয়ে আছে যাহারা' 'ঘরে যারা আছে পাষাণে পরান বাঁধিয়া' 'যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে' 'আঁখিতে বাঁশিতে যে কথা ভাষিতে' 'কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ' 'বিশ্ব তোমা-পানে চেয়ে কথা নাহি কয়' 'বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে' 'আমার প্রাণ তোমারে সঁপিলাম' 'বাক্য যবে বাহিরায় না থাকে সন্দেহ' 'খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর' 'আঁখি কচালিয়া দেখে এ নহে স্বপন' 'ঝাঁ ঝাঁ করে চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম' 'দুটি অন্ন মুখে না তুলিতে' 'চুম্বন মাগিব যবে···ফিরায়ো না মুখ' 'যদি আমাদের দোঁহে হয় চোখাচোখি' 'তর্ক তারে পরিহাসে, মর্ম তারে সত্য বলি জানে' 'যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে' 'গাহিবে একজন খুলিয়া গলা' 'অন্ন জোটে না, কথা জোটে মেলা' 'বসিয়া থাকিতে চাও আপনা ভুলে' 'তোমার স্তন-অমৃত-পিপাসা মুখেতে রয়েছে লাগি; তোমার আনন এখনো জাগায় চোখে' 'বলো কোন্ পার ভিড়িবে তোমার' 'জান না কি প্রেম অন্তর্যামী' 'পরিবার তায় সাথে যেতে চায় বুঝায়ে বলিনু তারে' 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান' ইত্যাদি।

এরকম উদাহরণ প্রতি ছত্রে। এ আধুনিক কালের বা কোনো বিশেষ ঢঙের বাঙ্‌লা নয়। চণ্ডীদাস-কৃত্তিবাস-মুকুন্দ-ভারতচন্দ্র ব্যবহৃত চিরন্তন কালের বাঙ্‌লা। এই ভাষাতেই সহস্রাধিক বৎসর ধ'রে আমাদের লোকব্যবহার, আমাদের হৃদয়ের ভাঙাগড়া চলছে। বিশেষভাবে ভাষার অনুরাগী পাঠক দেখবেন যে রবীন্দ্র-কাব্যভাষায় মধ্যযুগ ও আধুনিকের, ভাগীরথীতীর ছাড়া প্রত্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ উপভাষারও শব্দরূপ, ক্রিয়াপদ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। মোট কথা, আমরা পূর্বে যা বলেছি এখন তার পুনরুক্তি করছি—রবীন্দ্রনাথ মহাকবি ব'লেই তাঁর মধ্যে তৎসম, তদ্ভব, গ্রাম্য, দেশীয়, বিদেশী, আমাদের ব্যবহার্য যাবতীয় শব্দ এবং বাক্যরীতি নানাভাবে আশ্রয় লাভ করেছে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, তিনি তাঁর পরবর্তী অনুজ কবিদের—সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, নজরুল, করুণানিধানের মত ফারসি শব্দের বহুল ব্যবহার করেন নি। প্রসঙ্গ-প্রয়োজনে যেখানে অনায়াসে এসেছে, মাত্র সেখানে বিদেশী শব্দ ব্যবহার করেছেন। তৎসম শব্দ আহরণের বেলায় অথবা সমাসবদ্ধ দীর্ঘ শব্দের প্রয়োগেও কবি প্রসাদগুণকে কুত্রাপি অবহেলা করেন নি। এইভাবে কোমল এবং কঠোর, তৎসম ও লৌকিক ভাষার স্বচ্ছন্দ মিশ্রণে তিনি যে অভিনব কাব্যরীতি গড়ে তুললেন তার ফলে তাঁর সমকাল থেকে আজ পর্যন্ত বহু কবি প্রথম শ্রেণীর কবিতা লিখতে সক্ষম হয়েছেন। সম্প্রতি যাঁরা রবীন্দ্র-পন্থা উল্লঙ্ঘনের সাহসিকতা দেখিয়েছেন, তাঁদের আয়াস সাধারণ্যে অভিনন্দিত হয়নি। প্রশ্ন হ'তে পারে, রাবীন্দ্রিকতা কি তাহ'লে চিরকাল চলতে থাকবে? এর উত্তরে বলা যায় যে, কোনো-একটি বিশিষ্ট ধারা ও রীতি যতই সর্বজনীন এবং শক্তিশালী হোক না কেন, তা চিরস্থায়ী নয়। মানুষের জীবনের রীতির মতই তা পরিবর্তনশীল। আধুনিকের যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লিরিক কবিতায় নিঃশেষে প্রকাশমান, সে ব্যক্তি-প্রাধান্যের প্রবণতা যদি মানুষের মন থেকে মুছে যায়, ব্যক্তির জায়গায় যদি সম্প্রদায় বা সমাজ বড় হয়ে ওঠে তাহ'লে হয়ত নূতন

রীতির অনায়াস অভ্যুদয় ঘটবে। ভিন্ন গুরুতর কারণেও ঘটতে পারে। কিন্তু সে সব চিহ্ন এখন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বুদ্ধি এবং মতের দ্বন্দ্ব, স্বার্থসিদ্ধির উগ্রতা আর সেই সঙ্গে অহংবাদী 'ইজ্‌মে'র প্রতাপ ক্ষীণ হয়ে পড়বারও কোনও কারণ বর্তমানে নেই। রবীন্দ্রকাব্য বাঙ্‌লার ঠিক অশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিতের জন্য নির্মিত না হ'লেও এর বিষয়ে এবং ভাষাভঙ্গিতে যেটুকু উদারতা এবং সর্বজনীনতার স্পর্শ রয়েছে মতবাদের আওতায় তা থাকছে না মনে হচ্ছে। তবু একথা স্বীকার না করলেই নয় যে, রবীন্দ্রনাথ পূর্বতন কাব্যরীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে যে নূতন রীতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করালেন যে-কোনও উত্তম কবির তা-ই অবলম্বন হবে এখনও বহুদিন পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় কল্পনা অনুসারে তাঁর শতবর্ষ পরে প্রায় ঐরকম শক্তিশালী নূতন কবি জন্মাচ্ছেন কিনা সন্দেহ। মেহনতী মানুষের জীবনকথা নিয়ে কোনও উত্তম কবির আবির্ভাব যদি ঘ'টে থাকে তাঁকে নির্ভর করতে হবে ঐ লৌকিক বাঙ্‌লার বিশেষ শক্তির উপর—যার আধুনিক প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দঃপ্রসঙ্গ। এ বিষয়ে প্রথমে যে কথাটি স্মরণ করা কর্তব্য তা হ'ল এই যে একমাত্র গদ্যচ্ছন্দ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ বাঙলা ছন্দে কোনও নূতন রীতির প্রবর্তক নন। অক্ষরমাত্রিক, মাত্রাবৃত্ত এবং শ্বাসমাত্রিক পদ্ধতির মধ্যেই তিনি কলাকুশলতাময় বৈচিত্র্য এনেছেন। সে-বৈচিত্র্য স্তবকনির্মাণে, মিলযোজনায়, চরণ-বিন্যাসে। এ ছাড়া বলা যেতে পারে যে: **অক্ষরমাত্রিক** রীতিতে তিনি (১) ৮+১০ মাত্রার ও অক্ষরের চরণবিন্যাস করেছেন, (২) 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দের মধ্যে মিলযোজনা ক'রে এবং মোটামুটি জোড় মাত্রার পর ছেদবিন্যাস ক'রে স্বকীয় একটি পদ্ধতি গঠন করেছেন, (৩) এই রীতিটিকেই বিস্তৃত ক'রে চরণগুলিকে ভাবানুযায়ী প্রসারিত এবং সংকুচিত ক'রে, এমন কি একটি পর্বাঙ্গেও একটি চরণ গঠন ক'রে 'বলাকা'র কয়েকটি প্রসিদ্ধ কবিতা রচনা করেছেন। ভাবের অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা অবলম্বন করার জন্য দু'-একটি জায়গায় চরণান্ত

মিল এতে রক্ষিত হয়নি। 'বলাকা'র পূর্বে এবং পরে আঠারো মাত্রার প্রথম চরণ, ছ মাত্রার দ্বিতীয় চরণ এবং ঐ ক্ষুদ্র চরণের শেষে অর্থাৎ দ্বিতীয়-চতুর্থ, ষষ্ঠ-অষ্টম ইত্যাদিতে মিলবিন্যাস নিয়মিত ক'রে কিছু কবিতা লিখেছেন, যেমন, বর্ষশেষ, বসন্ত, আহ্বান, সাবিত্রী প্রভৃতি। সেগুলির চরণবিন্যাস এবং মিলযোজনা আদ্যন্ত একটি রূপকল্প অনুসারে। বলাকায় তেমন নয়। তা ছাড়া, বলাকায় মিল প্রথম-দ্বিতীয়, তৃতীয়-চতুর্থ ইত্যাদিরূপ এই পার্থক্য। (৪) এই জাতীয় ছন্দে ত্রিপদী, চতুষ্পদী, ষট্পদী, অষ্টপদী প্রভৃতি যাবতীয় পূর্বেকার বৈচিত্র্য তিনি রক্ষা করেছেন। যদিও মিলবিন্যাস তিনি নিজের স্বাচ্ছন্দ্য অনুসারে করেছেন। **মাত্রাবৃত্তে** তিনি (১) ছ'মাত্রার পর যতি স্থাপনে অধিকতর আগ্রহশীল হ'লেও আট, সাত ও পাঁচ মাত্রার পর যতিপাতেও উচ্চাঙ্গের সাবলীলতা প্রদর্শন করেছেন, (২) এই ছন্দে রচিত কয়েকটি গীতে (দেশ দেশ নন্দিত করি, জনগণমন-অধি প্রভৃতি) অপভ্রংশের মতই সর্বত্র আ, ঈ, উ প্রভৃতি মৌলিক স্বরেরও দীর্ঘীকরণ করেছেন। একান্তভাবে ভাষাকুশল বলেই তিনি সার্থকভাবে এটি করতে পেরেছেন। (৩) অক্ষরমাত্রিকের মত মাত্রা-বৃত্তেও তিনি স্তবক নির্মাণের এবং স্তবক-মধ্যবর্তী অন্ত্যানুপ্রাস যোজনার বৈচিত্র্য প্রদর্শন করেছেন। মধ্যবর্তী দুই অথবা তিন চরণে একই প্রকার মিল ও স্তবকের দ্বিতীয়, চতুর্থ, অষ্টম অক্ষরে ভিন্ন মিল দেওয়া হয়েছে এরকম কবিতা বহু রয়েছে। (৪) এই মাত্রাবৃত্তেই তাঁর কলাবিলাস-নৈপুণ্যের চরমতা দেখা গিয়েছে, মাধুর্যময় সামঞ্জস্য-পূর্ণ অনুপ্রাসের ব্যবহারে পরবর্তী বহু কবির তিনি অনুকরণীয় হয়েছেন। পর্বে-পর্বে এমনকি পর্বাঙ্গে-পর্বাঙ্গেও প্রত্যাশিত স্থানে যৌগিক অক্ষরের ব্যবহার তাঁর এরকম কলানৈপুণ্যের উদাহরণ, যেমন, "পূর্ণিমা : চন্দ্রের | জ্যোৎস্নাধা : রায় ॥ সন্ধ্যাব : সুন্ধরা | তন্দ্রাহা : রায়" "সন্ন্যাসী উপ : গুপ্ত" "উড়ে কুন্তল | উড়ে অঞ্চল ॥ উড়ে বনমালা | বায়ু-চঞ্চল ॥" "কোথা হা হন্ত | চির বসন্ত" "নৃত্যের বশে | সুন্দর হ'ল | বিদ্রোহী পর | মাণু ॥ পদযুগ ঘিরে | জ্যোতি-

মঞ্জীরে | বাজিল চন্দ্র | ভানু ॥" ইত্যাদি। বৈষ্ণব পদাবলীর এই ধরনের চারুতার কথা আমরা পূর্বে ব্যক্ত করেছি, তবুও একথা স্বীকার করতেই হয় যে, এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ জয়দেবের মতই দুরতিক্রম্য। **শ্বাসমাত্রিক ছন্দে** বৈচিত্র্য এবং কারুকুশলতার অবসর সংকীর্ণ হলেও, বাঙ্‌লা ভাষায় এ জাতীয়ের যাবতীয় কুশলতার তিনিই একমাত্র অধিকারী। এতেও (১) মাত্রাবৃত্তের মত স্তবকনির্মাণ ও মিল-যোজনার বৈচিত্র্য, (২) বলাকার মত চরণবিন্যাসের স্বাধীনতা, যেমন 'পলাতকা' কাব্যে, (৩) চরণের শেষ পর্বটি অপূর্ণ রাখারই তিনি পক্ষপাতী।

রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সেখানে যে দু'একটি দৃষ্টান্তে আমরা তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারিনি তা হ'ল অক্ষরমাত্রিক এবং মাত্রাবৃত্তে চারমাত্রায় পূর্ণযতির নির্দেশ। তাঁর চিত্ত সংগীতমুখী ছিল ব'লে যে-কোনও তালপাতেই তিনি পূর্ণযতি কল্পনা করেছেন। আমরা তালপাতের সঙ্গে যতিপাতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক জেনেও কোনও তালপাতে অর্ধযতি, কোনও তালপাতে পূর্ণযতি চিন্তা করি। একটি যৌগিক অক্ষরে যদি একটি শব্দ হয় (যেমন, ঐ, দিক্, জল্) তাকে অক্ষরমাত্রিক রীতিতে, সমাসবদ্ধ অবস্থায় থাকলেও, রবীন্দ্রনাথ কখনও কখনও দু'মাত্রার ব'লে গ্রহণ করেছেন। এ অধিকার সকলেরই আছে ব'লে মনে করি। আবার কিন্তু দু-একটি ক্ষেত্রে আমাদের ছন্দোরীতি অনুধাবনের ত্রুটির জন্য কবিকে আমরা অনিয়ত ব'লে অভিহিত করেছি। যেমন, 'আমাদের ছোট নদী' প্রভৃতি মাত্রাবৃত্তে রচিত কবিতাটিকে 'পয়ার' মনে ক'রে 'বৈশাখ মাসে তার' ইত্যাদির—'বৈ' অক্ষরটিকে জোর ক'রে দু'মাত্রার ব'লে মনে করেছি। রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে বাঙ্‌লা কবিতার অথবা বাঙ্‌লা হরফে সংস্কৃত ছন্দের প্রবর্তন করতে যান নি, যাঁরা এর পূর্বে করেছিলেন বা প্রত্যক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি যাঁরা চেষ্টা করছিলেন তাঁদের পণ্ডশ্রমের বিষয় তাঁর জানাই ছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যচ্ছন্দ সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু

তিনি এর মূল ভাবটি নানাভাবে বিস্তৃত ক'রে ব্যাপারটি যে বাঙ্‌লায় অসার্থক হবে না, মাত্র তা-ই বোঝাতে চেয়েছেন, কোন্‌খানে এর ছন্দোময়তা তা দেখিয়ে দেননি। আমরা বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছি যে (১) এর অন্তর্বর্তী রীদ্‌ম্‌ অর্থের প্রবাহ অনুযায়ী। তিন চার পাঁচ পঙ্‌ক্তিতে যে অর্থবিভাগ শেষ হচ্ছে তা-ই বিভিন্ন আকারের চরণে বিন্যস্ত হয়ে একটি সুরসংগতি রক্ষা করছে, যেমন করছে 'ফ্রী-ভারস্‌'-এ ক্যাডেন্‌স্‌। (২) এর চরণের মধ্যবর্তী বা অন্ত্য যতিপাত কোনও রূপকল্প অনুসরণ করছে না, যেমন করছে সাধারণ অক্ষরমাত্রিক রীতিতে ৬, ৮, ১০,-এর নানাভাবে ব্যবহার। (আমরা গ্রন্থান্তরে নির্দেশ করেছি যে) এতে তিন থেকে চোদ্দ অক্ষর ও মাত্রার সম-বিষম পর্ব পঙ্‌ক্তিগুলিতে নানাভাবে স্থান পেতে পারে—যার ধারক এবং সামঞ্জস্যের রক্ষক ঐ অর্থনির্ভর সুরপ্রবাহ। আমরা মনে করি, আমাদের উচ্চারিত গদ্যের মধ্যেও ভাবের জোয়ার এলে কখনও সুরের স্পর্শ লাগে। ঐ বিশেষ গদ্যের সুরই বিশিষ্টতর ভাবে গদ্যচ্ছন্দের জন্ম দিয়েছে। ফলে, **ভালো গদ্য যিনি না লিখতে পারেন তিনি গদ্যচ্ছন্দে কবিতা লিখতে পারবেন না।** রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী সার্থক ও অসার্থক গদ্যচ্ছন্দ রচয়িতাদের রচনার তুলনা করলেই ব্যাপারটি ধরা পড়বে। মিলহীন চরণশ্রেণীর মধ্যে যদি মাত্রাবৃত্তের চাল থাকে তাকে গদ্যচ্ছন্দ বলব না। আমাদের বা রবীন্দ্র-প্রবর্তিত গদ্যচ্ছন্দের দৃষ্টান্ত বিদেশী, কিন্তু স্বরূপটি দেশীয়। ক্রিয়াপদকে প্রায়শঃ বাক্যমধ্যবর্তী ক'রে রূপকথা-জাতীয় গদ্যের রচনাই এর নির্মাণের মূলে। সংস্কৃত গদ্যের আদর্শ বহিরঙ্গ দৃষ্টান্ত হিসাবে কিছু পরিমাণে কাজ ক'রে থাকতে পারে।

রবীন্দ্র-নির্মিত এবং তদনুসরণে অন্যান্য কবির গ্রথিত বাঙ্‌লা গদ্যচ্ছন্দের প্রকৃতি এবং তার আশ্রয়ে উপস্থাপিত কাব্যস্বরূপ আমরা দেখেছি। এই রীতির বিদেশী কবিতার সঙ্গেও আমাদের কিছু কিছু পরিচয় ঘটেছে। আমরা তুলনা ক'রে দেখেছি, যদিও গদ্যচ্ছন্দে উত্তম কবিতা রচিত হয়েছে তবু বিশিষ্ট ছন্দোবন্ধের কবিতায় যে

পরমাশ্চর্যের সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি, যেমন, মিলটন্‌ শেক্‌স্‌পীয়রের রচনায় স্থানে স্থানে, কীট্‌স্‌ শেলি বায়রন্‌ গ্রে-র কবিতায়,—সেই উচ্চতম সৌন্দর্যের প্রকাশ ফ্রী-ভার্‌স্‌ রচয়িতাদের রচনায় আজ পর্যন্ত দেখা যায় নি। রবীন্দ্রনাথের কথাই ধরা যাক। তাঁর গদ্যচ্ছন্দের রচনার কতকগুলি ভালো কবিতা রয়েছে শেষ সপ্তকে। এছাড়া বিপ্লব, কি পৃথিবী-প্রণাম এও ভালো কবিতা নিঃসন্দেহে। কিন্তু তাঁর লেখা নিরুদ্দেশ যাত্রা, এবার ফিরাও মোরে, উর্বশী, নববর্ষা, স্বপ্ন, শাজাহান, বলাকা প্রভৃতির মত কবিতা তিনি গদ্যচ্ছন্দে বিন্যস্ত করতে পেরেছেন কি? বহু পাশ্চাত্ত্য কাব্য সমীক্ষকের মত আমাদেরও মনে হয়, মনের নিগূঢ়তম অনুভূতি এবং কল্পনার ঐশ্বর্যের সঙ্গে ছন্দোবন্ধনের একটা অনিবার্য যোগ কোথায় যেন রয়েছে। গদ্যচ্ছন্দে উত্তম কবিতা লেখা যেতে পারে, কিন্তু উচ্চতম সৌন্দর্যের প্রকাশ কৌশলময় বাণীভঙ্গি এবং নিয়মিত বন্ধনযুক্ত ছন্দের উপরই নির্ভরশীল।

রবীন্দ্রানুজ কবিগোষ্ঠীর মুখ্য হলেন সত্যেন্দ্রনাথ, যিনি রবীন্দ্র-ভাব-নির্ঝরিণীতে অবগাহন ক'রেও ভাবনা এবং ভাষা দুদিক থেকেই অল্পবিস্তর স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রয়াস করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ ক্লাসিক্যাল কবি নন, একালে ক্লাসিক্যাল কবির আবির্ভাব সম্ভব নয়। তবে উগ্রভাবে রীতিনিষ্ঠ হওয়ায়, ভাব অপেক্ষা বস্তুগত সৌন্দর্যের দিকে নিবিষ্ট-দৃষ্টি হওয়ায় এবং মার্জন-ঘর্ষণ-আহরণ ক'রে ধ্বন্যাত্মক শব্দগ্রন্থনে মনোনিবেশ করায় তাঁর কাব্যে আপাত-ক্লাসিক্যাল একটা ভঙ্গিমা দেখা যায়, যার ফলে তিনি নব্যরীতির কবি ব'লে চিহ্নিত হয়েছেন, পরবর্তী কবিদের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহের আধার হয়েছেন, আর কোনও কোনও মহলে রবীন্দ্রনাথের মতই কুশল এবং শক্তিমান্‌ কবি ব'লে ধারণা জন্মিয়েছেন। তাঁর চমকপ্রদ শব্দপ্রয়োগ ও ছন্দের ক্রীড়ায় মুগ্ধ সাধারণ পাঠক ইন্দ্রজাল-মুগ্ধবৎ তাঁকে শুধু ছন্দঃসরস্বতী নয়, কাব্যসরস্বতী ব'লেও বরণ করেছে।

সত্যেন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে কাব্য-কসরতে মনোযোগ দিয়েছিলেন

এবং স্বদেশী ও বিদেশী শব্দকে যথেচ্ছভাবে পরিবর্তিত ক'রে শুধু ছন্দ এবং অর্থের সৌকর্য বিধান করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। বেদ, পুরাণ, ইতিহাস এবং লোকবৃত্তান্ত থেকে অগণিত উল্লেখের সমাহরণ

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ক'রে শুধু বক্তব্যেরই গৌরব স্থাপন করতে গিয়ে কবিতাকে দুরূহ এবং বিরক্তিকর ক'রেও তুলেছিলেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাঁর একটি সবিশেষ কবিদৃষ্টি ছিল এবং সেটি উপলব্ধি ক'রে তবেই তাঁর কবিকৃতির নিঃশেষ বিচার সম্ভব। দুঃখের বিষয় তাঁর এই উল্লেখযোগ্য কবি-বৈশিষ্ট্য আধুনিক কোনও কোনও বিচারকের দৃষ্টির বহির্ভূত হয়েছে। এই বিশেষ দিকটি হ'ল তাঁর রূপাভিনিবেশ। তিনি একান্তভাবে রূপের সন্ধানী ছিলেন। এই নিসর্গ বাঙ্‌লায়, পল্লীর আলোছায়ায় একটি স্বকীয় রূপকথার রাজ্য গ'ড়ে তুলে তার আস্বাদ আমাদের যথাসাধ্য দেওয়ার সংকল্পেই তাঁর ভাষাভূমিকর্ষণ, এমন কথা বললে খুব অসংগত হয় না। রূপের সন্ধানবশেই তিনি লক্ষ্য করেছেন কোথায় ধূপছায়া রঙের সঞ্চার ঘটছে, কোথায় কাঁচপোকার টিপের দীপ্তি প্রকাশ পাচ্ছে, কোথায় মেঘের কোলে আলতাপাটি শীমের আভাস লেগেছে। গোখ্‌রী, চুম্‌কি, কল্‌কা, পান্না, ভেলা (ভল্লাতক), আশমানী নীল, জলঙ্গা নীল, ওড়না, ঘাঘরা, খুঞ্চীপোষ, দোব্‌জা, জলচুড়ি, জাফরান, পাঁয়জোর— ইত্যাদি বস্তুবিন্যাস সবই রূপগত সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য। বস্তুতঃ যেখানে যেখানে তিনি রূপের দৃষ্টিতে নিসর্গকে দেখেছেন সেখানেই পরিচিতের মধ্যে অপরিচিত সুন্দর আমাদের চমক লাগিয়ে দিয়েছে। কিশোরী, নীলপরী, দূরের পাল্লা, সিন্ধুতাণ্ডব, বর্ষা প্রভৃতি কবিতার কতকগুলি চিত্রনির্মাণ যথার্থই মুগ্ধ করবার মত। এ ছাড়া ভাবুকতাময় ভালো রচনাও তাঁর কিছু আছে, যেমন, চম্পা, পুষ্পের নিবেদন, বর্ষবিদায়, ছিন্ন-মুকুল প্রভৃতি। 'কাব্যসঞ্চয়নে' তাঁর সব ভালো কবিতা স্থান পায় নি। তবে তাঁর নিছক সংবাদময়, গৌরবোক্তি-প্রধান এবং উল্লেখ-কণ্টকিত সাময়িক কবিতার সংখ্যা এত বেশি, আর সেগুলির হট্টগোল এত তীব্র যে, আন্তরিকতাপূর্ণ নিসর্গপ্রীতির অথবা রূপানুস্মৃতির আহ্বান পাঠকের কানে না পৌঁছাবারই কথা। রবীন্দ্র আবহাওয়ার মধ্যে পালিত হয়ে নব্যরীতির জন্য আগ্রহ হয়ত তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, এইজন্যেই কথ্য, অপ্রচলিত, গ্রাম্য শব্দকে

তাঁর লেখায় তিনি যত্রতত্র স্থান দিতে দ্বিধা করেন নি।

সাধারণ্যে সত্যেন্দ্রনাথের খ্যাতি তাঁর ছান্দসিকতার জন্যে। তিনি যদিও প্রচলিত তিন রীতিতেই প্রচুর কবিতা লিখেছেন এবং স্তবক-নির্মাণ ও মিলযোজনায় অন্য বহু কবির মতই বৈচিত্র্য রক্ষা করেছেন, তাঁর যেখানে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় তা হ'ল ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরগুলির মাত্রাবৃত্তে এবং শ্বাসমাত্রিকে যথেষ্ট ব্যবহার। আমাদের ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরগুলি মাত্রাবৃত্তে নিয়ত দ্বিমাত্রিক, শ্বাসাঘাতে নয়। শ্বাসাঘাতের প্রয়োগে সত্যেন্দ্রনাথ এগুলিকে যে দ্বিমাত্রিকই ধরেছেন এমনও নয়, কিন্তু শব্দমধ্যে এবং প্রারম্ভে ঐভাবেই দ্বিমাত্রিকের ব্যবহার করেছেন, ফলে প্রচুর তৎসম শব্দকেও এই রীতিতে স্বচ্ছন্দে স্থান দিয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ যথার্থভাবে লক্ষ্য করেছিলেন যে, বাঙ্‌লা মাত্রাবৃত্তে আ, ঈ, ঊ কে প্রায়শই দীর্ঘ করে উচ্চারণ করায় শ্রুতিতে অস্বাভাবিক লাগে ও পীড়াদায়ক হয়। এর জায়গায় ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারণ বেশি থাকে এমন এক, দুই, তিন অক্ষরের শব্দ ব্যবহার করলে দীর্ঘমাত্রার প্রয়োজন নির্বাহ হতে পারে। আর রূপধ্বনিময় কবিতায় এরকম দীর্ঘের প্রয়োজনও বেশি, গাম্ভীর্য মাধুর্য রক্ষার জন্য। ফলে তাঁর নিসর্গবর্ণনমূলক মাত্রাবৃত্তের কবিতাগুলি ধ্বনিময় হয়ে উঠেছে। কিন্তু এইভাবে মাত্রাবৃত্তে ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরের বেশি প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রে শ্বাসমাত্রিক ছন্দঃপ্রয়োগের ভ্রান্তিও জন্মিয়েছে, যেমন, 'ঝর্না, ঝর্না, সুন্দরী ঝর্না' 'মেঘ্‌লা থম্‌থম্ সূর্য ইন্দু' 'অশ্রুর মৌক্তিক, হাস্যের স্ফূর্তি' 'ছিপ্‌খান তিন দাঁড় তিনজন মাল্লা' প্রভৃতি। আসলে এগুলি খাঁটি মাত্রাবৃত্তের এবং এগুলির ছন্দোলিপি হবে—

॥ ॥ ॥ ॥ ঝর্‌ না : ঝর্‌ না	॥ ০০ ॥ ০ সুন্‌দরী : ঝর্‌ না
০০০০ ॥ ০ ০ তরলিত : চন্‌দ্রিকা	॥ ০০ ॥ ০ চন্‌দন : বর্‌ণা
॥ ০ ০ ॥ ০ ০ অন্‌চল : সিন্‌চিত	॥ ০ ০ ॥ ০ গৈরিকে : স্বর্‌ণে
০ ০ ॥ ০ ০ ০ ০ ॥ গিরিমল্ : লিকা দোলে	॥ ০০ ॥ ০ কুন্‌তল : কর্‌ণে
॥ ॥ ॥ ॥ মেঘ্‌লা : থম্ থম্	॥ ॥ ॥ ॥ সূর্‌য ইন্‌দু

॥ ॥ ॥ ॥ | ॥ ॥ ॥ ॥
ডুব্‌ল : বাদ্‌ লায়্‌ | দুল্‌ল : সিন্‌ধু

(এখানে মৌলিক স্বরান্ত অক্ষরেরও কৃত্রিম দীর্ঘীকরণ করা হয়েছে, যার ফলে প্রতিটি অক্ষরই দু'মাত্রার হয়ে দাঁড়িয়েছে।)

॥ ॥ ॥ ॥ | ॥ ॥ ॥ ○
অশ্‌ শ্রুর্‌ : মৌক্‌তিক্‌ | হাস্‌স্যের্‌ : স্ফুর্‌তি

○ ○ ॥ ○ ○ ॥ | ॥ ॥ ॥ ○
লহরের্‌ : লীলা ঠিক্‌ | লাস্‌স্যের্‌ : মূর্‌তি

॥ ॥ ॥ ॥ | ॥ ॥ ॥ ○
ছিপ্‌ খান্‌ : তিন্‌ দাঁড় | তিন্‌ জন্‌ : মাল্‌লা

॥ ॥ ॥ ॥ | ॥ ॥ ॥ ○
চৌপর : দিন্‌ ভর্‌ | দেয় দূর : পাল্‌লা

শেষোক্ত 'দূরের পাল্লা' কবিতায় পরে ছড়ার ছন্দও প্রযুক্ত হয়েছে। লক্ষণীয় এই যে, এই ধরনের প্রায় প্রতিটি অক্ষরকে ব্যঞ্জনান্ত ধরা এবং প্রতি অক্ষরের দীর্ঘীকরণের দ্বারা খুব ব্যাপক কাব্যরীতি গড়ে তোলা যায় না। স্থানে স্থানে এই রীতির কৃত্রিম দোলা চমকপ্রদ হয় বটে, কিন্তু স্বাভাবিক উচ্চারণপ্রবণতার বিরোধী ব'লে স্নায়ু বেশিক্ষণ এই কৃত্রিমতা সহ্য করতে পারে না।

সত্যেন্দ্রনাথ ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরের শক্তির চূড়ান্ত পরীক্ষা আর এক দিক থেকে করেছেন। সে হ'ল সংস্কৃত ছন্দের অনুবর্তনে। বাঙ্‌লায় গোটাগুটি সংস্কৃত ছন্দের প্রবর্তন এর পূর্বে অনেকেই করতে চেয়েছিলেন, সবচেয়ে ব্যাপকভাবে চেয়েছিলেন ভুবনমোহন রায়-চৌধুরী, বলদেব পালিত, অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। সত্যেন্দ্রনাথ দেখেছিলেন যে, ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরকে বাঙ্‌লায় সহজেই দু'মাত্রার মূল্য দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু স্বরান্ত মৌলিক দীর্ঘ (অথচ বাঙ্‌লা উচ্চারণে হ্রস্ব) অক্ষরকে তেমন পারা যায় না। অথচ সংস্কৃত ছন্দে দীর্ঘ অক্ষরের প্রাচুর্য রয়েছে। এরকম ক্ষেত্রে যৌগিক ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর বেশি থাকে এমন শব্দ ব্যবহার ক'রে সংস্কৃত ছন্দকে বাঙ্‌লায় আনা যেতে পারে। এইভাবে তিনি কয়েকটি সংস্কৃত বৃত্ত বাঙ্‌লায় গ্রথিত করেছেন দীর্ঘ অক্ষরের অভাব যৌগিক অক্ষরে পূর্ণ ক'রে। যেমন, 'পিঙ্গল বিহ্বল' ইত্যাদি মন্দাক্রান্তা, 'উড়ে চলে গেছে বুলবুল' ইত্যাদি মালিনী. 'তখন কেবল ভরিছে গগন' ইত্যাদি রুচিরা।

এইগুলিতে শুধু হ্রস্ব দীর্ঘ মাত্রা যোজনা করলে ঠিক ঠিক সংস্কৃত ছন্দ পাওয়া যাবে, যেমন—

o o o o o o ‖ ‖ ‖ o ‖ ‖ o ‖ ‖

সংস্কৃত সূত্র-মালিনী—ননমযযযুতেয়ং মালিনী ভোগিলোকৈঃ

o o o o o o ‖ ‖ ‖ o ‖ ‖ o ‖ ‖

অনুরূপ— উড়ে চলে গেছে বুল্ বুল্ শূন্যময় স্বর্ণ পিঞ্জর

‖ ‖ ‖ ‖ o o o o o ‖ ‖ o ‖ ‖ o ‖ ‖

সংস্কৃত সূত্র-মন্দাক্রান্তা : মন্দাক্রান্তাম্বুধিরসনগৈঃ মো ভনৌ তৌ গযুগ্মম্

‖ ‖ ‖ ‖ o o o o o ‖ ‖ o ‖

অনুরূপ— পিঙ্গল্ বিহ্বল্ ব্যথিত নভতল্ কই গো কই

‖ o ‖ ‖

মেঘ উদয়্ হও

o ‖ o ‖ o o o o ‖ o ‖ o ‖

সংস্কৃত সূত্র-রুচিরা— জভৌ সজৌ গিতি রুচিরা চতুর্গ্রহৈঃ

o ‖ o ‖ o o o o ‖ o ‖ o ‖

অনুরূপ— তখন্ কেবল্ ভরিছে গগন্ নূতন্ মেঘে *

দৃশ্যতঃ ছন্দোরূপ অবিকল আছে। ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর প্রয়োগেই ছন্দোবিৎ দীর্ঘ অক্ষরের প্রয়োজন নির্বাহ করেছেন। কিন্তু পাঠে ও কানে? সংস্কৃতে যতি গৌণ এবং মাত্রা মুখ্য ব'লে পরপর গুরু অক্ষরের দীর্ঘতা শ্রুতিকটু হয় না। কিন্তু বাঙ্‌লায় 'বুল্‌বুল্' 'পিঙ্‌গল' 'বিহ্বল' প্রভৃতির পরপর দীর্ঘ উচ্চারণ কি শ্রুতিকটু হচ্ছে না? তাছাড়া সংস্কৃতে যেভাবে যতিবিভাগ রয়েছে বাঙ্‌লায় সেভাবে যতি রক্ষা ক'রে আমরা পাঠ করতে পারি কি? যেমন সূত্র অনুসারে মন্দাক্রান্তায় যতি পড়ছে আট, সাত এবং বারো মাত্রার পর। বাঙ্‌লায় ঐ বারো মাত্রার পর যতিপাত সুসহ হয় কি? অর্থাৎ আমরা পাঠের সময় 'কই গো কই মেঘ উদয় হও' এই অংশটির মাঝে 'মেঘ্' অক্ষরটির পরে পূর্ণ যতি না দিয়ে পারি কি? অনুরূপ রুচিরা ছন্দে যতি ৪+৯ অক্ষরে, অর্থাৎ 'তখন কেবল | ভরিছে গগন্ নূতন্ মেঘে' ইত্যাদি। এর বাঙ্‌লায় পাঠ হচ্ছে 'তখন কেবল | ভরিছে গগন্ | নূতন্ মেঘে'

* সংস্কৃতের নিয়ম হ'ল শেষাক্ষরটিকে সুবিধামত দীর্ঘ অথবা হ্রস্ব পাঠ করা যেতে পারে।

—অর্থাৎ ৬+৬+৫এ। কথিত মালিনী ছন্দের রচনাটি যথার্থভাবে বাঙ্‌লায় পাঠ করতে গেলে পড়ব (খাঁটি অক্ষরমাত্রিক রীতিতে)—

ο ο ο ο ο ο ‖ | ‖
উড়ে চলে গেছে বুল | বুল

ο ο ‖ ο ο ‖ | ‖
শূন্যময় স্বর্ণ পিন্ | জর (৮+২)+(৮+২)

ফলে দেখা যাচ্ছে সত্যেন্দ্রনাথ ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরের কৌশল অবলম্বন করলেও সংস্কৃত ছন্দের উচ্চারণ বাঙ্‌লায় প্রচলিত করতে পারেননি। এ কেউই করতে পারে না, কারণ এক ভাষার ছন্দ সে-ভাষার বিশেষ উচ্চারণরীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অন্য ভাষায় তা অচল। বাঙ্‌লা ছন্দ তার স্বকীয় যতিপাত-নির্ভর। সত্যেন্দ্রনাথ কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য কিছু পরীক্ষামূলকতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে বলা যায়, তাঁর "সিন্ধুর টিপ্ সিংহল্ দ্বীপ্" প্রভৃতি Dactylic ছন্দের সঙ্গে মিললেও বাঙ্‌লা পাঠে ছ'মাত্রার মাত্রাবৃত্ত হবে। আদিতে ইংরেজি-ঝোঁক না দিয়ে দীর্ঘমাত্রার পড়তে হবে। সত্যেন্দ্রনাথ অক্ষর এবং মাত্রা নিয়ে যেসব পরীক্ষা চালিয়েছিলেন বা বিচিত্র গ্রন্থন করেছিলেন তা অনেকটা কিশোর সংস্করণের হয়েছে একথা মানতেই হবে।

সত্যেন্দ্রনাথের ভাষাভঙ্গির কিছু কিছু প্রভাব পড়েছিল মোহিতলাল, নজরুল, করুণানিধান এবং কুমুদরঞ্জনের উপর। ফারসি শব্দ এবং বাঙ্‌লা কথ্য ও গ্রাম্য শব্দের ব্যবহার, পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক উল্লেখ প্রভৃতি এই প্রভাবের পর্যায়ে পড়ে। কুমুদরঞ্জন মল্লিক তো তাঁর কবিজীবন আরম্ভ করেন সত্যেন্দ্রনাথের অনুকরণ দিয়ে। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের মত ছন্দ নিয়ে এরকম পরীক্ষায় এঁরা কেউই অবতীর্ণ হন নি। বরং বলা যেতে পারে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত একাক্ষর=দুই-মাত্রা নিয়ে তাঁর কোনও কোনও কবিতায় ভাবানুযায়ী সার্থক কলাসৌন্দর্য বিস্তৃত করার একটা চেষ্টা করেছেন। মোহিতলাল এবং নজরুল ভাষাভঙ্গির দিক থেকে বরং বিপরীতধর্মী। মোহিতলাল ভাষাভঙ্গিতে আর্টের বা অলংকরণের পদ্ধতিকে বরণ করেছিলেন। নজরুল প্রবল ভাবাবেগের বশে অনায়াস ও সহজ উচ্ছ্বাসময় ভাষা নির্দ্বিধায় প্রয়োগ করেছেন। যতীন্দ্রমোহন বাগচী ও করুণানিধান সহজ এবং

সমকালের অন্যান্য

মিশ্র উভয় রীতিরই কবি। তবে মোহিতলালের শিল্প-কুশলতা বাগচীর আয়ত্তের বিষয় ছিল না, করুণানিধানের পক্ষে বরং কিছু ছিল। এঁদের সকলের রচনামূলে আবার রবীন্দ্ররীতির বাক্য নির্মাণের প্রচ্ছন্ন অনুবর্তন স্বাভাবিক ভাবেই রয়েছে।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রবীন্দ্র-পরবর্তী প্রথম আধুনিক কবি যিনি ভাবের দিক থেকে অনেকটা রবীন্দ্র-বিরোধী এবং বাস্তব জীবনাশ্রয়ী। রোম্যান্‌টিক থেকে স্থূল ও বাস্তবে এই পথ-পরিবর্তন যেহেতু আধুনিক বাঙ্‌লায় তাঁর কবিতাতেই প্রথম এবং প্রবল সেইহেতু তিনি বাঙ্‌লা কাব্যধারায় এক আশ্চর্য কবি। আমরা অন্যত্র ইংরেজি কবি ও ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডির সঙ্গে মনোভাবের দিক থেকে তাঁর সাদৃশ্য দেখিয়েছি। তাঁর এই ভাব-পরিবর্তন তাঁর কবিতার প্রযুক্তিতে কী পরিমাণ বৈশিষ্ট্য বহন করেছে তা-ই বর্তমান আলোচনে বিবেচ্য।

জীবনযুদ্ধ, শ্রেণীসংগ্রাম, উগ্রস্বার্থসিদ্ধির জন্য এক কর্তৃক অন্যের গ্রাস এই সব জাগতিক প্রত্যক্ষ বিষয় তাঁর কবিভাবনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল ব'লে বচনভঙ্গির মধ্যে Irony, Sarcasm, Inuendo, Bathos, Interrogation, Antithesis, Epigram, শ্লেষোক্তি, বিষম, বিরোধ প্রভৃতির চমৎকারিতা তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্র-প্রতিবাদ নিয়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন ব'লে নিসর্গের মধ্যবর্তী সংগ্রাম এবং নিসর্গের সঙ্গে মানুষের বিরোধ-সম্পর্ক তাঁর রচনায় একটি প্রবল প্রেরণারূপে কাজ করেছে। প্রচলিত, কথ্য এবং গ্রাম্য শব্দকে তিনি প্রয়োজনবশেই কবিতায় অবাধ অধিকার দিয়েছেন। কিন্তু তাই ব'লে তাঁর কাব্যরীতি লোক-সাহিত্যের পর্যায়ে নামেনি। ছন্দে, বাক্যরীতিতে, বিশেষণাদির প্রয়োগে তিনি রবীন্দ্র-সমানীত উন্নত কাব্যমার্গেরই পথিক, প্রচুর কথ্য শব্দের ব্যবহারেও তাঁর ঐ সর্বজনীন পন্থা থেকে বিচ্যুতি ঘটেনি। কেবল বক্তব্যের প্রয়োজনে 'Slang' শব্দ তিনি প্রায় নির্বাচিত ভাবেই গ্রহণ করেছেন, অর্থাৎ ঐগুলি তাঁর কাব্যের অলংকরণই হয়েছে। দুচারটি উদাহরণে তাঁর ঐ সব বৈশিষ্ট্য দেখানো যেতে পারে। বোঝা যাবে—সে-ই রবীন্দ্রভাষা, সে-ই অনুপ্রাসমাধুর্য,

সে-ই সমাসবদ্ধতার চারুতা, অথচ এরই মাঝে বিপরীত-ভাবুকতার কবি বিরুদ্ধ শব্দের প্রয়োগে কী অপূর্ব বিস্ময়ই না এনেছেন। কাজী নজরুল যদিও কথ্য শব্দ অনায়াসেই ব্যবহার করেছেন, তিনি এই আশ্চর্য বিরুদ্ধতার চমক আনতে পারেন নি। তাঁর সে ব্যঙ্গাত্মক প্রয়োজনও ছিল না, এই তফাত।—

"উপরে মিলেছে বেমালুম হয়ে সিঙানো চামড়া-পটি ;
ভিতরে কিন্তু নর-ভেড়া-হাড়ে দিনরাত খটাখটি !"

"সবই কারাগার, কোথা যাবে আর, যত পারে দেয় উঁকি।
শ্যাওড়া-তলায় ফুটে চেয়ে থাকে সখের সূর্যমুখী !
বন্ধু আমারে খাটো পিঞ্জরে বন্দী করিয়া রাখো,
এত বড় খাঁচা মুক্তির ধাঁচা—বিদ্রূপ কোরোনাকো।"

"কমল হতেও যার অধিক কোমল পাণি—
তারাই পূজিছে আর পূজিবে বঙ্গবাণী।
তা ব'লে কি করবি
ওরে হতগর্বী ?"

"এ ব্রহ্মাণ্ড ঝুলে প্রকাণ্ড রঙিন মাকাল ফল"

"যত বেলা ওঠে তপনের ফোটে বহিরম্বরদাহ,
সোহাগী কমল ডুবাইয়া গলা কহে—বঁধু ফিরে চাহ"

"নদীর ওকূল কালো হয়ে আসে শ্রাবণ-সন্ধ্যাবেলা,—
তখনো বন্ধু, ছিপটি তোমার সম্মুখে থাকে ফেলা।"

"ঝরিছে শ্রাবণ-ধারা উপর্ঝরণ,
পাঁচীর ছেলের শব পচে অকারণ।"

"চিরদিনই আমি খাঁটি ভক্তের অকপট-চাটু-মুগ্ধ,
ভক্তির ফাঁসে বাঁধি ভগবতী ফুঁকায় দুহাই দুগ্ধ।"

"অধরা বধূর অধরের ভুলে তেলাকুচা তুলে চুষি গো"

"সেদিন বন্ধু, সজলমেঘৈর্মেদুরাম্বরতলে
ভাড়া-নৌকায় হারানু ছাতাটি ভাদুরে গাঙের জলে"

"আধঘুমে চাহি দেখিনু চমকি—ঝুলিছে সর্বনাশী
নিজ অঙ্গের নীলাম্বরীতে কণ্ঠে লাগায়ে ফাঁসি !
কসিয়া কোমর বাঁধা,
অলকগুচ্ছে আধঢাকা মুখ অস্বাভাবিক সাদা !"

কবির সহস্র পঙ্‌ক্তিই এরকম। সংকেত এবং ব্যঞ্জনাধর্মও তাঁর ভাষার বৈশিষ্ট্য। এই উপায়েই তিনি জীবনের কৃষ্ণপক্ষের চমৎকারিতা ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু তিনি দার্শনিক দুঃখবাদী, তিক্ত এবং ক্ষারজাতীয় নন। কাব্যিক দুঃখবাদী। তাঁর অপার সহানুভূতি নানা স্থানে অশ্রুজলে বিগলিত হয়ে পড়েছে। অথচ তিনি আশাবাদী এবং রোম্যান্‌টিকও নন। শেষ জীবনের দু'চারটি কবিতায় নৈরাশ্য এবং প্রতিবাদ তীব্র নয় ব'লে কেউ কেউ এঁকে রোম্যান্‌টিক কবি ব'লে সাব্যস্ত করতে চাইলে তাঁর কবিকৃতির প্রতি অবিচারই করা হবে। যতীন্দ্রনাথ ভাবপ্রেরণার দিক থেকে চিরস্মরণীয় রবীন্দ্র-অতিক্রমী নূতন কবি। ভাষায় না হোক, ভঙ্গিতে; ছন্দে না হোক, বাক্যালংকারে; বুদ্ধিসৌকর্যে না হোক, ঐকান্তিকতায়।

সাম্প্রতিকে কবিতার ভাষারূপে যাঁরা পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন এমন তিনজন কবি স্মরণীয় হয়েছেন—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাস ও বিষ্ণু দে। এর মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ পরিবর্তিত আধুনিক জীবনবীক্ষার বাচক শব্দ সাধারণ ভাষায় না পেয়ে আভিধানিক শব্দ সমাহরণে যত্নবান্ হয়েছিলেন। জীবনানন্দ সিদ্ধি খুঁজেছিলেন পশ্চিমা চিত্রধর্মী, মনস্তাত্ত্বিক ও প্রতীকী কবিদের প্রকাশরীতির অনুসরণে। বিষ্ণু দে শব্দ এবং ভঙ্গিমা দুয়েরই প্রভূত রূপান্তর সাধন করতে চেয়েছেন। রীতিতে রবীন্দ্রাধিক কোনো স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন বোধ করেন নি, অথচ মনোধর্মের রূপান্তরকে স্বীকৃতি দিয়েছেন যথাসাধ্য, সাম্প্রতিকদের মধ্যে এমন এক উল্লেখযোগ্য কবি ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। এঁরা প্রায় সকলেই প্রথম দিকে মরীচিকা-মরুমায়ার কবিকে অভিনন্দিত করেছিলেন তাঁর অনুসরণ ক'রে—এ বিষয়টি আমাদের জানিয়েছেন ডঃ অমরেন্দ্র গণাই যতীন্দ্রনাথের কবিকৃতির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে।* বাঙ্‌লা ভাষার স্বাভাবিক প্রকাশধর্মের উপর নির্ভর ক'রে যতীন্দ্রনাথ যে ভাব ও রীতির প্রবর্তন করেছিলেন, সাম্প্রতিক কালে তারই অনুসরণ পরিবর্ধন পরিস্ফুটন ঘটলে বাঙ্‌লা ভাষা বহু উত্তম কবিতায় সমৃদ্ধ হতে পারত এমন মনে করা যেতে পারে।

* "কবি যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর কবিকৃতি" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

নির্দেশিকা